পিতৃভূমি

প্রফুল্ল রায়

No 2528
AGARTALA

করুণা প্রকাশনী কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা—১৯৬৩

প্রকাশক :
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রাকর :
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৪

মূল্য : ৫০·০০

সুবীর ভট্টাচার্য

অনুজপ্রতিমেষু

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই—

কেয়াপাতার নৌকা (অখণ্ড)
মানুষের যুদ্ধ
ভাতের গন্ধ
সীমারেখা মুছে যায়
স্বর্গের এক বাসিন্দা
আবিষ্কার
প্রস্তুতিপর্ব
আঁধারে ধূপের গন্ধ
জলের রেখা
রক্তবর্ণের যুদ্ধ

লণ্ডন থেকে প্রথমে বম্বে। সেখানে বাবার এক বন্ধু ডাক্তার গিরীশ প্যাটেলের ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের বাংলোয় দু'দিন কাটিয়ে কলকাতার প্লেন ধরেছিল জয়ন্ত।

ডাক্তার প্যাটেল বেশ কয়েক বছর লণ্ডনে জয়ন্তর বাবার সঙ্গে একই হাসপাতালে কাজ করেছেন। তারপর কিছুদিন আগে পারিবারিক কারণে চলে এসেছেন বম্বেতে। লণ্ডনে আর ফেরার সম্ভাবনা নেই। বম্বের একটা বড় হাসপাতালের সঙ্গে তিনি যুক্ত, সেই সঙ্গে প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করছেন। দুর্দান্ত পসার তাঁর, দেদার রোজগার। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত অগুনতি পেশেন্ট, হাসপাতাল আর অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে কেটে যায় ডাক্তার প্যাটেলের। রোবোটের মতো যান্ত্রিক নিয়মে খাটতে পারেন ভদ্রলোক। আসল আয়ের অর্ধেক গোপন করার পরও যা ইনকাম ট্যাক্স তাঁকে দিতে হয় তার অঙ্কটা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো।

দু-সপ্তাহ আগে ডাক্তার প্যাটেল বাবাকে কিছু দুষ্প্রাপ্য লাইফ-সেভিং ড্রাগ পাঠাতে চিঠি লিখেছিলেন। এরকম চিঠি তিনি প্রায়ই লেখেন। এয়ার ইণ্ডিয়ার অনেক পাইলটের সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব রয়েছে। তাঁদের হাতে দিয়ে ওষুধ পাঠান। এবার জয়ন্ত কলকাতায় আসছিল। বাবা তাঁর সঙ্গে ওষুধের প্যাকেট দিয়েছেন। ঠিক ছিল, বম্বেতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে ডাক্তার প্যাটেলের বাংলোয় প্যাকেটটা পৌঁছে দিয়ে কলকাতার ফ্লাইট ধরবে সে। কিন্তু ডাক্তার প্যাটেল, আন্টি অর্থাৎ মিসেস প্যাটেল এবং ওঁদের ছেলেমেয়েরা সাতদিনের আগে তাকে ছাড়তে চায়নি। কলকাতা থেকে লণ্ডন ফেরার সময় এক উইক ওঁদের সঙ্গে কাটিয়ে যাবে, এই শর্তে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছিল জয়ন্ত, তা-ও দু'দিন পর।

লণ্ডনে যেদিন সে কলকাতার টিকেট কাটে তখন থেকেই ইণ্ডিয়া, বিশেষ করে তার পিতৃভূমির শহরটার জন্য বুকের ভেতর এক ধরনের আবেগ টের পাচ্ছিল। খুব ছেলেবেলায়, তার বয়স তখন চার কি

পাঁচ, একবার মা-বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল জয়ন্ত। তারপর এই তার দ্বিতীয় বার আসা। এবার একাই এসেছে। এখন সে পঁচিশ বছরের পূর্ণ যুবক।

কলকাতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই জয়ন্তর। কুড়ি একুশ বছর আগের দেখা ওই শহরটার স্মৃতি বহুকালের পুরনো কোনও পেন্সিল স্কেচের মতো তার কাছে ঝাপসা হয়ে গেছে। তবে লন্ডনে সত্যজিৎ রায়ের তিনখানা ছবির ক্যাসেট দেখেছিল সে। 'অপরাজিত,' 'জন-অরণ্য' আর 'মহানগর'। তিনটে ছবিতেই কলকাতার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর এবং ল্যান্ডমার্কের টুকরো টুকরো দৃশ্য ধরা আছে। 'সিটি অফ জয়' নামে রোনাল্ড জোফের একটা ফিল্মের কথা শুনেছে জয়ন্ত। সেটাও নাকি কলকাতার ব্যাকগ্রাউন্ডে ওখানকার লোয়ার লেভেলের মানুষজনকে নিয়ে তোলা। রিকশাওলা, কুষ্ঠরোগী, ওঁচা টাইপের বেশ্যা, বুটলেগার, পলিটিকাল হুলিগান—এসব চরিত্র নাকি ছবিটায় রয়েছে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। ছবিটা অবশ্য তার দেখা হয়নি। তবে লন্ডনের ইন্ডিয়া হাই কমিশন অফিসে কয়েক বার পুরনো কলোনিয়ান কলকাতা আর স্বাধীন ভারতের এখনকার কলকাতার নানা দিক নিয়ে স্টিল ফটোগ্রাফের এক্সিজিবিশন হয়েছিল। দু-একবার এই ধরনের প্রদর্শনী দেখেছে জয়ন্ত। কলকাতা সম্বন্ধে অনেক বই, পত্রপত্রিকার নানা রিপোর্ট বা স্পেশাল ফিচার-টিচার তার পড়া আছে। সেগুলো সবই কলকাতার গুণগান আর স্তুতিতে ভরা নয়। যাই হোক, মা-বাবার কাছেও অনেক কিছু জেনেছে সে। এই তীব্র গতির যুগে পৃথিবী খুব কাছে এসে গেছে। একদা বৃটিশ এম্পায়ারের দ্বিতীয় মহানগর থেকে আকছার লোকজন যাচ্ছে লন্ডনে, দুই বাংলার কয়েক লাখ মানুষ ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের কাছেও কলকাতার প্রচুর খবর-টবর পাওয়া যায়। তবু বই বা খবরের কাগজ পড়ে, লোকের মুখে শুনে কিংবা ছবিটবি দেখে একটা বিশাল মেট্রোপলিসের কতটুকু আর জানা যায়।

জয়ন্তর মা-বাবা সাতাশ আটাশ বছর আগে কলকাতা থেকে ইংলন্ডে চলে গিয়েছিলেন। তার জন্ম লন্ডনে, সে ব্রিটিশ সিটিজেন। লন্ডনে যে ভারতীয়রা অনেক দিন রয়েছেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের কাছে

এক হাজার মাইল দূরের পিতৃভূমি সম্পর্কে বিশেষ কোনও আবেগ নেই। দেশের সঙ্গে তাদের সবরকম সংযোগই ছিন্ন হয়ে গেছে। একটি ছেলে বা মেয়ে দিল্লী কি বাঙ্গালোরে থেকে বান্টু বা হটেনটটদের সম্বন্ধে যেটুকু কৌতূহল বোধ করে, ইংলন্ডের নতুন জেনারেশনের ভারতীয় মা-বাবার সন্তানদের ইন্ডিয়ার ব্যাপারে তার চেয়ে একফোঁটা বেশি আগ্রহ নেই।

তবে কিছু কিছু ব্যাতিক্রম কি আর থাকে না? নিশ্চয়ই থাকে। যেমন জয়ন্তরা। লন্ডনে এতগুলো বছর কাটিয়েও ভারতীয় আই-ডেনটিটি অনেকখানিই তারা টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। সেটা মা-বাবার কারণে। বাড়িতে তারা বাংলাতেই কথা বলে। কলকাতা থেকে বাংলা বই আনিয়ে জয়ন্ত এবং তার বোন জয়াকে পড়তে এবং লিখতে শিখিয়েছেন মা আর বাবা। সমস্ত রকম আচার মেনে তাদের লন্ডনের বাড়িতে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী পুজো করা হয়ে থাকে। মা শিবরাত্রির উপোস করেন। তা ছাড়া যে শহরে তিন চার লাখ বাঙালি রয়েছে সেখানে দশ-বিশটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুল, পঞ্চাশ ষাটটা বেঙ্গলি ক্লাব আর সেই সব ক্লাবে বর্ষবরণ, দুর্গাপুজো, ড্রামা কম্পিটিশন বা রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হবে না, তাই কখনও হয়? প্রতিটি অনুষ্ঠানে মা-বাবা তাদের নিয়ে যাবেনই। সব সময় যে যেতে ভাল লাগে তা নয়। বাংলা ভাষা, বাঙালির কালচার সম্পর্কে মা-বাবার যতটা আকর্ষণ তাদের ততটা নেই। বরং ওয়েস্টার্ন ফিল্ম, পপ মিউজিক, ওখানকার প্রবল গতিময় জীবন দুই ভাইবোনের বেশি পছন্দ। তবু কয়েক হাজার মাইল দূরে থাকলেও পূর্বপুরুষের দেশের মাটিতে তাদের অদৃশ্য একটু শিকড় মা-বাবার জন্য আলগা-ভাবে থেকেই গেছে।

কলকাতা শহর আর নিজেদের বংশ নিয়ে বাবার খুব গর্ব। কলকাতার পুরনো, বিরাট বিরাট পরিবারগুলোর মধ্যে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার দত্ত'রাও রয়েছেন। একসময় তাঁদের খ্যাতি নাকি চারি-দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেটা শুধুমাত্র বনেদিয়ানার জন্য নয়। নাইন-টিনথ সেঞ্চুরির কলকাতায় যত প্রোগ্রেসিভ সামাজিক আন্দোলন হয়েছে, দত্তরা সবসময় ছিলেন তার প্রথম সারিতে। বিধবা

বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, মেয়েদের জন্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা, স্বদেশী শিল্প—কোন বিষয়ে তাদের উৎসাহ না ছিল? বিদ্যাসাগর মশায় তাঁদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষদের একজন বিধবা বিয়ে করে হইচই বাধিয়ে দিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, সিমলায় বিবেকানন্দদের বাড়ি কিংবা দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের কাছে তাঁদের যাতায়াত ছিল। কলকাতার এলিট সোসাইটিতে দত্তদের জায়গা ছিল অনেক উঁচুতে।

নিজেদের বংশ সম্পর্কে বাবার যত আবেগই থাক, জয়ন্তকে তা খুব একটা নাড়া দিতে পারেনি। দামী পারিবারিক ইতিহাসের সামান্যই সে মনে করে রেখেছে, বেশির ভাগটাই মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

একুশ বছর বাদে একা একা জয়ন্ত যে ইণ্ডিয়ায় এসেছে তার পেছনে পিতৃভূমি সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল তো রয়েছেই, তা ছাড়া বাবা তাকে একটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে পাঠিয়েছেন। জয়ন্তকে একটা বড় দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ ছাড়া কয়েকটা ঠিকানাও নিয়ে এসেছে। কিছু লোকের সঙ্গে দেখা করে চিঠি এবং গিফট দিতে হবে। কিন্তু সে কথা পরে।

ডাক্তার প্যাটেলের ছেলে হরীশ, জয়ন্তরই সমবয়সী, আজ সকালে তাকে সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে নিয়ে এসে কলকাতার ফ্লাইট ধরিয়ে দিয়েছিল।

জয়ন্ত যখন সিঁড়ি দিয়ে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বিশাল এয়ারবাসটায় ওঠে, তার ঠিক পেছন পেছন উঠেছিল দু'টি তরুণী। তার সিট প্লেনের মাঝামাঝি একটা রো-এর বাঁ দিকে, জানলার গা ঘেঁষে। মেয়ে দু'টির সিট তার ডান ধারে। অর্থাৎ তাদের তিনজনকে পাশাপাশি বসতে হয়েছিল।

পারমিসিভ সোসাইটিতে জয়ন্তর জন্ম, মেয়ে পুরুষের সেখানে অবাধ মেলামেশা। মেয়েদের ব্যাপারে তার অকারণ কৌতূহল বা হ্যাংলামি নেই। প্রথম দিকে ভাল করে দুই তরুণীকে সে লক্ষ্যও করেনি। তার সম্বন্ধে ওদেরও খুব একটা আগ্রহ দেখা যায়নি।

এক পলক জয়ন্তকে দেখেই, মুখ ফিরিয়ে তারা গল্প জুড়ে দিয়েছিল। আর জয়ন্ত সামান্য কাত হয়ে জানালার বাইরে চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

এখন ন'টার মতো বাজে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে এয়ার-বাসটা সান্তাক্রুজ থেকে টেক-অফ করেছিল। আর ঘণ্টা দেড়েকের ভেতর তার কলকাতায় পৌঁছে যাবার কথা।

প্লেনে ওঠার পর সেই যে জয়ন্ত কাচের জানালার বাইরে তাকিয়েছিল, এখনও তাকিয়েই আছে। মেয়ে দু'টির গল্প থামেনি, আবছাভাবে তাদের টুকরো টুকরো কথা কানে ভেসে আসছে। ওরা বেশির ভাগই ইংরেজিতে কথা বলছে। মাঝে মাঝে বাংলায়। জয়ন্তর ধারণা, মেয়ে দু'টি বাঙালি।

সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে এল। বাংলা ক্যালেণ্ডারে এটা কী মাস, জয়ন্ত বলতে পারবে না। বাঙালির পাঁজি টাজি সম্পর্কে তার তেমন কোনও ধারণা নেই। তবে আর কিছুদিনের ভেতর যে দুর্গাপুজো শুরু হয়ে যাবে, সেটা তার জানা। লণ্ডনের বেঙ্গলি ক্লাবগুলোতে এই নিয়ে রীতিমতো তোড়জোড়ও চলছে। ফি বছরই কলকাতা থেকে প্রতিমা, ঢাকি আর পুরোহিতদের প্লেনে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না।

পৃথিবীর সমতল থেকে প্রায় পঁচিশ তিরিশ হাজার ফিট ওপর দিয়ে এয়ার-বাস উড়ে চলেছে। গরম কালটা বাদ দিলে সারা বছরই লণ্ডনের আকাশ প্রায় ঝাপসা হয়ে থাকে। অথচ এখানে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি আকাশ কী আশ্চর্য নীল! কেউ যেন ঘষে মেজে পালিশ করে তার গা ঝকঝকে করে রেখেছে। মাঝে মাঝে হালকা, ফুরফুরে, ধবধবে সাদা, টুকরো টুকরো মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে।

অনেক নিচে পাহাড়, গাছপালা, রুপোলি ফিতের মতো নদী, ফসলের জমির জ্যামিতিক নকশা—সব মিলিয়ে দিগন্তের ফ্রেমে বাঁধানো একখানা স্বপ্ন বলে মনে হয়।

দুরমনস্কর মতো আকাশ-টাকাশ দেখতে দেখতে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটায় তার পূর্বপুরুষদের বাড়ির কথা ভাবছিল জয়ন্ত। বাড়িটার ঠিকানা আর সেটার ফোটো তার সঙ্গেই রয়েছে। ওখানে থাকেন তার

দুই জেঠামশায়, দুই জেঠিমা, এক কাকা, এক কাকিমা, তাঁদের ছেলেমেয়েরা আর এক বিধবা কাকিমা এবং তাঁর একমাত্র ছেলে। আর থাকেন তার নব্বই বছরের ঠাকুমা। জয়ন্তর একটিই পিসিমা, তাঁর শ্বশুরবাড়ি সাউথ ক্যালকাটার ওল্ড বালিগঞ্জে।

জয়ন্ত যে কলকাতায় আসছে, আগেই জেঠামশায়দের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে কোন তারিখে আসবে সেটা ইচ্ছা করেই লেখেনি। হঠাৎ এসে সবাইকে অবাক্ করে দিতে চায় সে। তা ছাড়া ছেলেবেলায় দেখা পূর্বপুরুষদের বাড়িটা কুড়ি বছর পরে খুঁজে বার করার মধ্যে দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারও রয়েছে। এটা এক ধরনের আবিষ্কারও।

প্লেন কলকাতার কাছাকাছি যত এগিয়ে চলেছে ততই চাপা টেনসান বোধ করতে থাকে জয়ন্ত। হঠাৎ তার মনে হয় এভাবে ডেট না জানিয়ে দুম করে চলে আসা ঠিক হয়নি। এখানে আসার উত্তেজনায় কতকগুলো ব্যাপার তার মাথায় ছিল না। ইদানীং কিছুদিন ধরে লণ্ডনের কাগজগুলোতে কলকাতা সম্পর্কে ভয়াবহ কিছু রিপোর্ট আর মন্তব্য তার চোখে পড়েছে। বৃটিশ ইণ্ডিয়ার সর্বোত্তম শহরটি নাকি আগের মতো নেই। তার পুরনো মহিমা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। এখানকার লোকজনের মতো এমন জঘন্য সিটিজেন নাকি ওয়ার্লেডর অন্য কোনও শহরে পাওয়া যাবে না। ইতর, অভদ্র, ক্ষতিকারক। তুলকালাম কাণ্ড ঘটাবার জন্য সারাক্ষণ এরা ওত পেতে আছে। কখন ট্রাম পোড়াবে, বাস পোড়াবে, প্রাইভেট কার জ্বালিয়ে দেবে, বা মিছিল বার করে শহর অচল করে ফেলবে, কেউ বলতে পারে না। মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল অ্যাণ্ড ইনকরিজিবল সিটি। বিশেষ করে এখানকার ট্যাক্সিওলাদের নাকি জুড়ি নেই। ফরেনার দেখলে বা শহরে কেউ নতুন এসেছে টের পেলে তার সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে।

কিছুদিন আগে 'টাইমস' কাগজে 'লেটারস টু দা এডিটর' কলামের একটি চিঠির কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায় জয়ন্তর। পত্রলেখক খাস ইংরেজ। টুরিস্ট হিসেবে কলকাতায় গিয়ে এক ট্যাক্সিওলার পাল্লায় পড়ে তাঁর যা হাল হয়েছিল তার চুল খাড়া-করা বর্ণনা রয়েছে।

চিঠিটায়। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে পেঁছে দেবার কথা বলে ট্যাক্সিওলা আর তার সাকরেদ তাঁকে একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে গলায় ছুরি ঠেকিয়ে টাকাপয়সা, ঘড়ি, সুটকেশ কেড়ে নেয়। সুটকেশে তাঁর পাশপোর্ট, ভিসা ছিল। প্রচুর কাকুতি-মিনতি করেও সেগুলো ফেরত পাওয়া যায়নি। রাস্তায় তাঁকে ফেলে রেখে ট্যাক্সিওলা আর তার সঙ্গী উধাও হয়ে যায়। তারপর ষোল সতের কিলোমিটার হেঁটে, ধুঁকতে ধুঁকতে ভদ্রলোক বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিসে পোঁছন। সেখানকার অফিসারদের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত একবস্ত্রে তিনি লণ্ডনে ফিরতে পেরেছিলেন। তাঁর উপদেশ, বৃটিশ টুরিস্টরা পৃথিবীর আর যেখানে ইচ্ছা যাক, শুধু কলকাতার দিকে যেন পা না বাড়ায়।

চিঠিটা জয়ন্তর বাবাও দেখেছেন। তা ছাড়া কলকাতা সম্পর্কে অন্য খারাপ রিপোর্ট এবং কমেন্টগুলোও তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি বলেছেন, 'দু-চারটে আনপ্লেজান্ট ঘটনা সব জায়গাতেই ঘটে। আসলে কলকাতার কুৎসা করার জন্য এক ক্লাসের বৃটিশ প্রেসের ঘুম নেই। এটা ভীষণ বাড়াবাড়ি। একটা অত বড় শহরের সব কিছু খারাপ হয়ে গেছে, কখনও মেনে নেওয়া যায়?'

বাবা কলকাতার দুর্নাম সহ্য করতে পারেন না। হয়তো তাঁর কথাই ঠিক। কিন্তু এই মুহূর্তে 'টাইমস'-এর চিঠিটা মাথা থেকে কিছুতেই বার করে দিতে পারছে না জয়ন্ত, ফিক্সেসানের মতো সেটা চিন্তার ভিতর আটকে আছে। হঠাৎ সে ঠিক করে ফেলে, প্লেনের প্যাসেঞ্জারদের কাছে জানতে চাইবে, নিরাপদে কী করে এয়ারপোর্ট থেকে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটায় পেঁছুনো যায়।

জানালার বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে প্লেনের ভেতর দিকে তাকায় জয়ন্ত। বিশেষ ভিড়টিড় নেই। কিছু প্যাসেঞ্জার দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। স্বাভাবিক নিয়মেই তার চোখ এসে পড়ে পাশের তরুণীদের ওপর। এবার ভাল করে সে দু'জনকে লক্ষ্য করে।

মেয়ে দু'টির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের মতো। যে ঠিক জয়ন্তর গা ঘেঁষে বসে আছে তার হাইট মাঝারি, রং বেশ ফর্সা, চুল ছেলেদের

মতো ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। পরনে জীনস আর ঢোলা প্যান্ট, হাতে চৌকো ইলেকট্রনিক ঘড়ি। তার ওধারের মেয়েটির গায়ের রং কিছুটা চাপা, তবে তার সঙ্গিনীর তুলনায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা। তার পরনে শাড়ি, তবে চুলের ছাঁট একইরকম। তারও হাতে ঘড়ি ছাড়া অন্য কোনও গয়না টয়না নেই।

দুই তরুণীই দারুণ স্মার্ট এবং ইস্পাতের ফলার মতো ঝকঝকে। ওদের চোখেমুখে শিক্ষা এবং বুদ্ধির ধার। খুব সম্ভব ওরা পরস্পরের বন্ধু।

প্লেনে ওঠার পর থেকে দু'জনে অনবরত কথা বলে যাচ্ছিল। এখনও থামার লক্ষণ নেই। আগে খেয়াল না করলেও জয়ন্ত এখন বুঝতে পারছে, ওরা বম্বেতে কোনও একটা সেমিনারে পেপার পড়তে এসেছিল। সেখানকার কোনও কোনও ঘটনায় তারা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে উঠছে, আবার কোনও মজার ঘটনার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে দারুণ হাসছে।

তরুণী দু'টির কাছ থেকে কলকাতার হালচাল জেনে নেওয়া যেতে পারে, তারপর কিভাবে মধ্য কলকাতায় তাদের বাড়িতে পেঁছিনো যায় তার সিদ্ধান্ত নেবে। দরকার হলে ওদের সাহায্য নেওয়া যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

তরুণী দু'টি সেমিনারের ব্যাপারে যেভাবে মেতে আছে তাতে পার্শ্ববর্তী একটি উন্মুখ চিন্তাগ্রস্ত যুবকের দিকে আদৌ তাকাবে কিনা কে জানে। কিংবা যখন তাকাবে তখন হয়তো এয়ার-বাসের ক্যালকাটা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার সময় হয়ে যাবে।

মেয়ে দু'টি যে বাঙালি এবং কলকাতায় থাকে, আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। তবু খানিকক্ষণ দ্বিধার পর জয়ন্ত হঠাৎ বলে ওঠে, 'এক্সকিউজ মি—' বাড়িতে মা-বাবার সঙ্গে যদিও বাংলাতেই কথা বলে তবু তার ধারণা বাংলা ভাষায় এখনও সে যথেষ্ট আনাড়ি। হয়তো উচ্চারণে গোলমাল থেকে যাবে, সঠিক শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে না। তার চেয়ে ইংরেজিটাই অনেক বেশি নিরাপদ।

দুই তরুণী চকিত হয়ে জয়ন্তর দিকে তাকায়। চাপা রংয়ের মেয়েটি বলে, 'ইয়েস—'

জয়ন্ত বলে, 'আপনাদের কিছু কিছু কথা শুনেছি। আমার ধারণা আপনারা বাঙালি, কলকাতায় থাকেন। অ্যাম আই রাইট ?'

মেয়ে দু'টি কিছুটা সন্দিগ্ধ চোখে জয়ন্তকে লক্ষ্য করে। অনেক বাজে টাইপের গায়ে-পড়া ছেলে যারা অযাচিতভাবে আলাপ জমাতে চেষ্টা করে, তাদের মাথায় থাকে নানারকম দুরভিসন্ধি। কিন্তু স্মার্ট এবং সুপুরুষ জয়ন্তর চেহারায় এমন এক ধরনের সারল্য আর সপ্রতিভতা মাখানো, যাতে মনে হয় না তার কোনও খারাপ মতলব থাকতে পারে।

চাপা রংয়ের মেয়েটির কপাল সামান্য কুঁচকে গিয়েছিল, ভাঁজ মিলিয়ে কপালটা ফের মসৃণ হয়ে যায়। সে বলে, 'ইয়েস রাইট। আপনার জন্যে কী করতে পারি ?'

জয়ন্ত বলে, 'আমি একটি ইনফরমেশন চাইছি।'

'কী ?'

'ক্যালকাটা এয়ারপোর্টে নেমে বউবাজার বলে একটা জায়গায় আমাকে যেতে হবে। ট্যাক্সিতে যাওয়া কতটা সেফ ?'

বিমূঢ়ের মতো মেয়েটি বলে, 'মানে ?'

জয়ন্ত বলে, 'আমি এই শহর সম্বন্ধে, স্পেশালি এখানকার ট্যাক্সি-ওলাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু রিপোর্ট পড়েছি। অনেকের এক্স-পিরিয়েন্স ভীষণ খারাপ—হরিফায়িং।'

মেয়েটি হয়তো এবার মজা পায়। মাঝখানের ফর্সা মেয়েটির কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় পড়লেন ?'

জয়ন্ত বলে, 'লন্ডনে।'

ফর্সা মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, 'আপনি লন্ডনে থাকেন নাকি ?'

জয়ন্ত বলে, 'হ্যাঁ। আমি বৃটিশ সিটিজেন।'

ফর্সা মেয়েটি এবং তার বন্ধুর খুব সম্ভব বিশ্বাস হয় না। তারা চোখ ছোট করে জয়ন্তর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে থাকে।

ওদের মনোভাব বুঝতে পারছিল জয়ন্ত। সে ব্যস্তভাবে তার বৃটিশ নাগরিকত্বের কারণ জানিয়ে বলে, 'আমি অবশ্য বাঙালি মা-বাবার সন্তান।'

'আই সি।' এবার ওধারের তরুণীটি বলতে থাকে, 'লন্ডনের

কাগজে কী বেরিয়েছে না বেরিয়েছে, জানি না। তবে কলকাতা এখনও ততটা আনসিভিলাইজড় হয়ে যায়নি। এয়ারপোর্টে আমাদের নিতে গাড়ি আসবে। যদি শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিওলাদের সম্বন্ধে ভয় কাটিয়ে উঠতে না পারেন, আমরা আপনাকে বউবাজার পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি।'

মেয়েটির কথায় সূক্ষ্ম একটু খোঁচা ছিল, খুব সম্ভব তাকে প্রচণ্ড ভিতু ধরে নিয়েছে। জয়ন্ত হকচকিয়ে যায়। বলে, 'থ্যাঙ্কস। পৌঁছে দেবার দরকার নেই। আপনি যখন বলছেন তখন ওই ব্যাপারটা নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করছি না।'

একটু চুপচাপ।

দুই তরুণী জয়ন্ত সম্বন্ধে বেশ কৌতূহল বোধ করছিল। হঠাৎ ওধারের চাপা রংয়ের মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি এই প্রথম কলকাতায় আসছেন?'

জয়ন্ত বলে, 'না। কুড়ি একুশ বছর আগে একবার এসেছিলাম। আমার সেকেণ্ড ভিজিট।'

'এখানে আপনাদের কেউ আছেন?'

'সবাই আছেন।' কারা কারা রয়েছেন জানিয়ে জয়ন্ত বলে, 'এই শহরেই তো আমাদের রুটস। শুধু মা-বাবা, আমি আর আমার বোন লণ্ডনে থাকি। অ্যানসেসটরদের শহর আর আত্মীয় স্বজনদের দেখতে ইচ্ছে হল, তা ছাড়া এখানে কিছু কাজও আছে, তাই কয়েক দিনের ভিসা নিয়ে চলে এলাম।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'ওই দেখুন, আলাপ হল কিন্তু আমরা কেউ কারুর পরিচয় জানি না। আমার নাম জয়ন্ত দত্ত।'

'স্টুডেণ্ট?'

'না, অতটা ইয়াং আমি নই। কলেজ টলেজের ব্যাপার শেষ হয়ে গেছে। ম্যানেজমেণ্ট কোর্স কমপ্লিট করে এখন আমি লণ্ডনে একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে জুনিয়র একজিকিউটিভ।'

অগত্যা দুই তরুণীকেও তাদের পরিচয় দিতে হয়। ফর্সা মেয়েটির নাম পল্লবী সেন আর তুলনায় কালো মেয়েটি বিশাখা চ্যাটার্জি। দুজনেই অধ্যাপিকা। পল্লবী পড়ায় ইকনমিকস,

বিশাখা হিস্ট্রি, তবে এক কলেজে নয়। থাকে অবশ্য একই পাড়ায় —আলিপুরে। জয়ন্ত যা আন্দাজ করেছিল তাই, দু'জনের খুব বন্ধুত্ব।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'আলিপুরটা কলকাতার কোন দিকে?'

বিশাখা বলে, 'সাউথে।'

'বউবাজার থেকে কত দূরে?'

বিশাখা এবং পল্লবী পরস্পরের দিকে দ্রুত একবার তাকিয়ে চোখ কুঁচকে নিঃশব্দে হাসে। তারপর বিশাখা বলে, 'অনেক দূর। সাত আট কিলোমিটার তো হবেই।'

ওদের হাসির ভেতর একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল। সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি জয়ন্তর। সে বলে, 'আপনাদের বাড়ির ঠিকানা চাইছি না। শুধু লোকালিটিটা সম্বন্ধে ধারণা করতে চাইছি। মা-বাবার কাছে অনেক জায়গার নাম শুনেছি। তবে বউবাজার, কালিঘাট, হাওড়া ব্রিজ আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ছাড়া আর কিছু মনে নেই।'

বিশাখা আর পল্লবী হকচকিয়ে যায়। বিব্রতভাবে বিশাখা বলে, 'ঠিকানা দিতে একটুও আপত্তি নেই। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।' একটু থেমে ফের শুরু করে, 'শুনে শুনে তো আর এত বড় শহর সম্বন্ধে আইডিয়া করা যায় না। আপনার জেঠতুতো ভাই-বোনদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে শহর দেখবেন। মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে যাবে।'

পল্লবী বলে, 'আপনি ক'দিনের ভিসা নিয়ে এসেছেন?'

'টু উইকস।'

'দু সপ্তাহে এত বিরাট একটা শহরের বাইরের দিকটা হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু কলকাতাকে বুঝতে হলে এখানে অনেক দিন থাকা দরকার।'

'বেশিদিন থাকার উপায় নেই যে।'

পল্লবী আর কিছু বলে না।

জয়ন্ত একটু ভেবে এবার বলে, 'একটা ব্যাপারে আমার একটু কিউরিওসিটি হচ্ছে।'

শোনে ওঠার পর 'আপনারা বম্বের একটা সেমিনারের কথা বলছিলেন। সেখানে খুব সম্ভব দু'জনে পেপারও পড়েছেন। পেপারের কী সাবজেক্ট ছিল আপনাদের ?'

পল্লবী আর বিশাখা হঠাৎ খুব উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বিশাখা বলে 'আমাদের মতো গরিব থার্ড ওয়ার্ল্ড কাণ্ট্রিতে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের গ্রামের ল্যান্ডলেস পরিবারের মেয়েরা অর্থনৈতিক কোন লেভেলে পড়ে আছে, তাদের প্রতি মুহূর্তে কী ধরনের সমস্যা ফেস করতে হয়—এই নিয়ে পল্লবীর পেপার। আমার পেপারটা শহরের স্লাম এরিয়ার মেয়েদের নানা সমস্যা নিয়ে।'

দুই তরুণী সম্পর্কে বেশ শ্রদ্ধাই হয় জয়ন্তর। সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে বলে, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের দেখে মনে হয় বড় ফ্যামিলি থেকে এসেছেন। স্লাম ট্রামের মেয়েদের সম্বন্ধে জানলেন কী করে ?'

'তাদের সঙ্গে মিশে।'

'তা হলে তো ওদের কাছে যেতে হয়েছে ?

'শুধু কি যাওয়া, কতদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে নেয় জয়ন্ত। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কি সোসাল ওয়ার্ক করেন ?'

বিশাখা বলে, 'কলেজ টলেজ করার পর সময় তো তেমন পাই না। যেটুকু পাই তাতে যা করা যায় আর কি।'

'এই যে কাজটা করেন তা কি ব্যক্তিগতভাবে ?'

'না না, আমাদের একটা অর্গানাইজেশন আছে।'

বিশাখা জানায়, 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড' নামে একটা বড় সংস্থার তারা মেম্বার। ওটার মূল কেন্দ্র দিল্লিতে, তবে কলকাতা, বাঙ্গালোর, বম্বে আমেদাবাদ, মাদ্রাজ—এরকম বড় বড় শহরে শাখা আছে। বিশাখা পল্লবীর মতো অসংখ্য মেয়ে এবং কিছু কিছু যুবকও সংস্থার ক্যালকাটা ইউনিটের মেম্বার। তারা কলকাতার দুঃস্থ, নির্যাতিত মেয়েদের মধ্যে কাজ করে।

প্রতি বছর দেশের নানা প্রান্তের মেয়েদের সমস্যা নিয়ে তিন চারটে

সেমিনারের আয়োজন করে 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড', তবে এক জায়গায় নয়। ঘুরে ঘুরে নানা শহরে, এবার যেমন হয়েছে বম্বেতে।

ঔৎসুক্য বাড়ছিল জয়ন্তর। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী টাইপের কাজ করতে হয় আপনাদের?'

বিশাখা বলে, 'সেটা মুখে বলে ঠিক বোঝানো যাবে না।'

জয়ন্ত বলে, 'আপনাদের অসুবিধে না হলে দেখতে চাই।'

এতক্ষণ চুপচাপ দু'জনের কথা শুনছিল পল্লবী। হঠাৎ বলে ওঠে, 'সে সব আপনার ভাল লাগবে না।'

জয়ন্ত জিজ্ঞেস কর, 'কেন?'

পল্লবী বলে, 'আপনি অ্যাফ্লুয়েন্ট কান্ট্রির সিটিজেন। আমাদের দেশের গরিব ফ্যামিলির মেয়েরা কতটা কষ্টের মধ্যে থাকে, ভাবতেও পারবেন না। না দেখাই ভাল।'

বিশাখা বন্ধুকে বলে, 'এটা তুই ঠিক বললি না। ও'রা ইন্ডিয়া ছেড়ে গিয়ে তো সুখেই আছেন। পূর্বপুরুষদের দেশের মানুষজন কিভাবে জীবন কাটাচ্ছে, একটু না হয় দেখেই যান।'

বিশাখার কথায় বিদ্রূপ রয়েছে। জয়ন্ত কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না।

বিশাখা তার হ্যান্ড-ব্যাগ থেকে পেন আর কাগজ বার করে 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর কলকাতার ঠিকানা লিখে জয়ন্তকে দিতে দিতে আবার বলে, 'যদি সময় পান আর আমাদের অ্যাক্টিভিটি সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কৌতূহল থাকে এই অ্যাড্রেসে চলে আসবেন। আমরা দেখিয়ে দেব। লন্ডনে ফিরে গিয়ে আপনার ইংরেজ বন্ধুদের বলতে পারবেন, তাদের ছেড়ে-যাওয়া কলোনিতে কী ধরনের এক্স-পিরিয়েন্স হল।

একসময় এয়ার-বাস কলকাতায় পেঁছে যায়।

জয়ন্ত লন্ডন থেকে তিনটে ঢাউস সুটকেশ আর দুটো বড় ব্যাগ নিয়ে এসেছিল। বম্বে পর্যন্ত সে এসেছে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে। সেখানেই তার কাস্টমস চেক হয়ে গেছে। বম্বে থেকে কলকাতায় এসেছে ডোমেস্টিক ফ্লাইটে। এখানে সে সব ঝঞ্ঝাট নেই।

বম্বেতে মালপত্র ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্লেনের পেটের ভেতর।

সেগুলো পেতে পেতে আধ ঘণ্টা লেগে যায়। তারপর পোর্টারের মাথায় সুটকেশ টুটকেশ চাপিয়ে অন্য প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের বাইরে চলে আসে জয়ন্ত।

বিশাখা আর পল্লবীও তার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। ওদের লট-বহর কম। একটা করে মাঝারি সুটকেশ আর চামড়ার ব্যাগ। ওরা পোর্টার নেয়নি। এই সামান্য জিনিস নিজেরাই হাতে ঝুলিয়েএনেছে।

বাইরে একদিকে প্রাইভেট কার-এর পার্কিং জোন, আরেক দিকে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। দু জায়গাতেই অজস্র গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু লোকজনও এখানে চোখে পড়ে। ক্যালকাটা ফ্লাইটের প্যাসে-ঞ্জারদের দেখামাত্র তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়।

প্রাইভেট কারগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে একটা পেটানো চেহারার মাঝবয়সী লোক পল্লবীদের দিকে দৌড়ে আসে। ওদের হাত থেকে ব্যাগ ট্যাগ নিতে নিতে বলে, 'বোম্বাইতে ভাল ছিলে তো দিদিরা ?'

পল্লবী বলে, 'হ্যাঁ, ভাল। তুমি ?'

লোকটা হেসে হেসে বলে, 'আমি কখনও খারাপ থাকি ? এস দিদিরা—'

বিশাখা বলে, 'তুমি গাড়িতে গিয়ে ব'সো হরেনদা। আমরা পাঁচ মিনিটের ভেতর আসছি।'

'বেশি দেরি ক'রো না। আজ মিছিল বেরুবে। তার আগে বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে রাস্তায় দু-তিন ঘণ্টার জন্য আটকে যাব।' বলে হরেন চলে যায়।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার ইচ্ছা, বিশাখাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে যাবে। ওরা কথা বলছিল, তাই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। ওদিকে পোর্টারটা অধৈর্য হয়ে তাড়া লাগাতে শুরু করেছে।

বিশাখা জয়ন্তর দিকে তাকায়। এতক্ষণ ওরা নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলছিল। কিন্তু জয়ন্তকে ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করে, 'এখনও ভেবে দেখুন, আমাদের সঙ্গে যাবেন কিনা।' ওরা ধরেই নিয়েছে সে বাংলা জানে না।

জয়ন্ত বলে, 'না না, আমি নিজেই চলে যেতে পারব।'

বিশাখা পল্লবীকে মজার গলায় বলে, 'চল, ভীতুর ডিমটাকে ট্যাক্সি ধরিয়ে দিয়ে আসি।'

হঠাৎ দুই তরুণীকে চমকে দিয়ে জয়ন্ত বলে, 'খুব ভাল না হলেও বাংলাটা আমি জানি। প্লিজ, আমার জন্যে কষ্ট করে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যাবেন না। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লেগেছে। আশা করি, আবার আমাদের দেখা হবে। আচ্ছা, নমস্কার।'

জয়ন্ত পোর্টারকে সঙ্গে করে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে চলে যায় আর বিশাখা এবং পল্লবী বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

দুই

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ঝকঝকে, মসৃণ, গাছপালাওলা রাস্তার ওপর দিয়ে কিছুক্ষণ ভালই আসা গেল। তারপর একটা রেল ব্রিজের নিচের সুড়ঙ্গ দিয়ে ওধারে যেতেই চোখের তারা স্থির হয়ে যায় জয়ন্তর।

এখানে দু'ধারে খোলা নর্দমার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি উড়ছে। মাঝে মাঝে আবর্জনার পাহাড়, ফুটপাথ জুড়ে বাজার, রাস্তায় থিক-থিকে ভিড়। জয়ন্ত শুনেছিল, কলকাতায় নাকি পপুলেশন এক্স-প্লোশান অর্থাৎ জন বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। এয়ারপোর্ট থেকে বেরুবার কয়েক মিনিটের ভেতর সে তার কিঞ্চিৎ নমুনা দেখতে পাচ্ছে।

এখানে ট্রাফিক ল বলে কোনও বস্তু আছে কিনা কে জানে। ঠেলা, রিকশা, মিনিবাস, বাস, ট্যাক্সি, ভ্যান—সব যেন ডেলা পাকিয়ে গেছে। উপচে পড়া বাজার, মানুষের ভিড়, গারবেজের স্তূপ, ইত্যাদির ভেতর দিয়ে গাড়িগুলো শামুকের গতিতে ঠেলাঠেলি করে এগুতে চাইছে। কে আগে এই দমবন্ধ-করা ফাঁদ থেকে বেরুতে পারে, তার এক ভয়াবহ প্রতিযোগিতা চলছে যেন।

চারিদিকে হইচই, চিৎকার, সেই সঙ্গে খিস্তিখেউড়। প্রতিটি গাড়ির ড্রাইভার অনবরত কান ফাটানো হর্ন বাজিয়ে চলেছে। নোংরা, রং-বেরংয়ের বিজ্ঞাপনে মোড়া বাসগুলো থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে গোটা জায়গাটা অন্ধকার করে দিচ্ছে। যত রকম পলিউশান থাকা সম্ভব, সবই বোধহয় এ শহরে রয়েছে। এখানকার বাতাসে বিন্দুমাত্র বিশুদ্ধ অক্সিজেন অবশিষ্ট আছে কিনা কে জানে।

চারপাশের আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছিল জয়ন্তর। দু'ধারের নর্দমা থেকে দুর্গন্ধ উঠে এসে নাকে ঢুকছে। তার মনে হচ্ছিল নার্ভগুলো ছিঁড়ে পড়বে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকে চাপা দেয় সে।

তার ট্যাক্সি ড্রাইভারটি শিখ। প্রাণপণে হর্ন টিপতে টিপতে সে সামনের এক ট্রাকওলাকে গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একটানা বলে যাচ্ছে, 'আবে কুত্তা, আগে বাড়্—আগে বাড়্—'

ট্রাকওলাও নিঃশব্দে 'কুত্তা' সম্ভাষণটি হজম করার পাত্র নয়। সেও মুখ ফিরিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে হিংস্র ভঙ্গিতে বলতে থাকে, 'তু কুত্তা, তেরে বাপ কুত্তা, তেরে বাপকা বাপ কুত্তা—'

এ জাতীয় মধুর ভাষার আদানপ্রদান শুধু ট্রাকওলা আর ট্যাক্সি-ওলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। রিক্সাওলা, ঠেলাওলা, বাসের ড্রাইভার —কেউ বাদ নেই।

জয়ন্তর মনে হয়, এ শহরে কেউ ঠিক স্বাভাবিক নেই। মারাত্মক পলিউশান আর চরম বিশৃঙ্খলা তাদের মেজাজকে সারাক্ষণ হয়তো চড়া পর্দায় বেঁধে রাখে। কে জানে প্রবল স্নায়বিক চাপে ভুগে ভুগে কলকাতার মানুষ একেকটি মেণ্টাল পেশেণ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা।

সূর্য এখন প্রায় মাথার ওপর। সেপ্টেম্বরের এই দুপুরে রোদ বেশ কড়া হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলায় জয়ন্ত যখন কলকাতায় আসে সেই সময়ের কথা মনে নেই। লণ্ডনে এমন তেজী রোদ কদাচিৎ দেখা যায়। রকমারি গাড়ির জমাট ভিড়ের ভেতর ট্যাক্সিতে বসে সে ভীষণ অসুস্থ বোধ করতে থাকে। গলগল করে ঘামতে ঘামতে তার জামাটামা ভিজে যায়।

জয়ন্ত ট্যাক্সিওলাকে জিজ্ঞেস করে, 'বউবাজার এখান থেকে কতদূর ?'

বিশাল চেহারার শিখ ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। গলা ফাটিয়ে অন্য ড্রাইভারদের যতই গালাগাল দিক, নিজের প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে তার ব্যবহার রীতিমত ভদ্র। মোলায়েম গলায় সে বলে, 'হোগা লগভগ পাচ ছে কিলোমিটার।'

লণ্ডনে শুধু কয়েক লাখ বাঙালিই নেই, নর্থ ইণ্ডিয়ার প্রচুর লোকজন রয়েছে। হিন্দিটা ওখানে ভালই চলে। তাছাড়া হিন্দি ফিল্মেরও দারুণ রমরমা তাদের ওখানে। ভারতীয় পাকিস্তানি আর বাংলাদেশিরা বম্বেতে তৈরি ছবির ক্যাসেট তো দেখেই, সাদা চামড়ার খাস বিলিতি অনেক সাহেবও দেখে থাকে। জয়ন্তও হিন্দি সিনেমা পছন্দ করে। শুনতে শুনতে এই ভাষাটা মোটামুটি শিখে ফেলেছে। সে বলে, 'কখন পেঁছুতে পারব ?'

ড্রাইভার স্টিয়ারিং ছেড়ে দুই হাতের পাঞ্জা উল্টে দিয়ে দার্শনিক ভঙ্গিতে জানায়, কলকাতা এমন এক শহর, এখানে কে কখন তার গন্তব্যে পেঁছুতে পারবে, কেউ জানে না। মূল্যবান তথ্যটি জানাবার পর স্টিয়ারিংয়ে ফের হাত রেখে গোঁফদাড়ির জঙ্গলের ভেতর সাদা ধবধবে দাঁত বার করে হাসে।

জয়ন্ত ঘাবড়ে যায়। বলে, 'এ রকম জ্যাম প্রায়ই হয় নাকি ?'

আচমকা গলার স্বর খানিকটা উঁচুতে তুলে শিখ বলে, 'হর রোজ, হরবখত, সুবেহসে রাত বারহ তক।'

'এর ভেতর কাজকর্ম হয় কী করে ?'

'হো যাতা।'

ট্যাক্সিওলা হয়তো বোঝাতে চাইল, এ শহরে চূড়ান্ত অনিয়মই একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এর মধ্যেই সব চলছে, কোনও কিছুই আটকে থাকে না।

অসুস্থ বোধ করলেও লোকটার সঙ্গে কথা বলতে ভালই লাগছিল। তার বলার মধ্যে একটা নিরাসক্ত অথচ মজাদার ভঙ্গি রয়েছে। এ শহরের সমস্ত রকম বিশৃঙ্খলাকে সে নিজের মতো করে মেনে নিয়েছে যেন। জয়ন্ত কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কোনও অভাবিত

উপায়ে সামনের গাড়িগুলো হুড়মুড় করে ছুটতে শুরু করে, খুব সম্ভব জ্যাম আলগা হয়ে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেছে।

এর জন্যই যেন ওত পেতে ছিল শিখ ড্রাইভার। বিদ্যুৎগতিতে ফের স্টার্ট দিয়ে গাড়িটাকে কয়েক ফার্লং ছুটিয়ে একটা চওড়া ট্রাম রাস্তায় নিয়ে তোলে। তারপর ডাইনে তাকিয়ে আতঙ্কগ্রস্তের মতো চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে ব্বাস, জুলুস!' বলেই দাঁতে দাঁত চেপে স্টিয়ারিংয়ে একটা পাক দিয়ে গাড়ির মুখ বাঁ দিকে ঘোরাতে থাকে।

ডান দিক থেকে গোটা রাস্তা জুড়ে বিশাল মিছিল আসছে। কত যে মানুষ, ফেস্টুন, ফ্ল্যাগ আর প্ল্যাকার্ড, হিসেব নেই। আকাশ ফাটিয়ে ঘন ঘন স্লোগান উঠছিল।

'আমাদের দাবি—'

'মানতে হবে, মানতে হবে।'

'কালা কানুন—'

'পুড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও।'

কালা কানুন কী, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। লন্ডন থেকে হঠাৎ এসে পড়া জয়ন্তর পক্ষে বোঝা সম্ভবও নয়।

মিছিলটা একশ' গজের ভেতর এসে পড়েছে। এদিকে ড্রাইভার গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে। বাঁ দিক ধরে এখন সেটা ছুটে চলেছে। সেটার পেছনে ঝাঁকে ঝাঁকে বাস ট্যাক্সি ট্রাক উদভ্রান্তের মতো পড়িমড়ি করে দৌড়ে আসছে।

খানিকটা যাবার পর স্পিড কমিয়ে ড্রাইভার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। টেনশান থেকে এখন সে খানিকটা মুক্ত। বলে, 'বচ গিয়া সাব।'

এতগুলো গাড়ি পাগলের মতো দৌড় জয়ন্তকে হতবাক করে দিয়েছিল। এবার সে বলে, 'মানে!'

ড্রাইভার বুঝিয়ে দেয়, মিছিলটা ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে গাড়ি নিয়ে বেরুনো যেত না। যতক্ষণ না ওটা বেরিয়ে যাচ্ছে, আটকে থাকতে হত। কমসে কম ঘণ্টাখানেক হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। গুরুজির কৃপায় ফাঁড়াটা কেটে গেছে।

এতগুলো গাড়ির তাড়াহুড়োর কারণ এবার জয়ন্তর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

মিছিল আর জ্যামের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার পর আর কোনও সমস্যা হয় না। গর্তে ভরা, হাড়গোড় বার করা রাস্তার ওপর দিয়ে টক্কর খেতে খেতে ট্যাক্সি এগিয়ে যায়।

জয়ন্ত চুপচাপ জানালার বাইরে ফের তাকিয়ে ভাবতে থাকে। কার লেখায় যেন পড়েছে, কলকাতা হল সিটি অফ প্রসেশানস—মিছিল নগরী। তার কিঞ্চিৎ নমুনা এখানে পা ফেলার এক ঘণ্টার ভেতরেই পাওয়া গেল। মিছিল ছাড়া আরও একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে, এ শহরের বাড়িঘর বড় মলিন আর নোংরা, কালচে ছোপ-ধরা। বহুকাল ওগুলোর গায়ে রং পড়েনি। তার ওপর বড় বড় হরফে দেওয়ালে লেখা রয়েছে অমুককে ভোট দিন, তমুককে ভোট দিন। বেশ কিছুদিন আগে যে এখানে জেনারেল ইলেকশান হয়ে গেছে, খবরের কাগজে তা পড়েছে জয়ন্ত। তারপরও দেওয়াল লিখন মোছা হয়নি। আশ্চর্য !

জয়ন্ত জানে লণ্ডন কলকাতার চেয়ে অনেক পুরনো শহর। কলকাতার বয়স সবে তিন শ পেরিয়েছে। অথচ লণ্ডন কত ফিটফাট, ছিমছাম, টগবগে। আর কলকাতা সেই তুলনায় কত প্রাচীন, মিইয়ে-যাওয়া, সর্বাঙ্গে তার ক্ষয়।

একসময় বউবাজারে একটা মাঝারি রাস্তা চন্দ্রশেখর দত্ত রোড তাদের পূর্বপুরুষদের বাড়ি 'শান্তি ভবন'-এর সামনে জয়ন্ত এবং তার মালপত্র নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি চলে যায়।

জয়ন্ত শুনেছে, চন্দ্রশেখর নাইনটিনথ সেঞ্চুরির খুব নাম-করা সমাজ সংস্কারক। বিদ্যাসাগর না কার সঙ্গে যেন কোমর বেঁধে অসংখ্য আন্দোলন করেছেন। তিনি ছিলেন তার ঠাকুরদার ঠাকুর্দা বা ওই রকম কিছু। কৃতজ্ঞ কলকাতার মানুষ এই বিখ্যাত সোসাল রিফর্মারটির নামে রাস্তার নামকরণ করেছে। ফলে ভেতরে ভেতরে একটু থ্রিল অনুভব করে জয়ন্ত। কিন্তু চারপাশ দেখে দস্তুরমত দমে যায়।

এখানে আসতে আসতে যা চোখে পড়েছে, চন্দ্রশেখর দত্ত রোড তার থেকে আলাদা কিছু নয়। শ্রদ্ধেয় মানুষের নামে রাস্তা হলেও এখানে ওখানে আবর্জনা ডাঁই হয়ে আছে। চারপাশে নানা

ধরনের ছোটখাটো কারখানা—লেদ মেশিনের, হাওয়াই চটির, টিনের সুটকেসের, প্লাইউডের। তাছাড়া আটা পেষাই, কাঠ চেরাই আর দর্জির দোকানেও কল চলছে। ভোঁতা, কর্কশ, তীব্র, ঘটর ঘটর——রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথায় পাঁচমেশালি শব্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে একটা ভিডিও ক্যাসেটের দোকানে ফুল ভলিউমে হিন্দি ফিল্মের গান বাজানো হচ্ছে।

এই কান-ফাটানো সাউন্ড পলিউসানের ভেতর দিশেহারার মতো কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্ত। দেখেই চিনতে পেরেছে, তবু পকেট থেকে দ্রুত 'শান্তিভবন'-এর বাড়ির একটা কালার ফটো বার করে মিলিয়ে নেয়। তার সামনে ফটোর বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

অবিকল একই বাড়ি তবু অনেক তফাত। ছবির বাড়িটার ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড পলিউসান নেই, রাস্তার আবর্জনা বা দুর্গন্ধ নেই। রঙিন ছবি নানা বিশ্রী ব্যাপার আড়াল করে রেখেছে।

জয়ন্ত যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার চার ফিট দূরে মরচে-ধরা প্রকাণ্ড লোহার গেট কোনও রকমে খাড়া হয়ে রয়েছে। ফটকের পাশে' দেওয়ালের গায়ে ফাটা পাথরের ফলকে বাড়ির নামটা লেখা রয়েছে—'শান্তি ভবন'। গেট থেকে বাড়িটা কম করে দু-আড়াই শ' ফিট ভেতরে। গেট আর বাড়ির মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা সেখানে পাথরের ডানাভাঙা পরী, ফোয়ারার সামান্য একটু অংশ আর প্রচুর আগাছা। বাড়িটা মাঝখানে রেখে বিশাল এলাকা ঘিরে বাউণ্ডারি ওয়াল। দেওয়ালের হালও গেটটিরই মতো—পড়ো পড়ো, ভাঙাচোরা। প্লাস্টার খসে কত জায়গায় যে নোনা-ধরা ইট বেরিয়ে পড়েছে! আবার অনেক জায়গায় বড় বড় ফোকর। দেওয়ালের যেটুকু এখনও টিকে আছে সেখানে অগুনতি ঘুঁটে লাগানো।

ঘুঁটে বস্তুটা কী, এখনও অবশ্য জানে না জয়ন্ত। যাই হোক, সমস্ত পরিবেশটা তার নার্ভের ওপর ভয়ংকর চাপ দিতে থাকে।

[illegible] ঝাঁঝালো রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছিল—জয়ন্ত দু পা এগিয়ে ভেতর দিকে তাকায়। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সে ঠিক করে ফেলে সুটকেশ টুটকেশগুলো গেটের ওধারে নিয়ে গিয়ে একপাশে রেখে জেঠামশায়দের ডাকতে যাবে। সে শুনেছে

STATE CENTRAL LIBRARY AGARTALA
C 2528

কলকাতায় চোর পকেট মার থিক থিক করছে। মালপত্র রাস্তায় ফেলে ভেতরে যাওয়াটা নেহাত বোকামি।

তিন নম্বর সুটকেশ আর দ্বিতীয় ব্যাগটি নিয়ে জয়ন্ত সবে ভেতরে এনে রেখেছে, হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে প্রচণ্ড হইচই ভেসে আসে। চমকে মুখ তুলে তাকায় সে।

বাড়িটা দোতলা। সামনের দিকে বিরাট বিরাট থামওলা, পাথর-বসানো বারান্দা। লম্বা লম্বা বিশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। সিঁড়ি থাম বা বারান্দা—কোনটাই অটুট নেই।

জয়ন্তর চোখে পড়ে একজন বেশ বয়স্ক লোক, বয়স ষাটের অনেকটা ওপরে, পরনে লুঙ্গি এবং হাফ-হাতা পাঞ্জাবি—একটি তরুণীকে ঘাড় ধরে ধাক্কা মারতে মারতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছেন আর সমানে চিৎকার করছেন। কী বলছেন এতদূর থেকে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটি নামতে চাইছে না, ফোঁপাতে ফোঁপাতে কিছু বলছে।

ওদিকে বাড়ির ভেতর থেকে দু'জন বয়স্কা মহিলা, একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে, চোদ্দ থেকে ষোলর মধ্যে তিন-চারটি ছেলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তারাও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সেই তরুণী-টির দিকে আঙুল বাড়িয়ে কী যেন বলে যাচ্ছে। সবাই উত্তেজিত, মারমুখি।

বাড়িতে পা দিতে না দিতেই এমন একটা বিশ্রী ঘটনার সামনে পড়তে হবে, কে ভাবতে পেরেছিল। জয়ন্ত হতবাক দাঁড়িয়ে থাকে।

যিনি তরুণীটিকে জোর করে নামিয়ে আনছেন তাঁর মুখের আদলটা চেনা চেনা লাগছে। উনি খুব সম্ভব বড় জেঠামশাই রাজশেখর। আর সিঁড়ির মাথায় বারান্দায় যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরও অচেনা মনে হচ্ছে না। কেননা, প্রতি বছরই একখানা করে পারিবারিক গ্রুপ ফোটো এখান থেকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেন রাজ-শেখর। আর লণ্ডন থেকে জয়ন্তদের গ্রুপ ফোটো পাঠানো হয় এখানে। তবে যে তরুণীটিকে তাড়ানো হচ্ছে সে একেবারেই অপরিচিত। কারণ রাজশেখর যত ফোটো পাঠিয়েছেন তার একটাতেও এই মেয়েটি নেই।

সিঁড়ি বেয়ে ফাঁকা নিচের জায়গায় খানিকটা আসার পর রাজশেখর তরুণীকে জোরে ঠেলা মেরে সামনের দিকে ছুঁড়ে দেয়। হিংস্র ভঙ্গিতে বলেন, 'হারামজাদি, নষ্ট মেয়েমানুষ—বেরো এখান থেকে—নিকালো—' বলে গেটের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেন।

মেয়েটা ছিটকে মাটিতে পড়তে পড়তে কোনওরকমে টাল সামলে নেয়। সে একটানা কেঁদে যাচ্ছিল। তার চুল উস্কখুস্ক, চোখ ফোলা ফোলা এবং আরক্ত, শাড়ি এলোমেলো—দু এক জায়গায় ছিঁড়েও গেছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে ঘুরে দাঁড়ায়। হঠাৎ তার জলভর্তি চোখে আগুন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তীব্র গলায় সে বলে, 'আমি আপনাদের সহজে ছাড়ব না, আবার আসব। দেখি কত বার আমাকে তাড়াতে পারেন।'

বোঝা যাচ্ছে, এর আগেও কয়েক বার এ বাড়িতে এসেছে মেয়েটি এবং প্রতিবারই তাকে তাড়ানো হয়েছে, হয়তো এভাবে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে।

শরীরের সব রক্ত যেন মাথায় চড়ে যায় রাজশেখরের। কপালের দু'পাশের রগগুলো মোটা হয়ে লাফাতে থাকে। গলার স্বর শেষ পর্দায় তুলে তিনি গর্জে ওঠেন, 'বেশ্যা কোথাকার। আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ। ফের এ বাড়িতে পা ঢোকালে জুতিয়ে তোর হাড় ভেঙে দেব।'

মেয়েটি যেন মরিয়া হয়ে ওঠে, 'আমার সর্বনাশ তো হয়েই গেছে। কিন্তু আপনারা পার পেয়ে যাবেন, তা হতে দেব না।'

'এত কড় কথা! খবরদার—!'

'আপনারা অন্যায়ও করবেন, আবার চোখও রাঙাবেন। চমৎকার!'

'বেরো বলছি—গেট আউট—'

'এতদিন আমি কিছু করিনি, মুখ বুজে অপমান সহ্য করছি'। এবার আমি পুলিশে যাব।'

'তোর যে বাবার কাছে ইচ্ছে যা—'

এদিকে চেঁচামেচি শুনে গেটের কাছে কিছু লোকজন জড়ো হয়েছিল। মেয়েটি আর দাঁড়ায় না। টলতে টলতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো গেটের বাইরে চলে যায়।

জয়ন্ত কী করবে ভেবে উঠতে পারছিল না। মেয়েটির কী দোষ তার জানা নেই। কিন্তু যেভাবে রাজশেখর গায়ের জোরে তাকে তাড়িয়ে দিলেন এবং যে ভাষায় তাকে অনবরত শাসিয়ে গেলেন, সেটা খুব খারাপ লাগছিল। বাবার বড় ভাইটির আচরণ আর কথাবার্তার ধরনে আভিজাত্য বা কালচারের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। যত অন্যায়ই করে থাক, একটি মেয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা ঠিক হয়নি তাঁর।

রাজশেখর উত্তেজিত ভঙ্গিতে গজ গজ করতে করতে বাড়ির দিকে ফিরতে গিয়ে জয়ন্তকে দেখতে পেয়ে থমকে যান। কয়েক পলক তাকে লক্ষ্য করে 'কে?' বলে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসেন।

জয়ন্ত বলে, 'আমি জয়। লণ্ডন থেকে আসছি।' অনেকটা ঝুঁকে রাজশেখরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সে।

রাজশেখরও নিশ্চয় চিনতে পেরেছেন। কেননা জয়ন্তরাও কম ফোটো তো আর এখানে পাঠায় নি! একটু আগে যাকে ঘাতকের মতো দেখাচ্ছিল তার চেহারা আগাগোড়া বদলে যায়। বুকের ভেতর জয়ন্তকে জরিয়ে ধরে গাঢ় স্নেহের গলায় বলেন, 'গেল মাসে তোমাদের একখানা চিঠি পেলাম। লিখলে কলকাতায় আসছ। কবে, কোন ফ্লাইটে আসবে, সেটা তো জানাতে হয়। আমি নিজে গিয়ে তোমাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসতাম।'

জয়ন্ত ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'ভেবেছিলাম, হঠাৎ এসে আপনাদের অবাক করে দেব।'

রাজশেখর হেসে হেসে বলেন, 'তা দিয়েছ। ভেরি ভেরি প্লেজাণ্ট সারপ্রাইজ। এখন বল তো আমি কে?'

'বড় জেঠামশাই।'

রাজশেখর খুব খুশি হন, 'কারেক্ট। ফোটো দেখে আমার মুখ মনে করে রেখেছ দেখছি।' বলেই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পিলারগুলা বারান্দায় এখনও দুই বয়স্কা মহিলা এবং অন্য সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, 'দেখ, কে এসেছে। আমাদের জয়—সূর্যর ছেলে।' জয়ন্তর বাবার নাম সূর্যশেখর।

বারান্দায় চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। বয়স্ক মহিলা দু'টি বাদে বাকি ছেলেমেয়েরা হুড়মুড় করে নিচে নেমে দৌড়ে আসে। খানিক আগে তাদের চোখেমুখে ছিল এক ধরনের উত্তেজনা, এখন আরেক ধরনের—সেই সঙ্গে বিস্ময়, আনন্দ। তারা চোখ গোল গোল করে জয়ন্তকে দেখতে থাকে।

বয়স্ক মহিলা দু'টি নামেননি। তাঁদের একজন বলেন, 'ছেলেটা-কে রোদে দাঁড় করিয়ে রেখ না, ভেতরে নিয়ে এস।'

রাজশেখর তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠেন, 'চল বাবা, চল—'

জয়ন্ত তার মালপত্র দেখিয়ে বলে, 'এগুলো ?'

যে ছেলেমেয়েরা জয়ন্তকে ঘিরে ধরেছিল, রাজশেখর তাদের বলেন, 'তোরা এই সুটকেশ টুটকেশগুলো নিয়ে আয়।'

ছেলেমেয়েগুলো চটপট ব্যাগ সুটকেশ তুলে নেয়।

বাড়ির দিকে জয়ন্তকে নিয়ে যেতে যেতে রাজশেখর জিজ্ঞেস করেন, 'এয়ারপোর্ট থেকে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই।'

রাস্তার অভিজ্ঞতাটা আর জানায় না জয়ন্ত। সামান্য হেসে বলে, 'তেমন কিছু নয়।'

'বললেই হল ! আমি জানি না, এই শহরের হাল কী দাঁড়িয়েছে। রাস্তার গর্ত, ট্র্যাফিক জ্যাম, মিছিল, বেশির ভাগ ট্যাক্সিওলা পাজি। আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। 'লণ্ডনের মতো নিট অ্যাণ্ড ক্লিন শহর থেকে এখানে এলে অসুবিধে না হয়ে পারে ?'

জয়ন্ত উত্তর দেয় না। একটু আগে যে তরুণীটিকে রাজশেখর বাড়ি থেকে বার করে দিলেন তার মুখটা তার মাথায় ঘুরে ঘুরে হানা দিচ্ছে। মেয়েটা সম্পর্কে সে কিছু বলতে যাবে, রাজশেখর বলেন, 'রাস্তায় জ্যাম ট্যাম ছিল ?'

অন্যমনস্কর মতো জয়ন্ত বলে, 'খুব একটা নয়।'

'আর মিছিল ?'

'একটা বড় প্রশেসানের মুখে পড়ে গিয়েছিলাম। ট্যাক্সিওলা পাশ কাটিয়ে গাড়ি বার করে এনেছে।'

প্রাতাট শব্দের প্রথম অক্ষরটির জোর দিয়ে কথা বলার ঝোঁক রাজশেখরের। তিনি বলেন, 'বেঁচে গেছ। নইলে পাকা তিন ঘণ্টার ফেরে পড়ে যেতে। বাড়ি আসতে আসতে সেই বিকেল।'

জয়ন্ত টের পায়, এখানে সবাই জ্যাম এবং মিছিল নিয়ে আতঙ্কিত।

রাজশেখর এবার বলেন, 'ট্যাক্সিওয়ালা মিটারের ওপর কত বেশি আদায় করল?'

জয়ন্ত বলে, 'এক্সট্রা একটা টাকাও না।'

রাজশেখরের চোখ গোলাকার হয়ে যায়। 'বল কী! এমন ধম্মপুত্তুর ট্যাক্সিওলা কলকাতায় আছে?'

দু মিনিটেই জয়ন্ত টের পেয়ে গেছে তার এই বড় জেঠামশাইটি কথাটা একটু বেশি মাত্রাতেই বলে থাকেন। যা বলার তাঁর বক-বকানির মধ্যেই বলতে হবে, নইলে সুযোগ পাওয়া যাবে না। জয়ন্ত ফস করে জিজ্ঞেস করে, 'ওই মেয়েটা কে?'

রাজশেখর দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকান, 'কার কথা বলছ?'

'যে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।' রাজশেখর যে ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন সেটা আর বলে না জয়ন্ত।

রাজশেখর হকচকিয়ে যান। বলেন, 'থার্ড ক্লাশ একটা ছুকরি। নোংরা, বাজে, জঘন্য।'

'কী করেছে সে?'

'এত বড় সাহস, আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে চায়।'

জয়ন্ত হতভম্ব হয়ে যায়। বিমূঢ়ের মতো বলে, 'ব্ল্যাকমেল কেন?'

মেয়েটার প্রসঙ্গ উড়িয়ে দেবার জন্য দু হাত ঝাড়া দিতে দিতে রাজশেখর শশব্যস্তে বলে ওঠেন, 'ওই সব ডার্টি ব্যাপার তোমার শুনে দরকার নেই। ভাল কথা, সূর্য, অর্চনা আর রুমি কেমন আছে? তাদের কথা তো জিজ্ঞেসই করা হয়নি।'

জয়ন্ত বুঝতে পারে, রাজশেখর চান না মেয়েটার সম্পর্কে সে আর কোনও প্রশ্ন করে। তার প্রসঙ্গটা তিনি এড়াতে চাইছেন। এরপর কৌতূহল দেখানোটা অশোভন, রাজশেখর তাতে বিরক্ত হবেন।

সূর্য অর্থাৎ সূর্যশেখর, অর্চনা এবং রুমি জয়ন্তর বাবার মা আর বোন। সে বলে, 'সবাই ভাল আছে।'

আগে আগে রাজশেখর ও জয়ন্ত, পেছনে সুটকেশ টুটকেশ নিয়ে সেই ছেলেমেয়ের দঙ্গল। একরকম শোভাযাত্রা করেই জয়ন্তকে নিয়ে রাজশেখররা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঁচু বারান্দায় উঠে আসে।

বর্ষীয়সী দুই মহিলা গভীর স্নেহে বলেন, 'এস বাবা, এস—'

দু'জনেরই বয়স পঞ্চাশের ওপরে। একসময় তাঁরা যে দুর্দান্ত সুন্দরী ছিলেন, এখনও বোঝা যায়। টকটকে রং অবশ্য জ্বলে গেছে। ত্বক কুঁচকে হাতে মুখে গলায় মাকড়সার জালের মতো সরু সরু দাগ ফুটে বেরিয়েছে। বড় বড় চোখের তলায় চিরস্থায়ী কালচে ছোপ। একদা ঘন চুল ছিল দু'জনেরই। চুল উঠে উঠে কপাল চওড়া আর বড় হয়ে গেছে, সিঁথির দু'পাশ এখন ফাঁকা।

একজনের পরনে সাদা খোলের আধময়লা নকশা-পাড় শাড়ি, গলায় সরু ফিনফিনে হার, কানে দুল, নাকে লাল পাথর-বসানো নাকছাবি, হাতে শাঁখা আর দু'গাছা করে চুড়ি। আরেকজন পরেছেন হালকা রঙের প্রিন্টেড শাড়ি। তাঁর গলার হারটা একটু বেশি চওড়া, শাঁখা এবং লাল কড়ের সঙ্গে তাঁর হাতে তিন গাছা করে চুড়ি, কান-পাশা, তবে নাকে কিছু নেই।

জয়ন্তর বাবা প্রায়ই বলেন, তাঁদের বংশ অনেক কিছুর জন্য বিখ্যাত, তার মধ্যে সৌন্দর্যও একটা। সেটা বড় জেঠামশাই এবং মালপত্র বয়ে আনা ছেলেমেয়েগুলোকে দেখে আগেই টের পাওয়া গিয়েছিল। মহিলা দু'টির চেহারায় সূর্যাস্তের আগের মলিন আভার মতো সৌন্দর্য আর আভিজাত্যের আবছা একটু দ্যুতি এখনও লেগে আছে।

জয়ন্ত দু'জনকে প্রণাম করতে তাঁরা বলেন, 'বেঁচে থাক বাবা।'

রাজশেখর বলেন, 'এরা তোমার কে হয় বল তো ?'

মহিলা দু'জন যে তার দুই জেঠাইমা সেটা বুঝতে পারছিল। কিন্তু কে বড়, কে মেজ তা ধরা যাচ্ছে না। লণ্ডন থেকে একটানা কয়েক ঘণ্টা প্লেনে বম্বে, সেখানে জেট ল্যাগ কাটতে না কাটতেই

আবার প্লেনে কলকাতা, সেপ্টেম্বরের চামড়া-সেঁকা ঝাঁঝালো রোদ, জ্যাম, ধোঁয়া, ধুলো, সাউন্ড পলিউশান—এ সবের মধ্যে ছবিতে দেখা তাঁদের বংশের লোকজনের মুখগুলো তালগোল পাকিয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মতো জয়ন্ত দুই মহিলাকে দেখতে থাকে।

এক মহিলা তার মনোভাব বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেছেন। তিনি বলেন, 'ছেলেটাকে এখন আর 'ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে হবে না। অনেক দূর থেকে এসেছে, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। খেয়েদেয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিক। পরে ওসব হবে। আমি রান্না চড়িয়ে দিই গে। তুমি তাড়াতাড়ি একবার বাজারে যাও।'

রাজশেখর বলেন, 'কেন, তোমার তো রান্না হয়ে গেছে। ফের—'

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে ধমকের গলায় মহিলা বলেন, 'তোমার কী আক্কেল! ছেলেটা এত বছর বাদে বাড়িতে এল। যা রেঁধেছি সে সব ওর সামনে দেওয়া যায়!' গলা নামিয়ে বাজার থেকে কী কী আনতে হবে তার একটা তালিকা মুখে মুখে বলে দেন। পাকা রুই, মাংস, মিষ্টি দই, তালশাস সন্দেশ ইত্যাদি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। কিন্তু জয়কে ওর ঘরে তো নিয়ে যেতে হবে।'

'সে ব্যবস্থা আমি করছি।'

রাজশেখর আর দাঁড়ান না, বড় বড় পা ফেলে বাড়ির ভেতর চলে যান, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা বাজারের থলে হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন।

এদিকে ছেলেমেয়ের দলটা মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মহিলা উনিশ কুড়ি বছরের সেই মেয়েটিকে বলেন, 'ঝুমা, যা তো মা, তোর জয়দাকে ওর ঘরটা দেখিয়ে দে।' অন্য ছেলেমেয়েদের বলেন, 'যা, দাদার ব্যাগট্যাগগুলো নিয়ে যা।'

প্রথমে দুই মহিলা, তারপর ঝুমা, ঝুমার পর জয়ন্ত, সবার শেষ অন্য ছেলেমেয়েরা—এই অর্ডারে সবাই বারান্দা থেকে বাড়ির ভেতর ঢোকে।

এক জেঠাইমা এতক্ষণ কথা বলছিলেন। দ্বিতীয় জন ছিলেন

চুপচাপ। এবার তিনি মুখ খোলেন, 'দিদি, এ বেলা জয় তোমার ওখানে থাক। রাত্তিরে কিন্তু আমার কাছে খাবে।'

রাজশেখরের সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন তিনি যে বড় জেঠাইমা, মোটামুটি অনুমান করেছিল জয়ন্ত। এবার সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। তার মানে দ্বিতীয় মহিলাটি মেজ জেঠাইমা। দু'জনের নামও তার জানা। চারুলতা আর সরস্বতী।

চারুলতা বলেন, 'অত তাড়া কিসের। কিছুদিন তো জয় এখানে থাকছে। থাক না আমার কাছে দু-চারদিন। তারপর তুই খাওয়াস।'

সরস্বতীর মুখ একটু গম্ভীর হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'সেজ বউয়ের কাছেও তো খাবে। তারপর ওর পিসি রয়েছে। সে-ও কি তার ভাইপোকে নিজের কাছে রাখবে না! আমি আর ক'টা দিন পাব বল?'

চারুলতা বলেন, 'অত অধৈর্য হ'স না মেজ বউ। সবে তো জয় এল। সবাই যাতে ওকে সমান আদর যত্ন করতে পারে সেটা পরে দেখা যাবে।'

ঝাপসাভাবে জয়ন্তর মনে পড়ে, তার বাবা বলেছিলেন, কলকাতায় তাঁদের পরিবারটি একান্নবর্তী। এক বাড়িতে তাঁর ভাইরা, তাঁদের স্ত্রীরা এবং ছেলেমেয়েরা থাকে। একই কিচেনে একসঙ্গে তাদের রান্না হয়। সুখে শান্তিতে থাকতে হলে পৃথিবীর প্রতিটি সংসারের এরকম মডেল হওয়াই উচিত। যা নিয়ে বাবার এত গর্ব সেই জয়েন্ট ফ্যামিলিটা যে অবিকল তা নেই, এখানে পা দেবার কয়েক মিনিটের ভেতর টের পেয়ে যায় জয়ন্ত। এক কিচেনে একসঙ্গে সবার রান্না হলে আলাদা আলাদাভাবে জেঠাইমারা তাকে খাওয়াতে চাইছেন কেন? বাবাও হয়তো এখানকার এই খবরটা রাখেন না। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবার মতো সময় এটা নয়। ধোঁয়ায় ধুলোয় এবং ঘামে সারা শরীর চটচটে হয়ে আছে। আগে যেটি দরকার তা হল ঠাণ্ডা জলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্নান।

ওরা বাড়ির মধ্যে চলে এসেছিল। বাইরের মতোই ভেতর দিকটা ভাঙাচোরা। দেওয়াল আর সিলিং থেকে প্লাস্টার খসে খসে ইট

বেরিয়ে পড়েছে। এ কোণ ও কোণে পুরু হয়ে ঝুল জমেছে। মাকড়সার বড় বড় জাল ধুলোর ভারে ঝুলে আছে। সমস্ত কিছু কালচে, মলিন, তেল চিটচিটে। কতকাল এ বাড়ি সারাই বা হোয়াইট ওয়াশ করা হয়নি, কে জানে।

ভেতরে ঢুকলে বাঁ পাশে প্রথমেই বিশাল ড্রইং রুম। তার পাশ দিয়ে লম্বা প্যাসেজ অনেক দূরে চলে গেছে। ড্রইং রুমটায় অনেকগুলো ঢাউস ঢাউস সেকেলে সোফা এলোমেলো পড়ে আছে। সেগুলোর ছেঁড়াখোড়া কভারের ভেতর থেকে স্প্রিং আর নারকেল ছোবড়ার গদি বেরিয়ে পড়েছে। এধারে ওধারে ছড়ানো তিন চারটি তক্তাপোশের ওপর ময়লা বিছানা। একদা সিলিং থেকে বেশ কয়েকটা শ্যান্ডেলিয়ার ঝুলত। এখন সেগুলোর জায়গায় পুরনো মডেলের দু-ব্লেডওলা রং-চটা ফ্যান চোখে পড়ে।

ড্রইং রুমের পর বাঁ দিক ঘেঁসে সারি সারি অনেকগুলো ঘর। ডান পাশে দোতালায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়িটার দু পাশে পেতলের পাত-বসানো কাঠের নকশা-করা বাহারে রেলিং ছিল কোনও এক সময়। এক দিকেরটা আছে। অন্য ধারের রেলিংটার সামান্য একটু অংশ বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে রয়েছে।

চারুলতা বলেন, 'যাও বাবা, ঝুমার সঙ্গে দোতালায় গিয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নাও। হুট করে বাথরুমে ঢুকে মাথায় জল ঢেলো না। একটু পর গরম জল পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠান্ডা জলে মিশিয়ে স্নান করবে।'

জয়ন্ত বলে, 'গরম জলের দরকার নেই। এখানে রোদে যা হিট!'

'নতুন জায়গায় এসেছ। হঠাৎ ঠান্ডা জলে স্নান করলে অসুখ করবে। কয়েকটা দিন গরম-ঠান্ডা মিশিয়ে চলুক।' বলে সরস্বতীকে সঙ্গে করে চারুলতা ড্রইংরুমের পাশের প্যাসেজ ধরে সোজা বেরিয়ে যান।

চারুলতা ঠিকই বলেছেন। লন্ডন থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের এই শহরে থাকার অভ্যাস নেই জয়ন্তর। ওখানকার জল হাওয়া আর কলকাতার জল হাওয়া একেবারে আলাদা। নতুন আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে নিজেকে সইয়ে নিতে হলে চারুলতার কথা মতোই চলা ভাল।

জয়ন্ত এবার ঝুমার দিকে তাকায়। একটু হেসে বলে,'তুমি তো এখন আমার গাইড। চল, কোথায় নিয়ে যাবে।'

ঝুমা মিষ্টি করে হাসে। বলে, 'এখনই শুধু না, যে ক'দিন কলকাতায় আছ, সবসময় আমি তোমার গাইড।' বলে মুখেচোখে মজাদার একটা ভঙ্গি করে।

ঝুমা তার কোন জেঠা বা কাকার মেয়ে, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না জয়ন্তর। তার সুটকেশে এ বাড়ির সবার ছবি আছে। এক ফাঁকে ছবিগুলো বার করে ফের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে।

বংশগত সৌন্দর্যের ছাপটা ঝুমার মধ্যেও খুব স্পষ্ট। তার গলার স্বরটি সুরেলা। খুব অল্পক্ষণই ঝুমাকে দেখেছে জয়ন্ত, এর মধ্যে জেনে গেছে মেয়েটার মধ্যে বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই।

জয়ন্ত বলে, 'তুমি আমার গাইড হবে, ইটস আ প্লেজার।'

'থ্যাংক ইউ। এস ছোটদা—

মাঝখানে জয়ন্তকে রেখে আগে আগে ঝুমা এবং পেছনে সেই খুড়তুতো বা জেঠতুতো ভাইবোনের দলটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে থাকে।

ঝুমা মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ বলে, 'কেন তোমার গাইড হতে চেয়েছি বল তো ?'

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কেন ?'

'তুমি এখানকার কিছু জানো না। কে তোমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কী কাণ্ড করে বসবে, তাই তোমার একজন পাহারাদার দরকার।'

'তুমি শুধু গাইডই না, গার্ডও।'

'একজাক্টলি।'

মেয়েটা একটু ফাজিল ধরনের, তবু তার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভাল লাগছে। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি নিশ্চয়ই পড়াশোনা করছ ?'

ঝুমা মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয়, 'হ্যাঁ।'

'কী পড় ?'

'বি এ। আসছে বার পার্ট টু দেব।'

'পার্ট টু' মানে?

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয় ঝুমা। এখানে যারা অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন কোর্স করে তাদের ফাইনাল পরীক্ষাটা দু পার্টে দিতে হয়। হায়ার সেকেন্ডারির দু'বছর বাদে পার্ট ওয়ান, তার পরের বছর পার্ট টু।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'অনার্সে তোমার কী সাবজেক্ট?'

'মডার্ন হিস্ট্রি।'

'কেমন রেজাল্ট হয়েছিল পার্ট ওয়ানে?'

'ঘষটাতে ঘষটাতে একটা সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছিলাম।'

বাংলা ভাষার স্টক জয়ন্তর খুব বেশি নয়, বিশেষ করে কলকাতার চালু কলোকুয়াল শব্দ তার একেবারেই জানা নেই। সে বলে, 'ঘষটাতে ঘষটাতে মানে?'

'এই খুব কষ্ট টষ্ট করে।'

কথায় কথায় ওরা দোতলায় উঠে এসেছিল। এখানকার হাল একতলার চাইতেও খারাপ। ঝুল, মাকড়সার জাল, প্ল্যাস্টার-খসা দেওয়াল—এসব তো রয়েছেই। তার ওপর বর্ষার জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে সিলিংয়ে আর দেওয়ালে চিরস্থায়ী দাগ ধরে আছে।

বাঁ-পাশের অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে একটা লম্বা প্যাসেজের শেষ মাথায় জয়ন্তকে নিয়ে আসে ঝুমা। ছেলেমেয়ের দলটাও হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল। তারা সুটকেশ ব্যাগট্যাগ নামিয়ে চোখেমুখে অফুরন্ত কৌতূহল নিয়ে জয়ন্তকে দেখতে থাকে।

'শান্তি ভবন'-এর অন্য ঘরগুলোর মতো এ ঘরেরও ভাঙাচোরা দেওয়াল, ফাটা সিলিং, চারিদিকে ছোপ ছোপ জলের দাগ। কিন্তু ঝুলকালি বা মালড়সার জালের চিহ্নমাত্র নেই। মেঝে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। এক ধারে পুরনো আমলের নকশা-করা ভারী খাটে ফিটফাট বিছানা, আরেক ধারে তিনটে ছেঁড়াখোঁড়া সোফা ধবধবে তোয়ালে দিয়ে মোড়া, সেগুলোর সামনে একটা শ্বেত পাথরের সেন্টার টেবল। কী আশ্চর্য, যেখানে কোনও কিছুই আস্ত নেই সেখানে এই টেবলটা একেবারে অক্ষত রয়েছে। আর আছে কাঠের একটা আলমারি আর চার-পাঁচটা বেতের মোড়া।

ঝুমা বলে, 'এই তোমার ঘর।' ডানপাশের দেওয়ালে একটা দরজার দিকে আঙুল বাড়ায় সে, 'ওখানে অ্যাটাচড বাথ। কমোডও আছে। তুমি থাকবে বলে আমি নিজের হাতে ঘরটা সাজিয়ে রেখেছি। তোমাদের লণ্ডনের তুলনায় কিছু নয়, তবু যেটুকু পেরেছি করেছি। কী, পছন্দ হয়েছে?'

এ ঘরের সব কিছুর মধ্যে আন্তরিকতার যে ছোঁয়া রয়েছে তা টের পাওয়া যায়। জয়ন্ত বলে, 'খুব পছন্দ।'

ঝুমা খুশি হয়। বলে, 'এখন জামা গেঞ্জি খুলে ওই সোফায় ব'সো। আমি ফ্যান চালিয়ে দিচ্ছি।'

সম্পর্কে ঝুমা বোন হলেও প্রায় অচেনা এক তরুণী। তার সামনে জামা খুলতে সঙ্কোচ হয় জয়ন্তর। সে বলে, 'যখন স্নান করব তখন খুলব।'

ঝুমা দারুণ বুদ্ধিমতী। মনের কথা চট করে ধরে ফেলতে পারে। বলে, 'আমি না তোমার বোন। বোনের কাছে লজ্জা কিসের? ঘামে গরমে সেদ্ধ হচ্ছ, তবু খুলবে না! খোল বলছি।'

এমন মেয়ের কাছে কতক্ষণ আর সঙ্কোচ থাকে! জয়ন্ত জামা গেঞ্জি খুলে মেঝেতে রেখে সোফায় বসতে বসতে হেসে ফেলে। বলে, 'তুমি তো খুব ধমকাতে পার।'

'আমার কথা না শুনলে ধমক, বকুনি সব খেতে হবে।' বলে সুইচ টিপে সিলিং থেকে নেমে আসা দুই ব্লেডের ফ্যানটার দিকে তাকায় ঝুমা। পাখাটার নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। হতাশ গলায় বলে, 'এই যাঃ—'

একটু অবাক হয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কী হল?'

'কী আবার, লোডশেডিং—কলকাতার যা স্পেশালিটি।' ঝুমা বলতে থাকে, 'একেবারে পাওয়ার কাট ঘাড়ে করে এ বাড়িতে ঢুকলে ছোটদা! লণ্ডনে ফিরে গিয়ে এই এক্সপিরিয়েন্সটার কথা বলতে পারবে।

কলকাতার লোডশেডিং বা পাওয়ার কাটের ব্যাপারটা জয়ন্তর অজানা নয়। লণ্ডনে অনেকের মুখে শুনছে, কাগজেও পড়েছে। লোডশেডিং হওয়ায় এইটুকুই বাঁচোয়া, রাস্তার নানারকম আওয়াজ

আর মাইক থেমে গেছে। সে বলে, 'লোডশেডিং কতক্ষণ চলবে ?'

'তার কি কোনও ঠিক আছে ? দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টাও কণ্টিনিউয়াস চলতে পারে। আবার যদি কেবল ফল্ট হয়, বার-চোদ্দ ঘণ্টা নো লাইট, নো ফ্যান। শুধু ঘেমে বয়েল্ড হতে থাকো।'

একটা কথা ভেবে জয়ন্ত বেশ মজা পায়। কলকাতায় সে পৌঁছেছে ঘণ্টা দেড় দুই আগে। এর ভেতরে এই শহরের যা যা স্পেশালিটি—মিছিল, ট্রাফিক জ্যাম, লোডশেডিং, নানা টাইপের পলিউশান, সব কিছুরই কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা হল।

ঝুমা জয়ন্তর মুখোমুখি বসে বলে, 'সুইচটা অন করা যাক, কপাল ভাল হলে কারেণ্ট এসেও যেতে পারে।'

ছেড়ে ফেলা জামা-টামা দেখিয়ে জয়ন্ত বলে, 'কাছাকাছি লণ্ড্রি-টণ্ড্রি আছে ? ওগুলো কাচতে দিতে হবে। তা ছাড়া ক'দিন যখন থাকছি, আরও শার্ট ট্রাউজার্স ময়লা হবে।'

'এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। যা করার আমি করব।'

এবার অন্য ছেলেমেয়েগুলোর ওপর জয়ন্তর নজর এসে পড়ে। সে বলে, 'ওদের পরিচয় তো দিলে না। ওরা কোন জেঠা কোন কাকার ছেলেমেয়ে ?'

'আমি কিছু বলব না। বড় জেঠার সেই ধাঁধাটার কথা মনে আছে ?'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, আমিই বলে দেব, কে কার ছেলে বা মেয়ে।'

জয়ন্তরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে 'শান্তি ভবন' -এর সামনের অংশটা তো দেখা যায়ই, পেছন দিকের সবটাই চোখে পড়ে। পেছনেও অনেকটা জায়গা, তবে সামনের মতো ফাঁকা নয়। ইটের দেওয়ালের মাথায় অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দিয়ে অনেকগুলো ঘর তোলা হয়েছে।

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ পেছনের চালাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে জয়ন্ত। তার কাছে এ বাড়ির যে ছবিটা রয়েছে তাতে চালাগুলো নেই। বাবার কাছেও এগুলো সম্পর্কে সে কিছু শোনেনি।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'ওখানে কারা থাকে ?'

ঝুমা বলে, 'ভাড়াটেরা।'

'ভাড়াটে ?'

'হ্যাঁ। ভাড়া না দিলে আমাদের চলবে কী করে ? খাব কী ?'

কাকা বা জেঠামশাইরা কি কিছুই করেন না যে ভাড়ার টাকায় খেতে হবে ? এ ব্যাপারে বাবা কি তাকে কিছু বলেছিলেন ? জয়ন্ত মনে করতে পারে না।

একসময় আচমকা মাথার ওপর ঘটাং ঘটাং আওয়াজ করে ফ্যান ঘুরতে শুরু করে। ঝুমাকে বেশ উৎফুল্ল দেখায়। গলার স্বর সামান্য উঁচুতে তুলে সে বলে, 'যাক বাবা, খুব একটা ভোগায়নি। তোমার অনারে কারেন্টটা আজ তাড়াতাড়িই এসে গেছে। কলকাতার বেশি বদনাম করতে পারবে না।'

জয়ন্ত একটু হাসে। বাইরের রাস্তায় সেই পাঁচমেশালি শব্দ আর মাইক কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল। কারেন্ট ফিরে আসায় আবার সেগুলো নতুন উদ্যমে শুরু হয়ে গেছে। জয়ন্ত বলে, 'কী সাঙ্ঘাতিক নয়েজ পলিউশান ! এখানে কি সারাক্ষণ এরকম শব্দ হয় ? লাউড-স্পিকারে গান বাজে ?'

'হ্যাঁ। শুধু লোডশেডিং-এর সময়টা বন্ধ থাকে।'

মজার গলায় জয়ন্ত বলে, 'লোডশেডিং-এরও তা হলে কিছু ইউটিলিটি আছে।'

ঝুমা হাসতে হাসতে বলে, 'তা আছে। তোমাদের লন্ডনে এরকম মাইক বাজে না ?'

'ইমপসিবল।' জয়ন্ত বলে, 'আওয়াজ করে কেউ অন্যকে ডিস্টার্ব করলে পুলিশ তক্ষুনি অ্যারেস্ট করবে। এখানে সেরকম আইন নেই ?'

'হয়তো আছে, আমি ঠিক জানি না। তবে লন্ডনের সঙ্গে কলকাতার অনেক তফাত। যে লোকটার দোকানে মাইক বাজছে সে ইলেকশানে পলিটিক্যাল লিডারদের হয়ে খাটে যে। কে তাকে অ্যারেস্ট করবে ?'

'মানে ?'

একদিনে এত সব মাথায় ঢুকবে না। বুঝতে হলে কলকাতায় বেশ কিছুদিন তোমার থাকা দরকার।'

কলকাতার শব্দদূষণ নিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ সেই মেয়েটিকে মনে পড়ে যায় জয়ন্তর। রাজশেখর যদিও তার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে বারণ করেছেন তবু তাকে ভোলা যাচ্ছে না। মেয়েটার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, জয়ন্তর ধারণা সে অতটা খারাপ নয়। তাকে এবং এ বাড়ির লোকজনদের ঘিরে কোথায় যেন একটা গোলমাল রয়েছে। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা ওই মেয়েটা কে?'

ঝুমা মুখ তুলে জয়ন্তর দিকে তাকায়, 'কার কথা বলছ ছোটদা?'

'ওই যে, বড় জেঠামশাই যাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলেন। কী করেছে সে?'

ঝুমা চমকে ওঠে, তবে উত্তর দেয় না।

জয়ন্ত এবার বলে, 'কী হল, চুপ করে রইলে যে? মেয়েটা কি সত্যি খুব বাজে?'

দ্রুত চারপাশ দেখে নেয় ঝুমা। অন্য ছেলেমেয়েগুলো এখন আর জয়ন্তকে আগের মতো লক্ষ্য করছে না। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে তারা কী বলাবলি করছে। গলা অনেকখানি নামিয়ে ঝুমা আস্তে আস্তে বলে, 'না, দীপা খুব ভাল মেয়ে।'

'বড় জেঠামশাই যে ব্ল্যাকমেলের কথা বলছিলেন, সেটা কী?'

'সব মিথ্যে। ফলস্ চার্জ করে দীপাকে তাড়ানো হল। এর জন্যে দায়ী বড়দা। হি ইজ আ স্কাউন্ড্রেল। তার জন্যে আমাদের সবার মুখে চুনকালি পড়েছে।'

জয়ন্ত লক্ষ্য করে, চাপা উত্তেজনায় মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে ঝুমার। অত্যন্ত সুশ্রী, মিষ্টি স্বভাবের মেয়েটাকে এখন যেন আর চেনা যায় না। জয়ন্তর মধ্যেও ঝুমার উত্তেজনা খানিকটা চারিয়ে গিয়েছিল। সে তার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'হু ইজ বড়দা?'

'বড় জেঠার বড় ছেলে—রানা।'

'সবার মুখে চুনকালি দেবার মতো সে কী করল?'

হঠাৎ মুখ লাল হয়ে ওঠে ঝুমার। চোখ নামিয়ে সে বলে, 'সে আমি বলতে পারব না। এখানে যখন এসে পড়েছ, সব জেনে যাবে।'

জয়ন্ত একটু চুপ করে থেকে বলে, 'বুঝতে পারছি, রঞ্জনদা ভীষণ অন্যায় কিছু করেছে। আর বড় জেঠামশাই বড় জেঠিমা তাকে শিল্ড করে দীপার ওপরেই সব দোষ চাপাচ্ছেন। আর কেউ না হোক, তুমি তো প্রোটেস্ট করতে পারতে।'

'তা হলে কী কাণ্ড হবে, ভাবতে পার ? এ বাড়িতে ফ্যামিলি পিস যেটুকুও আছে, টোটালি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ঝুমার কথায় একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। নিজেদের বাড়ি এবং বংশ নিয়ে বাবার যত গর্বই থাক, 'শান্তি ভবন'-এ শান্তি-টান্তি খুব একটা অবশিষ্ট নেই। জয়ন্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাইরের প্যাসেজে পায়ের শব্দ শোনা যায়। ঝুমা চকিত হয়ে ওঠে। গলার স্বর আরও এক পর্দা নামিয়ে বলে, 'দীপা আর বড়দা সম্পর্কে যা বললাম, কাউকে কিন্তু ব'লো না। আমরা তা হলে ভীষণ বিপদে পড়ে যাব।'

জয়ন্ত বলে, 'ভয় নেই, কেউ জানতে পারবে না।'

একটি মাঝবয়সী মেয়েমানুষ জলভর্তি বড় অ্যালুমিনিয়ামের বালতি নিয়ে ঘরে ঢোকে। তার শক্ত গড়ন, মজবুত চেহারা, খাটো শাড়ি, এবং মাথায় ওপর চুড়ো করে বাঁধা চুল বুঝিয়ে দেয় সে এ বাড়ির কাজের লোক। পান দোক্তার রসে ছোপানো, দু পাটি কালচে ট্যারাবাঁকা দাঁত বার করে সে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে, 'আমি অন্নদা, তোমাদের বাড়িতে কাজ করি। গরম জল নিয়ে এইচি। বড় বৌদি বললে, রান্না হয়ে এয়েচে। চট করে চানটা সেইরে লাও। বাথরুমে জলের বালতি রেখে ফিরে এসে মুখের হাসিটাকে আরও ছড়িয়ে দিয়ে বলে, 'লতুন দাদাবাবু, বিলেতে ঠেঙে (থেকে) পেথম এলে। দুগ্‌গো পুজো এসে গেচে। লতুন শাড়ি পাব্বনি চাই কিন্তুক।'

জয়ন্ত হাসে, 'ঠিক আছে।'

খুশিতে ডগমগ হয়ে বাতাসে ঢেউ তুলে অন্নদা চলে যায়।

ঝুমা উঠে পড়তে পড়তে বলে, 'তুমি স্নান করে নাও। আমি পরে এসে আলমারিতে তোমার জামা প্যাণ্ট-ট্যাণ্ট গুছিয়ে দিয়ে যাব।'

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কখন আসবে ?'

'আমারও তো স্নান-টান হয়নি। স্নান সেরে, খেয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে আসছি।'

'তুমি আমার সঙ্গে খাবে না ?'

'না। তুমি আজ বড় জেঠার গেস্ট। যেদিন আমরা খাওয়াব সেদিন একসঙ্গে খাব।' বলে দরজার দিকে দু-পা এগিয়ে আবার ফিরে আসে ঝুমা। জয়ন্তর কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'তোমার কাছে দামি জিনিস টিনিস আছে ?'

জয়ন্ত বলে, 'সবাইকে দেবার জন্যে ক্যামেরা, ঘড়ি-টড়ি এনেছি। দামিই বলতে পার। কেন ?'

উত্তর না দিয়ে ঝুমা বলে, 'আর টাকা ?'

লণ্ডন থেকে কিছু পাউণ্ড এনেছিল জয়ন্ত। বম্বেতে সেগুলো কনভার্ট করে হাজার কয়েক ভারতীয় টাকা পাওয়া গেছে। বাবা ডাক্তার প্যাটেলকে লিখে দিয়েছিলেন জয়ন্তর দরকার হলে তিনি যেন আরও কিছু টাকা দেন। লণ্ডনে ডাক্তার প্যাটেলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আছে, বাবা সেখানে সেই টাকায় যত পাউণ্ড হয়, জমা দেবেন। কলকাতায় তার কতটা কী প্রয়োজন হবে, জানা ছিল না। ডাক্তার প্যাটেল একরকম জোর করেই বাড়তি ছ' হাজার টাকা দিয়েছেন। জয়ন্ত মনে মনে হিসেব করে বলে, 'ইণ্ডিয়ান কারেন্সিতে তের হাজারের মতো আছে।'

'এ তো অনেক টাকা। ক্যামেরা ট্যামেরা আর টাকাগুলো আজ আলমারিতে তালা দিয়ে রাখবে। এখন আর হবে না, কাল ফার্স্ট আওয়ারে আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা অ্যাকউণ্ট খুলে টাকাগুলো জমা দেবে। যখন যেমন দরকার, তুলে নিলেই চলবে।'

বেশ অবাকই হয়ে যায় জয়ন্ত। কপাল কুঁচকে চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করে, 'অ্যাকাউণ্ট ওপেন করতে হবে কেন ? চুরি যাবার ভয় আছে নাকি ?'

স্থির চোখে জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ঝুমা বলে, 'ছোটদা প্লিজ ডোণ্ট আস্ক মি এনি কোশ্চেন। উত্তর দেব না। আমি যা বলছি শুধু সেটুকু করবে। আরেকটা কথা—'

'কী ?

'কেউ যদি তোমার কাছে টাকা চায়, দেবে না। বলবে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সামান্য কিছু টাকা স্যাংশন করেছে। তার থেকে দিলে তোমার অসুবিধে হবে।'

'কেউ টাকা চাইবে নাকি ?'

'তা জানি না। তবে চাইবে না, এমন কোনও গ্যারাণ্টি নেই।'

'কে চাইতে পারে ?'

'এ কথারও উত্তর দেওয়া সম্ভব না। আচ্ছা চলি—'

জয়ন্তর মনে খানিকটা সংশয় ঢুকিয়ে অন্য ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে চলে যায় ঝুমা। আর অন্যমনস্কর মতো একটা ব্যাগ থেকে তোয়ালে, শেভিং বক্স, ঘরে পরার স্ট্রাইপড পাজামা আর ঢোলা শার্ট নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যায় জয়ন্ত।

তিন

দুপুরের খাওয়াটা রীতিমতো বেশিই হয়ে গিয়েছিল, যাকে বলে ভুরিভোজ। ঘি-ভাত, নানারকম ভাজা, মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল, পাকা রুইয়ের কালিয়া, মুরগির মাংস, চাটনি, মিষ্টি দই আর তালশাঁস সন্দেশ।

বাঙালির এই সব সুখাদ্য জয়ন্তর অচেনা নয়। লণ্ডনে মা ছুটির দিনে বাজার থেকে চিকেন, মাটন বা ভাল মাছ টাছ এনে বাংলা রেসিপি অনুযায়ী অনেক ধরনের প্রিপারেশন করে থাকেন, কিন্তু চারুলতার রান্নার কাছে সে সব কিছুই না। বড় জেঠাইমার হাতে ম্যাজিক আছে।

চারুলতা কাছে বসে খুব যত্ন করে জয়ন্তকে খাইয়েছেন। রাজশেখরও পাতের দুফিট দূরে একটা বেতের মোড়ায় বসে তার খাওয়ার তদারক করেছেন। 'লজ্জা করে খেও না বাবা, মাছের পেটিটা তুলে নাও', 'ও কি, দইটা তো সবই পড়ে রইল'—ক্রমাগত এ জাতীয় উপরোধে পাকস্থলীতে যতটা আঁটে তার দ্বিগুণই বোধ হয় খেয়ে ফেলেছে জয়ন্ত। একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে, তার খাওয়ার

সময় চারুলতা আর রাজশেখর ছাড়া ধারে কাছে আর কেউ ছিল না, খুব সম্ভব অন্য সবাইকে আসতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল।

খাওয়া চুকলে তাকে বিশ্রাম করার কথা বলে চলে গিয়েছিলেন চারুলতা আর রাজশেখর। এমনিতে দিনের বেলা ঘুমের অভ্যাস নেই জয়ন্তর কিন্তু ভোজটা অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় তার তখন হাঁস-ফাঁস অবস্থা। তা ছাড়া লণ্ডন থেকে বম্বে হয়ে কলকাতায় কয়েক হাজার কিলোমিটার ওড়াউড়ির কারণে শরীরে বেশ ক্লান্তি জমা হয়েছিল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে দু চোখ জুড়ে এসেছে তার।

কার যেন ডাকাডাকিতে ঘুমটা ভেঙে যায়, 'এই ওঠ ওঠ, ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে?'

ধড়মড় করে উঠে বসে জয়ন্ত। এখন দেওয়ালে টিউব লাইট জ্বলছে। মাথার ওপরে ঘটাং ঘটাং করে ফ্যান ঘুরে চলেছে। বাইরে অন্ধকার, ধোঁয়া আর ধুলোর ঝাপসা পর্দা, ওধারে রাস্তায় আলো দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া মাইকের আওয়াজ তো রয়েছেই।

প্রথমটা জয়ন্ত বুঝতে পারল না কোথায় আছে। পরক্ষণে খাটের পাশে ঝুমাকে দেখে নিজেকে কলকাতায় পূর্বপুরুষদের বাড়িতে আবিষ্কার করে ফেলে সে। বিব্রতভাবে একটু হেসে বলে, 'ইস, শুয়ে থাককে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'ঘুম বলে ঘুম! একেবারে মডার্ন রিপ ভ্যান উইংকল। সেই বিকেল থেকে কত বার ডেকে গেছি জানো?' ডান হাত তুলে সবগুলো আঙুল ফাঁক করে ঝুমা বলে, 'পাঁচ বার।'

'সরি। তুমি ব'সো, আমি মুখটা ধুয়ে আসি।'

জয়ন্ত বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, তার আগেই ঝুমা বলে ওঠে, 'এখন আর বসছি না।' সে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

'আরে ব'সো ব'সো, আমার তিন মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'না ছোটদা, বড় জেঠি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে খবর দিতে বলেছে, চা নিয়ে আসছে।'

জয়ন্তর মনে পড়ে গেল, আপাতত সে চারুলতাদের গেস্ট। তাঁরা যখন খাওয়াবেন, এবাড়ির অন্যেরা কাছাকাছি থাকবে না।

জয়ন্ত বলে, 'তুমি তখন বলেছিলে না, আলমারিতে আমার জামা-কাপড় গুছিয়ে দিয়ে যাবে।'

'বড় জেঠি চা খাইয়ে যাক। তারপর আসব। তবে আজ আর গুছনো টুছনো হবে না।'

'কেন ?'

'বা রে, বাড়ির সবার সঙ্গে আলাপ করবে না ? সেটা করতে করতে অনেক রাত হয়ে যাবে। গোছগাছ কাল করব।'

ঝুমা ঠিকই বলেছে। দুই জেঠাইমা, এক জেঠামশায়, ঝুমা আর ছোট ছোট চার-পাঁচটি খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইবোন ছাড়া আর কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি তার। এরা ছাড়া আরও অনেকেই রয়েছে। কী আশ্চর্য, নব্বই বছরের ঠাকুমার কথা তার মনে ছিল না। অথচ আসার সময় বাবা বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন, 'শান্তি ভবন'-এ এসে প্রথমেই যেন ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে।

জয়ন্ত বলে, 'ঠিক আছে, আজকের রাতটা তা হলে ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে মিট করার জন্যেই থাক।'

ঝুমা আর দাঁড়ায় না, ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের প্যাসেজ ধরে ডান দিকে চলে যায়। আর জয়ন্ত বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। কিছু-ক্ষণ বাদে বাইরে বেরিয়ে দেখে রাজশেখর আর চারুলতা ঘরের একধারে সোফায় বসে আছেন।

রাজশেখর সস্নেহে বলেন, 'একটানা চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছ। নিশ্চয় ভীষণ টায়ার্ড হয়ে ছিলে। এখন শরীরটা ঝরঝরে লাগছে তো ?'

সত্যিই ভাল লাগছিল। জয়ন্ত বলে, 'হ্যাঁ।'

চারুলতা বলেন, 'এবার এটুকু খেয়ে নাও। তারপর চা দিচ্ছি।' বলে আঙুল দিয়ে শ্বেত পাথরের টেবিলটা দেখিয়ে দেন।

আগে লক্ষ্য করেনি জয়ন্ত, টেবিলটার ওপর বড় প্লেটে ডজন দুই-য়েক ধবধবে ফুলকো লুচি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, কিসের একটা তরকারি আর সন্দেশ। তা ছাড়া চায়ের সরঞ্জাম—টি-পট, মিল্ক পট চিনির কৌটা, কাপ প্লেট ইত্যাদি।

লুচির পাহাড় দেখে চমকে ওঠে জয়ন্ত। বলে, 'না না, চা ছাড়া আর কিচ্ছু খাব না। ওবেলা যা খেয়েছি তা-ই এখনও হজম হয়নি।'

রাজশেখর প্রবল বেগে দু হাত নাড়তে নাড়তে তার আপত্তি উড়িয়ে দেন। বলেন, 'সামান্য ক'খানা লুচি তো। ইয়াং ম্যান, সূর্য-কে জিজ্ঞেস ক'রো তোমার বয়েসে দু সের মাংস আর একশ খানা লুচি ছিল আমার কাছে নস্যি। বিয়েবাড়িতে বাজি ধরে একবার খেয়ে দশ মিনিট পর আবার ফুল কোর্স খেয়েছি। শাকভাজা থেকে রাবড়ি পর্যন্ত একটা আইটেমও বাদ দিইনি। তোমার বাবাও খুব খেতে পারত।' রাজশেখর বেশ খোশমেজাজে গল্প জুড়ে দেন, 'শুধু কি আমরা দুই ভাই, আমাদের বংশটাই হল খাইয়ের বংশ। ও কি, নাও নাও, স্টার্ট ক'রো।

নানারকম উত্তেজক দৃষ্টান্ত দেওয়া সত্ত্বেও খাওয়ার ব্যাপারে জয়ন্তকে খুব উদ্দীপ্ত করে তোলা যায় না। অনেক বলার পর খান দুই লুচি আর একটা সন্দেশ খেয়ে চা নেয় সে।

চারুলতা এবং রাজশেখরও এক কাপ করে চা নিয়েছেন। খেতে খেতে আর এলোমেলো কথা বলতে বলতে হঠাৎ রাজশেখর জিজ্ঞেস করেন, 'সূর্য কি আসার সময় তোমাকে আমাদের এই বাড়ি সম্বন্ধে কিছু বলেছে?'

জয়ন্ত উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই চারুলতা ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'ও সব এখন থাক। বাড়ির কথা ঠাকুরপোদের সামনে হবে। আলাদা করে আমরা জয়ের সঙ্গে আলোচনা করছি, এটা জানাজানি হলে অশান্তির শেষ থাকবে না। যা একেক খানা ভাই আর ভাইয়ের বউ তোমার!'

চারুলতা শেষ কথাগুলোতে যে বিষটুকু ঢেলে দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় এ বাড়ির মানুষগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কটা কী ধরনের। বিমূঢ়ের মতো জয়ন্ত চারুলতার দিকে তাকায়।

রাজশেখর বলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, পরেই কথা হবে। জয়, সেই কথাটা মনে আছে তো?'

জয়ন্ত বলে, 'কোনটা?'

'তোমাকে ঘিরে আজ আমাদের ফ্যামিলি রিইউনিয়ন হবে। সবিতাকে ফোন করে তোমার আসার কথা জানিয়েছি। ওর বাতের ব্যথাটা খুব বেড়েছে। বলল, ব্যথাটা কমলে আসবে।

সবিতা যে তার পিসিমা, সেটা জয়ন্তর জানা আছে। বাবা বার বার বলে দিয়েছেন, পিসিমার সঙ্গেও যেন সে অবশ্যই দেখা করে। তাঁর কথাটাও মনে ছিল না জয়ন্তর। পিসিমা সম্পর্কে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে কিন্তু বলা হয় না।

হঠাৎ চোখমুখ কুঁচকে চাপা তীক্ষ্ন গলায় চারুলতা বলেন, 'ফোন করতে গিয়েছিলে কোন মুখে? ছিঃ, ঠাকুরঝিরা তোমাদের না ঘেন্না করে! পাঁচ বছরের ভেতর ওরা কখনও এ বাড়িতে পা দিয়েছে!'

চোখের কোণ দিয়ে একবার জয়ন্তকে দেখে নিয়ে রাজশেখর নিচু গলায় ভীষণ বিব্রতভাবে বলেন, 'আমাদের জন্যে কি আর আসবে, আসবে জয়ের জন্যে। নিজের মুখে বলল—

'যদি আসে আমার নাম ফিরিয়ে রেখ। এতটা বয়েস হল, এখনও ঠাকুরঝির চালটা ধরতে পারলে না? বাতের ব্যথা বলে সে যে এড়িয়ে গেল।' চারুলতার কণ্ঠস্বর থেকে ঝাঁঝ বেরুতে থাকে।

পলকহীন বড় জেঠাইমার দিকে তাকিয়ে ছিল জয়ন্ত। ভেতরকার চেপে-রাখা বিদ্বেষ আচমকা বেরিয়ে এলে একজন সুন্দরী মহিলাকে কতটা খারাপ দেখায় তা দেখতে দেখতে সে অবাক হয়ে যায়।

রাজশেখরের পৌরুষ বার বার ঘা খেয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সেটা মাথা চাড়া দেয়। কিঞ্চিৎ চড়া গলায় তিনি বলেন, 'কী বলছ তুমি! জয় কলকাতায় এল, তার সঙ্গে দেখা করবে না?'

চারুলতা বলেন, 'নিশ্চয়ই করবে। আমার একটা কথা মিলিয়ে নিও।'

'কী?'

'তোমার বড়লোক বোন গাড়ি পাঠিয়ে তার বিলেতের ভাইপোকে তার বাড়ি নিয়ে যাবে।'

'দেখা যাক।'

'দেখো, দেখো।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

জয়ন্ত বুঝতে পারছিল, শুধু ভাইদের মধ্যেই তিক্ততা নেই, একমাত্র বোনের সঙ্গেও রাজশেখরদের সম্পর্কটা সুমধুর নয়।

নিঃশব্দে চা খাওয়ার পর আবহাওয়াটাকে হাল্কা করে নেবার জন্য

চারুলতা জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন। স্নিগ্ধ গলায় বলেন, 'এখন কিছু খেলে না। রাত্তিরে পেট ভরে না খেলে কিন্তু খুব রাগ করব।'

চারুলতা আগের মতোই আবার কোমল, স্নেহপ্রবণ। তাঁর চোখে বিরক্তি বা গনগনে ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। ভদ্রমহিলা যে খুবই তুখোড় অভিনেত্রী, মুহূর্তে মুহূর্তে এক্সপ্রেশান পাল্টে ফেলতে পারেন, এটা জানা ছিল না।

চারুলতা হেসে হেসে এবার বলেন, 'রাত্তিরে মাংসের কোর্মা আর পাঞ্জাবি পরোটা করব।'

জয়ন্ত যে খুব বেশি খায় না, কম ঝাল মশলার হাল্কা খাবার খেতেই অভ্যস্ত, তেল আর ঘি'তে জবজবে স্পাইসি খাদ্য বেশি খেলে তার পাকস্থলী গোলমাল করে বসে—এ সব কে চারুলতাদের বোঝাবে? বললেও তো তাঁরা শুনবেন না। বাবা বহুবার তাকে সতর্ক করে দিয়েছেন, আত্মীয় স্বজনেরা দুঃখ পান, মনে মনে আহত হন, এমন কোনও আচরণ সে যেন না করে। মোটে ক'টা তো দিন। জয়ন্ত কারও অবাধ্য যেন না হয়। গুরুজনদের প্রতি তাকে শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। হতে হবে অতীব নম্র, বিনয়ী আর ভদ্র। কাজেই কলকাতায় যে ক'দিন আছে, পোলাও-কালিয়া রাবড়ি-সন্দেশে রোজ গলা পর্যন্ত বোঝাই করে স্টমাকে একটা পার্মানেন্ট ড্যামেজ ঘটিয়ে তবে লণ্ডন ফিরতে পারবে।

চারুলতা বা রাজশেখরকে ঠেকানো যাবে না। তাই করুণভাবে একটু হাসে জয়ন্ত।

চারুলতা কাপ প্লেট তুলে নিয়ে চলে যান। রাজশেখরও আর বসেন না। 'এখন চলি—' বলে তিনিও চারুলতার পেছন পেছন অদৃশ্য হন।

এরপর জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। তার ধারণা ছিল, চারুলতারা চলে গেলে ঝুমার দেখা পাওয়া যাবে কিন্তু তারও আসার লক্ষণ নেই।

হঠাৎ জয়ন্তর মনে পড়ে, পারিবারিক রি-ইউনিয়নে যাতে বোকা বনতে না হয়, তাই এ বাড়ির লোকজনদের ছবিগুলো একবার খুঁটিয়ে

দেখে নেওয়া দরকার। লেটেস্ট ফ্যামিলি অ্যালবামটা তার সঙ্গেই আছে। তাড়াতাড়ি উঠে একটা ঢাউস সুটকেশ খুলে ফেলে জয়ন্ত। এটায় শুধু অ্যালবামই নেই, সবার জন্যে যে সব গিফট এনেছে, সেগুলোও রয়েছে।

অ্যালবাম বার করে ধীরে ধীরে পাতা ওল্টাতে থাকে জয়ন্ত। প্রতিটি পাতায় একেক জনের ছবি। নিচে তাদের নাম লেখা। কয়েকজনের সঙ্গে তো আলাপ হয়েই গেছে। বাকিদের মুখগুলি স্মৃতিতে ধরে রাখতে চেষ্টা করে জয়ন্ত।

কতক্ষণ ছবির ভেতর ডুবে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ চাপা হাসির আওয়াজে চমকে উঠে মুখ তুলতেই জয়ন্ত দেখতে পায় ঝুমা তার ডান কাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভুরু সামান্য কোঁচকানো। চাপা ঠোঁটে এবং চোখের কালো তারায় মজার হাসি নেচে বেড়াচ্ছে।

চোখাচোখি হতেই ঝুমা বলে, 'পরীক্ষার জন্যে প্রিপারেশন চলছে?'

'কারেক্ট।' জয়ন্ত হেসে ফেলে, 'কখন এলে?'

'মিনিট পাঁচেক।'

'ডাকো নি কেন?'

'তোমার কনসেনট্রেশন নষ্ট করতে চাই নি। ছবিতে যে মুখগুলো দেখলে, মনে করে রাখতে পারবে তো?'

একটু চিন্তা করে জয়ন্ত বলে, 'মনে হচ্ছে পারব।'

ঝুমা বলে, 'তা হলে এখন চল। সবাই তোমার জন্যে ওয়েট করছে।'

'কোথায়?'

'নিচের বসবার ঘরে।'

অ্যালবামটা হাতে নিয়ে ঝুমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গিয়ে কী মনে পড়ে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সেই বড় সুটকেশটা আরেক হাতে ঝুলিয়ে ফের ঝুমার কাছে চলে যায়।

ঝুমা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার, সুটকেশ নিয়ে যাচ্ছ যে?'

'এটার ভেতর কিছু গিফ্‌ট আছে। একসঙ্গে যখন বাড়ির সবাইকে পাওয়া যাচ্ছে তখন ওখানেই দিয়ে দেব।'

নিচে এসে দেখা গেল ড্রইং রুমটা একেবারে বোঝাই। একটা সোফা ছাড়া বাকি বসার জায়গাগুলো খালি নেই। এ বাড়িতে আসার পর যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তারা তো আছেই, তা ছাড়া আরও অনেককে এখন দেখা যাচ্ছে।

ঘরের ভেতর গুঞ্জন চলছিল। জয়ন্ত ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আর নিচু স্কেলে থাকে না, রীতিমতো হইচই শুরু হয়ে যায়। যাদের সঙ্গে আগে দেখা হয়নি তাদের চোখেমুখে তার সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহল।

গোটা শো'টার কমপিয়ার রাজশেখর। ফাঁকা সোফাটা জয়ন্তকে দেখিয়ে বলেন, 'ব'সো বাবা, ব'সো।' তারপর দুর্দান্ত স্টেজ অ্যাক্টিং-য়ের ঢংয়ে ঘরের অন্য সবার উদ্দেশে বলতে থাকেন, 'আমাদের বংশের রত্ন হল সূর্য—সূর্যশেখর। তার ছেলে, পরম আদরের জয় বহু বছর পর আমাদের কাছে এসেছে, এটা এই পরিবারের পক্ষে বড় আনন্দের দিন। যাতায়াত না থাকলে শুধু চিঠিপত্র আর ফোটো পাঠিয়ে সম্পর্ক রাখা যায় না। জয় যে কষ্ট করে লণ্ডন থেকে এতদূরে নিজেদের বাড়িতে এসেছে, এর জন্যে তাকে কী বলে যে আশীর্বাদ করব বুঝতে পারছি না। একেই বলে নাড়ির টান। বংশের জন্যে, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটির জন্যে এই টানটাই মানুষের আসল ব্যাপার। যতই বিলেতে থাক, সাহেবি কায়দাকানুনে বড় হোক, জয় আমাদের আপনার জনই রয়ে গেছে। রক্তের সম্পর্ক যাবে কোথায়?'

অসীম বিস্ময়ে রাজশেখরের দিকে তাকিয়ে আছে জয়ন্ত। খানিক আগে চারুলতার অ্যাক্টিং দেখেছে, এখন দেখছে রাজশেখরের অ্যাক্টিং, স্বামী-স্ত্রী যদি অভিনয়টা প্রফেশন হিসেবে নিতেন, স্টেজ মাত করে দিতে পারতেন।

'শান্তিভবন'-এ পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত টের পেয়েছে, এ বাড়ির কেউ সুখে নেই। অভাব আর টানাটানির ভেতর সবার দিন কাটছে। অবশ্য ঝুমাও তার আভাস দিয়েছে। তবু তাকে

যত্ন করে ভোজ খাওয়ানো, এত ভাল ভাল কথা বলে রাজশেখরের তাকে খুশি করার চেষ্টা—এ সবের পেছনে কোথায় যেন স্বার্থের আঁশটে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কী ধরনের স্বার্থ, সেটাই শুধু ধরা যাচ্ছে না।

একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করেন রাজশেখর, 'জয়ের সঙ্গে আমার মজার একটা চ্যালেঞ্জ হয়েছে। আমরা প্রতি বছর বাড়ির সবার ছবি তুলে ওদের পাঠাই। ওরাও নতুন ছবি পাঠায়। এর ফলে জানতে সুবিধে হয় ফ্যামিলি মেম্বারদের কার চেহারা কতটা পাল্টেছে। মানে দূরে থেকে আত্মীয়স্বজনদের আপ-টু-ডেট যতটা খবর রাখা যায় আর কি। এখন এই ঘরে আমরা যারা রয়েছি, জয়কে বলতে হবে কী তাদের নাম, কী তাদের পরিচয়। যদি বলতে পারে, বুঝব, নিয়ম করে ছবি পাঠানো সার্থক হয়েছে। জয়, তা হলে শুরু করে দাও।'

কে যেন রগড় করে বলে ওঠে, 'এ যে আসামীদের আইডেণ্টিফি-কেশনের মতো কাণ্ড দেখছি।'

সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর দারুণ মজা রয়েছে। ঘরের সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে উঠে পড়েছিল। রাজশেখর, চারুলতা, সরস্বতী আর ঝুমার পরিচয় আগেই জানা হয়ে গেছে। ঝুমা তার মেজ জেঠার মেয়ে। এই চারজনকে বাদ দিয়ে প্রথমে ঘরের বয়স্ক ফ্যামিলি মেম্বারদের দিকে এগিয়ে যায় জয়ন্ত। হাতে ছবির অ্যালবামটা রয়েছে। আগে স্মৃতিশক্তির দৌড়টা দেখে নেওয়া যাক। বেগতিক বুঝলে অ্যালবামের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এই শনাক্তকরণ ফাংসানে কয়েকজনকে দেখামাত্রই চেনা গেল। টাক-মাথা বেজায় ভারী চেহারার লোকটির কাছে গিয়ে জয়ন্ত বলে, ইনি মেজ জেঠা আনন্দশেখর। তারপর ঢ্যাঙা, গালভাঙা লোকটা হল বড়কাকা শশিশেখর। শশিশেখরের স্ত্রী মনোরমাকে চিনতেও অসুবিধা হয় না। পাতলা গড়ন তাঁর, বয়স পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ।

একেক জনের নামটাম বলামাত্র ঘরের চারিদিকে হাততালি বাজতে

থাকে। সেই সঙ্গে নানারকম বাহবা শোনা যায় 'সাবাস!' বা 'ফার্স্ট ক্লাস।' বা 'ফুল মার্কস পেয়েছে জয়।'

জেঠা কাকাদের জেনারেশনটা চমৎকার উতরে যাবার পর আত্ম-বিশ্বাস বেড়ে যায় জয়ন্তর। এবার পরের জেনারেশনের পালা। রাজশেখরের দুই ছেলে মৃন্ময় এবং চিন্ময়, যাদের ডাকনাম হল রানা আর রাজা।

বাবাদের জেনারেশন পর্যন্ত নামের সঙ্গে শেখরটা চালু ছিল। তারপর 'শেখর'-এর স্টক ফুরিয়ে যাওয়ায় পরের জেনারেশনের নামগুলো বংশগত স্পেশালিটি হারিয়ে সাদামাঠা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমে রানার কাছে এসে দাঁড়ায় জয়ন্ত। রানার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। ছিপছিপে বেতের মতো চেহারা, নাক-মুখ কাটা কাটা, সরু শৌখিন গোঁফ। পরনে গেঞ্জি আর ট্রাউজার্স। তার সমস্ত চেহারায় কেমন একটা তটস্থ ভাব, চুরি করে ধরা পড়ে যাবার মতো একটা ভয় খুবই যেন স্পষ্ট।

রানার মুখের দিকে তাকাতেই সেই মেয়েটা অর্থাৎ দীপার মুখটা মাথার ভেতর অদৃশ্য কোনও স্ক্রিনে যেন ফুটে ওঠে। ঝুমা যা আভাস দিয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার যে রানা কিছু একটা কেলেঙ্কারি ঘটিয়েছে আর তার ভিক্টিম হল দীপা। রাজশেখর যেভাবে গায়ের জোরে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন, তাও মনে পড়ে যায়।

জয়ন্ত এ শহরের কেউ না, এখানকার কোনও ব্যাপারেই তার বিন্দুমাত্র ইনভলভমেন্ট নেই। তবু রানাকে দেখতে দেখতে ঘৃণা বা বিতৃষ্ণায় তার মুখ নিজের অজান্তে হঠাৎ শক্ত হয়ে ওঠে। কোনও রকমে তার নামটা বলে রাজার কাছে চলে যায় সে।

রাজার বয়স সাতাশ আঠাশ। তার চেহারা রানার ঠিক উল্টো। পেটানো নিরেট স্বাস্থ্য, মাঝারি হাইট, চোয়াড়ে মুখ, ডান ভুরুর ওপর কাটা দাগ, চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে সাদা চুস্তের ওপর পাতলা হাফহাতা পাঞ্জাবি। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, সে উদ্ধত, রগচটা এবং বেপরোয়া। তার মধ্যে কোথায় যেন অনেকখানি নিষ্ঠুরতা লুকনো রয়েছে, চোখের পলকে সেটা বেরিয়ে আসতে পারে।

রাজার নামটা বলার পর নান্টুর কাছে আসে জয়ন্ত। সে যে রাজারই ভাই, বলে দিতে হয় না, একেবারে একই ছাঁচের মুখ। তার বয়স ষোল-সতের। ভারি লাজুক টাইপের ছেলে নান্টু।

নান্টুর ব্যাপারে ফুল মার্কস পাওয়ার পর বাকি যে পাঁচটি ছেলে মেয়ে রয়েছে, তাদের কাছে গিয়ে গোলমাল করে ফেলে জয়ন্ত। এরাই যে তার মালপত্র টানাটানি করে দোতলায় নিয়ে এসেছিল তা মনে আছে। তবে তারা কোন কাকা বা জেঠার ছেলেমেয়ে সেটা ধরা যাচ্ছে না। নানা অ্যাঙ্গল থেকে ছেলেমেয়েগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে জয়ন্ত কিন্তু মেমোরি এখন ঠিক কাজ করছে না। আচমকা হাতের অ্যালবামটা খুলে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ছবির সঙ্গে ছেলে-মেয়েগুলোর মুখ মিলিয়ে দেখতে থাকে সে।

ঘরের চারপাশ থেকে চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়, 'ছবি দেখে বললে চলবে না, চলবে না।'

ঝুমা বলে, 'একশ বার চলবে। কত ছেলেমেয়ে বই দেখে টুকে পাস করে যাচ্ছে! তুমি বল তো ছোটদা—'

সারা ঘরে দমকা ঝড়ের মতো হাসির আওয়াজ ভেঙে পড়ে। তার মধ্যেই ছবি দেখে দেখে নাম বলে যায় জয়ন্ত। '—বাবুল, বাপ্টি, পুপে, মন্টু আর রোমি। আট থেকে পনেরর ভেতর এদের বয়স। এরা সবাই জয়ন্তর বাবার পরের ভাই শশিশেখর, অর্থাৎ তার বড় কাকার ছেলেমেয়ে।

শনাক্তকরণ শেষ করে ফিরে এসে ফের নিজের সোফায় বসতে বসতে জয়ন্ত রাজশেখরকে জিজ্ঞেস করে, 'পাস করতে পেরেছি বড় জেঠু?'

রাজশেখর হেসে হেসে বলেন, 'পেরেছ। তবে শেষ দিকে গোলমাল করায় একশ'র মধ্যে তিরিশ বাদ।'

'তার মানে সেভেন্টি পারসেন্ট মার্কস পেয়েছি। নট ভেরি ব্যাড, কী বলেন?'

মেজ জেঠা আনন্দশেখর গলায় বেশ জোর দিয়েই বলে ওঠেন, 'ব্যাড কী বলছ! এক্সেলেন্ট—এক্সেলেন্ট। তোমার জায়গায় আমি হলে দু'জনের বেশি তিনজনকে চিনতে পারতাম না।'

বড়কাকা শশিশেখর ভাঙা খ্যানখেনে গলায় বলেন, 'একেবারে ফ্লাইং কালার নিয়ে বেরিয়ে গেছো হে—'

একটু চমকে ওঠে জয়ন্ত। এমন অদ্ভুত বিদঘুটে কণ্ঠস্বর আগে আর কখনও শোনেনি সে।

এদিকে ড্রইং রুমের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত সকলকে দেখতে দেখতে হঠাৎ রাজশেখর গম্ভীর গলায় বলেন, 'তোমাদের একটা ব্যাপারে ওয়ার্নিং দিচ্ছি।'

চকিত হয়ে সবাই তাঁর দিকে তাকায়।

রাজশেখর থামেননি, 'জয় যে ক'দিন এখানে আছে কেউ এমন কিছু করো না যাতে ওর ইমপ্রেশান খারাপ হয়ে যায়। মনে রেখো, আমাদের দত্ত বংশের একটা গ্লোরিয়াস পাস্ট ছিল। সূর্যর চিঠি পড়ে বুঝতে পারি, সেই পাস্ট নিয়ে তার, তার স্ত্রী, তার ছেলেমেয়েদের খুব গর্ব। জয় যেন বুঝতে পারে, সেই পাস্টটা এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি।'

রাজশেখর যা বললেন, তার অনেকটাই ঠিক। অতীত নিয়ে সত্যিই বাবার এবং মা'র যথেষ্ট গর্ব আর শ্রদ্ধা। মা-বাবার মতো না হলেও বহুবার শুনে শুনে জয়ন্ত আর তার ছোট বোনেরও এ ব্যাপারে অনেকখানিই আগ্রহ আছে। কিন্তু লাস্ট সেঞ্চুরির গৌরব ও দীপ্তির কিছুই যে আর অবশিষ্ট নেই, সেটা এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা আঁচ করা গেছে। তবু পুরনো মর্যাদার ব্যাপারটা নতুন করে ঝালিয়ে সবাইকে হুঁশিয়ার করার কারণ কী? কয়েক দিনের জন্য অনেক বছর বাদে অনেক দূর থেকে আসা জয়ন্তর চোখে যাতে এ-বাড়ির লোকেরা ছোট হয়ে না যায় তার জন্যই কি এই সতর্কবাণী? তা হলে বুঝতে হবে যেটুকু সে টের পেয়েছে, তাদের বংশ তার চেয়ে অনেক বেশি নষ্ট হয়ে গেছে।

একটু চুপচাপ।

তারপর জয়ন্ত বলে, 'মা আর বাবা সবার জন্যে অল্প কিছু গিফট পাঠিয়েছেন। সেগুলো এখন দিতে চাই—'

গিফট-এর কথায় সবার চোখ চকচকিয়ে ওঠে। রাজশেখর বলেন 'এ তো উত্তম প্রস্তাব। দাও দাও—'

বাকি সকলে মিলে তার কথায় সায় দেয়। উপহারের জন্য তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

প্রকান্ড সুটকেশটা খুলে অনেকগুলো সুদৃশ্য প্যাকেট বার করে টেবিলের ওপর রাখে জয়ন্ত। প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে ধবধবে সাদা কার্ডে একেক জনের নাম লিখে পিন দিয়ে আটকানো। রোল কল করার স্টাইলে নাম পড়ে পড়ে গিফট দিতে থাকে সে।

ঘরের সবাইকে উপহার দেবার পরও দেখা যায় বেশ কয়েকটা প্যাকেট পড়ে আছে। পিসিমা, পিসেমশাই আর তাঁদের দুই ছেলে-মেয়ে আসেনি। কিন্তু এ বাড়িরও আরও কয়েক জন বাকি রয়েছে। হঠাৎ সে বলে, 'ঠাকুমা—ঠাকুমাকে তো দেখছি না।'

রাজশেখর বলেন, 'মার কত বয়স হয়েছে জানো?'

এ খবরটা জয়ন্ত'র জানা। সে বলে, 'এইট্টি ফোর।'

'প্রায় বেড-রিডনই বলতে পারো। মা'র পক্ষে দোতলা ছাদ থেকে এখানে নেমে আসা অসম্ভব। কেউ তোমাকে মা'র কাছে নিয়ে যাবে'খন।'

ঝুমা বলে, 'আমি নিয়ে যাব।'

রাজশেখর বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা-ই নিয়ে যাস।'

একটু ভেবে জয়ন্ত দ্বিধান্বিতভাবে এবার বলে, 'কিন্তু—'

রাজশেখর বলেন, 'কী'?

'ছোট কাকিমা আর তাঁর ছেলে বিল্লুও তো আসেনি।'

ক. গিফট পাওয়ার পর প্যাকেট খুলে সবাই খুশিতে হইচই করছিল। জেঠু ।প্রকান্ড ড্রইং রুমটায় স্তব্ধতা নেমে আসে।

রাজন্তে হকচকিয়ে যায়। তারপর বিমূঢ়ের মতো সবার মুখগুলো গোলমালীরে একবার দেখে নেয়। বাচ্চাগুলোকে বাদ দিলে প্রতিটি মুখ 'তাঁর মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। শুধু ঝুমা ঠোঁট টিপে চুপচাপ তার ব্যাডং ক তাকিয়ে আছে।

শ্রেজয়ন্ত বুঝতে পারছিল না, ছোট কাকিমাদের সম্পর্কে প্রশ্নটা করে 'ব্যাড্যায় করে ফেলেছে কিনা।

হ' রাজশেখর একসময় থমথমে গলায় বলেন, 'ওই মেয়েমানুষটার নাম তুমি আর ক'রো না।

জয়ন্ত জানে ছোটকাকা বেঁচে নেই। বছর খানেক আগে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। নিজের ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী সম্পর্কে রাজশেখর যে এভাবে বলতে পারেন, ভাবতে পারা যায় না। জয়ন্ত শ্বাস টানার মতো আওয়াজ করে তবু জিজ্ঞেস করে, 'কী করেছেন ছোট কাকিমা?'

হাতঝাড়া দিতে দিতে রাজশেখর বলেন, 'দু-চারদিনের জন্যে এসেছ, এ সব জানতে চেও না।'

দীপার মতোই ছোট কাকিমা অনুরাধার ব্যাপারটা গোপন করতে চাইছেন রাজশেখর। ঝুমার মনোভাব জানে না জয়ন্ত, তবে অন্য সবার যে এ বিষয়ে সায় আছে, সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে।

শশিশেখর কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তাঁর মার্কামারা খ্যানখেনে গলায় বলেন, 'ডার্টি ব্যাপার হে, খুবই অবনক্সাস। ওটা তুমি মাথা থেকে বার করে দাও।'

কেন এত গোপনীয়তা ? ছোট কাকিমা কী এমন অপরাধ করেছেন যে এ বাড়িতে তাঁর নাম উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছে? তিনি যেমনই হোন, যা-ই করে থাকুন, তাদের বংশেরই একজন। যার যত আপত্তি থাক না, তাঁর সম্বন্ধে তাকে জানতে হবে। প্রায় মরিয়া হয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'ছোট কাকিমারা এখন কোথায়?'

'জানি না। জয়, তুমি এ ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু জানতে চেও না। ইন ফ্যাক্ট, তার সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলতে পারব না। তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

এরপরে আর প্রশ্ন করা চলে না। জয়ন্ত শুধু বলে, 'ওঁদের জন্যে কিছু গিফট এনেছিলাম। সেগুলো—'

তাকে শেষ করতে না দিয়ে এবার রাজশেখর আবেগহীন নিস্পৃহ গলায় বলেন, 'ইচ্ছা হলে তুমি ওগুলো অন্য কাউকে দিতে পারো, নইলে লণ্ডনে নিয়ে যেও।' পরক্ষণে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ঝুমাকে বলেন, 'জয়কে ঠাকুমার কাছে নিয়ে যা।'

ড্রইং রুমের ফুরফুরে হাল্কা আবহাওয়াটা মুহূর্তে পালটে যায়। জয়ন্ত বুঝতে পারে, ছোট কাকিমা সম্পর্কে কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে না। আস্তে আস্তে গিফটের বাকি প্যাকেট ক'টা সুটকেশে

পরে সেটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঝুমার সঙ্গে বেরুতে যাবে, রাজশেখর তাকে কাছে ডেকে ফিস ফিস করে কিছু বলেন, জয়ন্ত শুনতে পায় না।

একটু পর সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি দোতলায় উঠতে উঠতে ঝুমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'বড় জেঠা আসার সময় আমাকে ডেকে কী বললে, নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে ?'

কৌতূহল যে একটু-আধটু হচ্ছিল না তা নয়। তবে যা তাকে জানানো হয়নি, গায়েপড়ে সেটা জানতে চাওয়া তার কাছে অভব্যতা। জয়ন্ত উত্তর দেয় না।

ঝুমা রুক্ষ, চাপা গলায় এবার বলে, 'বড় জেঠা বলছিল আমি যেন ছোট কাকিমার সম্পর্কে কিছু না বলি, তোমার কানে ফুসমন্তর না দিই।'

জয়ন্ত বলে, 'ফুসমন্তর কাকে বলে ?'

উত্তর না দিয়ে ঝুমা অদ্ভুত এক ঝোঁকে বলে যায়, 'জানো ছোটদা, বাবা, বড় জেঠা, কাকা—বাড়ির সবাই মিলে ছোট কাকিমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

এ খবরটা জানা ছিল না। এখান থেকে প্রতি মাসেই লন্ডনে চিঠি যায়। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এই ঘটনাটা জানানো হয়নি। জয়ন্ত চকিত হয়ে ওঠে, 'কেন ?'

'তুমি যখন এসে পড়েছো সব জানতে পারবে ?

ঠিক দীপার বিষয়েও এইরকম কিছু একটা বলেছিল ঝুমা। সবটা সে জানায় না। খানিকটা বলে, বেশির ভাগটাই গোপন করে রাখে। হয়তো তার মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করছে। সেটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারছে না ঝুমা।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় আছেন ছোট কাকিমা ?'

ঝুমা বলে, 'ওঁর বাপের বাড়িতে।'

'তাড়ানো হল। কেউ একটা আঙুল পর্যন্ত তুলল না ?'

'সবাই একজোট হয়ে তাড়াল। কে বাধা দেবে ?'

'আর কেউ না দিক, তুমি তো দিতে পারতে। তোমাকে দেখে যথেষ্ট সেনসিবল মনে হয়।'

'আমার জায়গায় এ বাড়িতে থাকলে বুঝতে পারতে কাজটা আমার পক্ষে কত ডিফিকাল্ট। আফটার অল আমি একটা মেয়ে।'

'মেয়ে বলে কী!' জয়ন্তকে রীতিমত উত্তেজিত দেখায়, তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না?'

খুব শান্ত মুখে ঝুমা বলে, 'আমাদের সোসাইটিতে মেয়েরা কোথায় পড়ে আছে, তোমার ধারণা নেই ছোটদা।'

একটু চিন্তা করে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'দীপা আর ছোট কাকিমার ওপর যে ভীষণ অন্যায় করা হয়েছে, সেটা আমাকে জানালে কেন?'

ঝুমা চমকে ওঠে, 'মানে—মানে—'

পুরনো আমলের এই সব বাড়ির ফ্লোরগুলো খুব উঁচু উঁচু। ওরা সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এসেছিল। প্যাসেজ ধরে বাঁ দিকে পাশাপাশি চলতে চলতে একদৃষ্টে ঝুমার দিকে তাকিয়ে ছিল জয়ন্ত। সে বলে, 'তুমি যা পারোনি আমাকে সেটা করতে হবে—সেই জন্যেই কি?'

ঝুমা উত্তর দেয় না।

তার দিকে খানিকটা ঝুঁকে জয়ন্ত বলে, 'দীপা আর ছোট কাকিমার জন্যে খুব কষ্ট পাচ্ছ, তাই না?'

ঝুমা এবারও চুপ।

জয়ন্ত ফের বলে, 'কয়েক দিনের জন্যে এসেছি। কতটা কী করতে পারব, আদৌ কিছু করতে পারব কিনা জানি না। আচ্ছা—'

'কী?'—খুব আস্তে ঝুমা বলে।

'ছোট কাকিমার বাপের বাড়ির ঠিকানাটা জানো?'

'জানি।'

'আমাকে লিখে দিও।'

দোতলায় প্যাসেজের শেষ মাথায় ছাদে ওঠার সিঁড়ি। ঝুমা জয়ন্তকে নিয়ে ওপরে চলে আসে।

চার

'শান্তি-ভবন'-এর ছাদটা প্রকাণ্ড। নানা জায়গায় কার্নিস ভেঙে গেছে, এধারে ওধারে আড়াআড়ি লম্বালম্বি অংখ্য ফাটল। সেগুলোর

ভেতর নানা আগাছা গজিয়ে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে।

একদা, অনেক কাল আগে এ বাড়ির লোকজনের মাথায় রুফ গার্ডেনের শখ চাড়া দিয়ে উঠেছিল। চারিদিকে ভাঙাচোরা অগুনতি পোড়া মাটির টব এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যত্নের অভাবে বা শখ মরে যাওয়ায় বেশির ভাগ টবে গাছটাছ নেই। অফুরন্ত জীবনশক্তি নিয়ে দু-চারটে দোপাটি কি বেলফুলের চারা (জয়ন্ত এসব গাছ চেনে না) কোনও রকমে টিকে আছে।

এই ছাদটা থেকে চারপাশে কলকাতার স্কাইলাইন অনেকখানি চোখে পড়ে।

এ বেলা আর লোডশেডিং হয়নি। যেদিকে যতদূর চোখ যায় বাড়িঘর রাস্তাটাস্তা আলোয় ঝলমল করছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে ডান ধারের একেবারে শেষ মাথায় একটা বড় মাপের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ঝুমা জয়ন্তকে সঙ্গে করে সেখানে চলে আসে। বলে, 'এটা আমাদের গ্র্যানির বেডরুম। চল—'

গ্র্যান্ড মাদার যে চালু কথায় গ্র্যানি, সেটা দেখা যাচ্ছে ঝুমা জানে।

ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে মাথার ওপর একটা বাল্ব জ্বলছে। সেটার ওপর ধোঁয়া আর ধুলোর পুরু কোটিং পড়ায় আলোর তেজ নেই। বিশাল ঘরখানার অন্ধকার তাতে পুরোপুরি কাটেনি, চারপাশ কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একখানা সেকেলে জবরদস্ত খাটের ওপর ময়লা বিছানায় যে বৃদ্ধাটি শুয়ে আছেন তিনি যে তার ঠাকুমা রাজলক্ষ্মী দেবী সেটা জয়ন্তকে না বলে দিলেও চলত। তাঁর দিকে তাকানোমাত্র আঁতকে ওঠে সে। লম্বা আয়ু পাওয়া যে অনেক সময় একটা কার্স—অভিশাপ, সেটা ঠাকুমাকে দেখলে টের পাওয়া যায়।

শরীরে শাঁস বলতে কিছু নেই। সরু সরু রোগা হাড়ের ফ্রেমের ওপর কোঁচকানো ঢলঢলে চামড়া আলগাভাবে ঝুলে আছে। তোবড়ানো গাল ইঞ্চি দুই গর্তে ঢোকানো, জ্যোতিহীন ঘোলাটে চোখ। মাথাটা প্রায় ফাঁকাই। হেজে-যাওয়া শণের আঁশের মতো কিছু চুল খাপচা খাপচা-ভাবে এখানে ওখানে আটকে রয়েছে। সব মিলিয়ে স্কেলিটন।

আঁতকে উঠলেও বৃদ্ধাকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতর এক ধরনের আবেগ টের পায় জয়ন্ত। তাদের যে তিন জেনারেশন এখনও বেঁচে আছে তার রুট বা ওরিজিন হচ্ছে এই মহিলা। এরই রক্তের অদৃশ্য স্রোত বাবার ভেতর দিয়ে তার মধ্যেও বয়ে চলেছে।

বৃদ্ধা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিলেন। ঝুমা ডাকে 'ঠাকুমা—ঠাকুমা—'

আস্তে আস্তে মাথাটা সামান্য কাত করেন রাজলক্ষ্মী। অস্পষ্ট আলোয় চোখের ওপর হাতের আড়াল দিয়ে ক্ষীণ দৃষ্টিতে ঝুমাদের দেখতে চেষ্টা করেন।

ঝুমা জয়ন্তর হাত ধরে রাজলক্ষ্মীর আরও কাছে নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে 'দেখ, কে এসেছে।'

রাজলক্ষ্মী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।

ঝুমা স্বাভাবিক স্বরে বলে, 'বুড়ির নাক কান চোখ—এভরিথিং গন। এমন কি মেমোরিটাও। তবু দেখি চেষ্টা করে।' বলতে বলতে ফের গলা উঁচুতে তুলে বলে, 'ভাল করে দেখ। চিনতে পারছ ঠাকুমা?'

রাজলক্ষ্মী উত্তর দেন না।

কণ্ঠস্বর আরেক পর্দা তোলে ঝুমা, 'তোমার বিলেতের নাতি গো—জয়। তোমার ছেলে সূর্যশেখর, তার ছেলে। মনে পড়ছে?'

বৃদ্ধার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাতের তালু উল্টে দিয়ে ঝুমা বলে, 'নাঃ, আজ আর কিছু হবে না। ঠাকুমা, তোমার কথা ছেড়ে দাও, নিজের ছেলের নাম পর্যন্ত মনে করতে পারছে না। ক'দিন তো আছ, মেমোরিটা যদি এর ভিতর ফিরে আসে—'

জয়ন্ত বলে, 'ঠাকুমার মেমোরির ব্যাপারটা কী? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ঝুমা যা উত্তর দেয় তা এইরকম। বছরখানেক আগে ছাদ থেকে নিচে নামতে গিয়ে রাজলক্ষ্মী পড়ে যান এবং তাঁর মাথায় চোট লাগে। তারপরই বেশ কয়েক বছরের স্মৃতি তাঁর নষ্ট হয়ে যায়। কিছুদিন এভাবে কাটার পর ইদানীং হঠাৎ হঠাৎ স্মৃতিটা ফের ফিরে আসতে

শুরু হয়েছে। তবে খুব অল্পক্ষণের জন্য। দু-চারদিন পুরনো কথা বেশ মনে করতে পারেন। তারপর আবার সব অন্ধকার হয়ে হয়ে যায়। স্মৃতি যখন ফেরে তখনও মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দেয়। পাস্ট এবং প্রেজেন্ট একাকার হয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়।

রাজলক্ষ্মীর জন্য কষ্টবোধ করতে থাকে জয়ন্ত। সে বলে, 'ঠাকুমার যে এই অবস্থা হয়েছে, আমাদের তো কেউ জানায়নি।'

ঝুমা অবাক হয়ে যায়। 'সে কী! বাবা, জেঠা, বড় কাকা— মাঝে মাঝেই তো তোমাদের চিঠি লেখে। জানানো উচিত ছিল। চল, নিচে যাওয়া যাক।'

ঠাকুমার গিফটটার কথা মনে পড়ে জয়ন্তর। সুটকেশ থেকে একটা প্যাকেট বার করে সেটা খুলতেই দামি কাশ্মিরি শাল বেরিয়ে পড়ে। শালটা রাজলক্ষ্মীর গায়ে যত্ন করে জড়িয়ে দেয় জয়ন্ত।

ঝুমা বলে, 'দেখ বুড়ি, তোমার নাতি তোমার জন্যে বিলেত থেকে কী নিয়ে এসেছে।'

রাজলক্ষ্মীর এক্সপ্রেশান অবিকল একরকম, আগের মতোই ফ্যাল-ফ্যালে চোখে তাকিয়ে আছেন।

ঝুমা বলে, 'ঠাকুমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। চল—' রাজলক্ষ্মীকে বলে, 'এখন যাই গো ঠাকুমা—'

সুটকেশটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে জয়ন্ত বলে, 'ঠাকুমা কি একাই ছাদে থাকেন নাকি?'

'পাগল! এইরকম একটা মানুষকে একা ফেলে রাখা যায়? আমরা এখনও অতটা অমানুষ হয়ে যাইনি। সারাক্ষণ কেউ না কেউ এখানে থাকে। তোমার সঙ্গে আলাপ করবে বলে আজ সবাই বসবার ঘরে গিয়েছিল।' ঝুমা বলতে থাকে, 'যতদিন ছোট কাকিমা ছিল, বিল্লুকে নিয়ে রাত্তিরে ঠাকুমার কাছে শুত। এখন আমি এসে শুই, নইলে আর কেউ।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দোতলার প্যাসেজে আসতেই দেখা যায় রাজা দাঁড়িয়ে আছে। সে বলে, 'তোমার জন্যে ওয়েট করছি জয়।' ঝুমাকে বলে, 'তুই তো ফেভিকলের মতো ওর গায়ে সেঁটে আছিস। আমাদের একটু চান্স ফান্স দে।'

জয়ন্ত লক্ষ করে, রাজাকে দেখে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে ঝুমো। সে যে ওকে পছন্দ করে না, সেটা তার মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যাচ্ছে।

ঝুমো বলে, 'সারাদিন বাড়ি ছিলি যে চান্স পাবি ?'

রাজা বলে, 'ও কে গুরু, এবার তুমি হড়কে যাও। জয়ের সঙ্গে আমার প্রাইভেট টক আছে।'

ভুরু কুঁচকে যায় ঝুমোর। সে বলে, 'তোর আবার কী প্রাইভেট টক।'

'আছে, আছে।'

'ছোটদা নতুন এসেছে। ওর সঙ্গে মোটে ঝামেলা করবি না।'

আচমকা মুখের চেহারা পাল্টে যায় রাজার। এখন তাকে খুব হিংস্র দেখাচ্ছে। রুক্ষ, কর্কশ গলায় সে বলে, 'যা বলছি কর। ফুটে যা—ফোট—'

ব্যাপারটা এমন অস্বস্তিকর যে জয়ন্ত কী বলবে ভেবে পায় না। এটা পরিষ্কার রাজা তার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলুক, ঝুমো তা চাইছে না। রাজাকে জয়ন্তরও ভাল লাগছে না। এক মিনিটের মধ্যে টের পাওয়া গেছে, রাজা ছেলেটা রগচটা, অভদ্র, তার ব্যবহার ভীষণ চোয়াড়ে। যে ইডিয়মে ছোট বোনকে সে দাবড়াচ্ছে তার বেশির ভাগটাই জয়ন্তর কাছে দুর্বোধ্য। তবে এটুকু টের পাওয়া যাচ্ছে কোনও শিক্ষিত কালচার্ড ডিসেণ্ট ফ্যামিলির ছেলে এ ভাষায় এভাবে কথা বলে না। এ সব রাস্তার লোফার আর রাফায়েনদের ল্যাংগুয়েজ।

জয়ন্ত একবার ভাবে, রাজাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় তার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলার ইচ্ছা নেই তার। পরক্ষণেই মনে পড়ে, একুশ বছর বাদে সে কলকাতায় এসেছে। আবার কবে আসবে, আদৌ আর আসা হবে কিনা কে জানে। বাবা বার বার বলে দিয়েছিলেন, বাড়ির সবার সঙ্গে সে যেন ভাল ব্যবহার করে। দেখাই যাক না তার সঙ্গে রাজা কী ধরনের 'প্রাইভেট টক' করতে চায়। সে ঝুমোকে বলে, 'রাজাদার যখন এত ইচ্ছে, একটু কথা বলিই না। তুমি ঘণ্টাখানেক বাদে আমার ঘরে এস।'

ঝুমা দাঁতে দাঁত চেপে গনগনে দৃষ্টিতে রাজার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে চোখ ফেরায় না। জয়ন্তর কথার উত্তর না দিয়ে রাজাকে বলে, 'ছোটদা এখানকার কিচ্ছু জানে না। যদি ওকে কোনও গোলমালে জড়াস, আমি তোকে ছাড়ব না—'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ডান হাত তুলে আঙুল নাড়তে নাড়তে ঠোঁট বেঁকিয়ে রাজা বলে, 'আরে যা যা—'

কারুর দিকে আর না তাকিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে সোজা একতলার সিঁড়ির কাছে চলে যায় ঝুমা, তারপর একসঙ্গে দু-তিনটে করে স্টেপ টপকে নিচে নামতে থাকে।

এদিকে মুখের চেহারা পাল্টে হেসে হেসে রাজা বলে, 'চল।'

নিজের ঘরে এসে রাজাকে একটা সোফা দেখিয়ে জয়ন্ত বলে, 'আরাম করে ব'সো রাজাদা।' হাতের সুটকেশটা একধারে নামিয়ে সেও রাজার মুখোমুখি বসে।

রাজা বলে, 'ঝুমাকে কড়কাচ্ছিলাম বলে তুমি হেভি অবাক হয়ে গেছ, তাই না ?'

অবাক হয়নি বরং খুবই ক্ষুব্ধ আর বিরক্ত হয়েছে, সেটা আর বলে না জয়ন্ত। সে চুপ করে থাকে।

রাজা থামেনি, 'আসলে কেসটা কী জানো, তুমি আসবে শোনার পর থেকে তোমার সঙ্গে জমিয়ে আলাপ করব বলে বসে আছি। আর ওই মেয়েটা—ঝুমি খিটির খিটির করে সব কিচাইন করতে চাইছিল। আরে বাবা, তুমি শুধু ঝুমির ভাই নাকি ? আমার সঙ্গে তোমার ব্লাডের রিস্তে নেই ? সব ব্যাপারে মেয়েটা ওস্তাদি ফলাবে। যাক গে, কলকাতা কেমন লাগছে ?'

কলকাতা সম্পর্কে কী বললে রাজা খুশি হবে, জয়ন্ত বুঝে উঠতে পারে না। সবারই নিজের নিজের শহর সম্পর্কে, তা সে যত খারাপই হোক না, গর্ববোধ থাকে। ভাসাভাসাভাবে সে বলে, 'কেন, ভালই তো।'

জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে রাজা বলে, 'লন্ডন থেকে এসে এ শ্লা'র শহর কারুর ভাল লাগতে পারে ! কলকাতা ফিনিশ হয়ে গেছে —বিলকুল পয়মাল সিটি। দু-চারদিন থাকো, এখান থেকে কেটে পড়ার

জন্যে পাগলা হয়ে যাবে।' একটু থেমে বলে, 'কলকাতা বাদ দাও, আমাদের বাড়িটা কেমন লাগল, তাই বল।'

এখন পর্যন্ত সবাই তার সঙ্গে সস্নেহ ও সহৃদয় ব্যবহার করেছে। কারো বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই জয়ন্তর। উদ্দীপ্ত মুখে সে বলে, 'এক্সসেলেণ্ট।'

মুখ মচকে অদ্ভুত হাসে রাজা। তারপর বলে, 'সবে তো এখানে 'ইন' করলে। ক'টা দিন থাকলে বুঝবে 'শান্তি-ভবন'-এর মালেরা কী একেকখানা স্যাম্পল। মাথা খারাপ করে ছাড়বে।'

চোয়াড়ে, আনকালচার্ড, রাফায়েন—এ জাতীয় বাছা বাছা বিশেষণই হয়তো রাজার সম্বন্ধে খাটে, তবু তার মধ্যে কোথায় যেন খোলামেলা সহজ একটা ব্যাপার আছে যা মোটামুটি খুব খারাপ লাগে না।

রাজা যা বলেছে সে সম্পর্কে কমেণ্ট করা ঠিক হবে না। আলোচনাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য জয়ন্ত বলে, 'তুমি এখন কী করছ—পড়াশোনা, না সার্ভিস ?'

মাথাটা এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধ পর্যন্ত সেমি সার্কেলে ঘুরিয়ে নিয়ে রাজা বলে, 'কোনওটাই না।'

জয়ন্ত বেশ অবাক হয়ে যায়। বলে, 'মানে ?'

'ফার্স্ট, লেখাপড়ার ব্যাপারটা শোনো। চার বার ফেল করে; পাঁচ বারের বার স্রেফ বই ফেলে টুকে ঘষটাতে ঘষটাতে স্কুল ফাইনালের রাউন্ডারি পেরিয়েছি।'

'ঘষটাতে ঘষটাতে', কথাটা এই নিয়ে দু'বার শুনল জয়ন্ত। সে বলে 'তারপর ?'

'তারপর আর কী, মা সরস্বতীর পায়ের কাছে বডি ফেলে লম্বা সেলাম ঠুকে রিটায়ার করে ফেললাম।' নিজের মাথায় আস্তে আস্তে টুসকি মারতে মারতে রাজা বলে, 'সলিড স্টোন, এর ভেতর লেখাপড়া-ফড়া ঢুকবে না। আর চাকরি বাকরি ?'

'হ্যাঁ, মানে—'

'স্কুল ফাইনালের সার্টিফিকেট ছাড়া আর কিছু নেই জানলে কলকাতার কোনও অফিসের দারোয়ান ভেতরে ঢুকতে দেয় না।'

'তাহলে ?'

'কী করছি, তাই জানতে চাইছো তো ?'

'হ্যাঁ। এই—' বলতে বলতে বিব্রতভাবে থেমে যায় জয়ন্ত।

সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে রাজা বলে, 'চামচাগিরি করছি। ওটাই এখন আমার হোল টাইম জব। তার জন্যে কিছু ক্যাশ ফ্যাশ পাই।'

চামচাগিরি ব্যাপারটা হিন্দি ছবির দৌলতে লন্ডন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু সেটা যে কারও সারাক্ষণের কাজ হতে পারে তা জানা ছিল না জয়ন্তর। বিমূঢ়ের মতো সে তাকিয়ে থাকে।

তার মনোভাবটা বুঝতে পেরেছিল রাজা। বলে, 'বুঝতে পারছ না নিশ্চয়ই ?'

'না। ঠিক—'

'আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের এখানে এই এরিয়ার পলিটি-ক্যাল লিডার ঝন্টেদার হয়ে ইলেকশানে খাটি। বাকি সময় তার গায়ের সঙ্গে সেঁটে থেকে কেত্তন গেয়ে যাই।'

'কেত্তন মিনস—'

'আরে বাবা, ঝন্টেদাকে বলি আপনার মতো লিডার ওয়ার্ল্ডে জন্মায়নি। নেতাজি, নেহরু, গান্ধি, মার্ক্স—সব আপনার কাছে স্রেফ নস্যি।'

'ইলেকশানের সময় কী করতে হয় ?'

'অপোজিশান পার্টির ওপর পেটো মানে বোমা ঝাড়তে হয়, বুথ জ্যাম করতে হয়, ফলস ভোটের ব্যবস্থা করতে হয়। সে অনেক কারবার।' যা যা করে থাকে, ডিটেলে সে সব বুঝিয়ে দেয় রাজা।

শুনতে শুনতে চোখ গোল হয়ে যায় জয়ন্তর। সে বলে, 'এখানে এভাবে ইলেকশান হয় নাকি! ব্রিটেনে তো—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিতে দিতে রাজা বলে, 'তোমাদের ব্রিটেন আর আমাদের ইন্ডিয়া এক জিনিস নয় জয়। ইলেকশানের ঝুটঝামেলা ছেড়ে এবার আসল কথাটা বলি—'

জয়ন্তর মনে পড়ে যায়। সে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কী একটা প্রাইভেট টক যেন ছিল তোমার ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে রাজা, খুব সম্ভব মনে মনে বক্তব্যটাকে ভাল করে গুছিয়ে নেয়। সে বলতে যাবে, হঠাৎ পায়ের আওয়াজ আসে বাইরে থেকে। কে যেন প্যাসেজ ধরে এ মাথায় থেকে ও মাথা চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে, ফের ও মাথায় চলে যায়। এভাবে যাতায়াত চলতে থাকে।

জয়ন্তরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে প্যাসেজার সামান্য একটা টুকরো চোখে পড়ে। ফলে পায়ের আওয়াজ ছাড়া কে যাওয়া আসা করছে বোঝা যাচ্ছে না।

রাজা চট করে উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা একবার দেখে দরজা ভেজিয়ে ফের নিজের সোফায় এসে বসে। বলে, 'তোমার কাছে আসার জন্যে একজন পাগলা হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। আমার এক্সিট হলেই সে সট করে ঢুকে পড়বে।'

'কে?'

'এলেই দেখতে পাবে। তা ছাড়া, আমার মনে হয়, তোমার ঘরে 'ইন' করার জন্যে আরও অনেকেই ওয়েটিং লিস্টে রয়েছে। যাক বাবা, আমার কাজটা কুইক ফিনিশ করে ফেলি।'

জয়ন্ত উৎসুক মুখে অপেক্ষা করতে থাকে।

রাজা গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বিলেতে থাকো, নিশ্চয়ই ড্রিংক ট্রিংক করো।'

জয়ন্ত চমকে ওঠে। ঠিক এরকম একটা প্রশ্ন আশা করেনি সে। নেশা টেশার অভ্যাস নেই তার। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বিয়ারটা একটু আধটু খায় ঠিকই, এই পর্যন্ত। একবার কি দু'বার শখ করে হুইস্কি খেয়েছিল, কিন্তু তার টেস্ট একদম ভাল লাগেনি।

রাজা দারুণ অন্তরঙ্গ গলায় এবার বলে, 'আরে আমি দাদা হই বলে লজ্জা করছে? ফ্রেন্ড ভেবে নাও—দোস্ত, জিগরি দোস্ত।'

জয়ন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কী বলবে, ঠিক করতে পারে না।

রাজা গলাটা আরও কয়েক পর্দা নামিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'লন্ডনে লাইফ কাটাচ্ছ। লজ্জা ফজ্জাগুলো ঝেড়ে ফেলে বলো তো ক' বোতল মাল এনেছ?'

'মাল ?'

'আরে বাবা হুইস্কি।'

'বিলিভ মি, ও সব কিছু আনিনি। আমি হুইস্কি খাই না।'

রাজার বিশ্বাস হয় না। সন্দিগ্ধভাবে বলে, 'আমাকে কাটাতে চাইছ কিন্তু তোমার বড় জেঠা, মেজ জেঠা, কাকা—এরা যখন এসে চাইবে তখন তো সটাসট বার করে ফেলবে।'

জয়ন্ত চমকে ওঠে, 'ওঁরা আমার কাছে হুইস্কি চাইবেন !'

'আমি একবার বেরিয়ে যাই তখন দেখো। তোমার কাছে বিলিতি মাল পাবে বলে কেউ আজ আর কালীমার্কা টেনে বাড়ি ঢোকেনি।'

'কালীমার্কা কী ?'

'দিশি, দিশি চিজ। প্লিজ জয়, গরীব দাদাকে ঝুলিয়ে না রেখে একটা বোতল দাও না।'

জয়ন্ত এবার একটু কড়া গলায় জানায়, সত্যিই সে হুইস্কি-টুইস্কি আনেনি। রাজা যদি বিশ্বাস না করে তার কিছু করার নেই।

অনেক টানা-হ্যাঁচড়ার পর যখন কিছুই আদায় করা গেল না তখন বেশ হতাশভাবেই দু'হাতের তালু চিত করে দিয়ে রাজা বলে, 'যাঃ শ্লা, রাতটা তোমার জন্যে এক্কেবারে বেকার হয়ে গেল। ভাই, স্লাইট হেল্প করবে ?'

'কী হেল্প ?'

'আজ আমার ক্যাশ একটু শর্ট আছে। পাঁচখানা দশ টাকার পাত্তি দাও।'

'পাত্তি মিনস হোয়াট ?'

'নোট, নোট। ওনলি পঞ্চাশটা টাকা।'

সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক কোনও পদ্ধতিতে ঝুমার সেই ওয়ার্নিংটা মনে পড়ে যায় জয়ন্তর। সে বলে, 'আমি টুরিস্ট হিসাবে এখানে এসেছি। জানোই তো, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আজকাল টুরিস্টদের বেশি টাকা দেয় না। যা দিয়েছে তাতে যে ক'দিন আছি চালাতে পারব কিনা কে জানে।'

রাজা তার কথা কানেই তোলে না। জানায়, বিলেতের লোকেরা এমন মক্ষিচুষ হয় তার ধারণা ছিল না। ফিফটি রুপিজ আবার একটা

টাকা। শেষ পর্যন্ত দু'খানা দশ টাকার নোট আদায় করে সে ঘর থেকে বেরুল।

তারপর দু' মিনিটও কাটে না, দরজার কাছ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'জয়, তুমি কি খুব ব্যস্ত?'

জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে দেখে টাক-মাথা মোটা থলথলে চেহারার মেজ জেঠা অর্থাৎ আনন্দশেখর। তার উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি ভেতরে ঢুকে পড়েন এবং কিছুক্ষণ আগে রাজা যেখানে বসে ছিল সেই সোফাটায় বসে পড়েন। কোনওরকম ধানাই-পানাই না করে বলেন, 'সেই স্যাংস্ক্রিট শ্লোকটা জানো?'

বিমূঢ়ের মতো জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কোনটা?'

'প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ—'হাসি হাসি মুখ করে জয়ন্তর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকেন আনন্দশেখর।

জয়ন্ত আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানায়, সংস্কৃত সে শেখেনি আর ওই শ্লোকটা তার কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। তবে এটুকু জানে স্যাংস্ক্রিট ভারতবর্ষের খুব প্রাচীন ভাষা এবং খুবই রিচ।

আনন্দশেখর বলেন, 'তোমার পক্ষে লন্ডনে থেকে ইন্ডিয়ার ক্লাসিকাল ল্যাংগুয়েজ না শেখাটাই স্বাভাবিক। তাতে কিছু যাবে আসবে না। মিনিংটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

অর্থটা শোনার পর জয়ন্ত বলে, 'ফাইন। ও দেশের ছেলেমেয়ে বড় হলে মা-বাবারা বন্ধুর মতো ব্যবহার করে।'

'সেই জন্যেই জানতে চাইছি—' গলা খাটো করে আনন্দশেখর এবার বলেন, 'ওদেশে সবাই ড্রিংক-ট্রিংক তো করে। এটা দোষের কিছু না। যেখানকার যা নিয়ম তা মানতেই হবে। বাবা জয়—'বলে হাত দিয়ে হুইস্কির বোতলের মাপ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'দু-একটা এনেছ টেনেছ নাকি?'

জয়ন্ত একেবারে কুঁকড়ে যায়। রাজা তার চাইতে মোটে দু-এক বছরের বড়। যদিও খুব অস্বস্তিকর তবু তার মদের বোতল চাওয়াটা হয়তো মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু আনন্দশেখর তার বাবার বড় ভাই। সংকোচে ঘাড় নিচু করে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সে।

আনন্দশেখর একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। বলেন, 'ঠিক বলছে

তো জয়?' তাঁর মুখে ভঙ্গুর অবিশ্বাসের একটু হাসি ফুটে ওঠে।

মুখ না তুলেই মাথা ঝাঁকায় জয়ন্ত, অর্থাৎ সে মিথ্যে বলছে না।

অগত্যা সময় নষ্ট করার মানে হয় না। সোফার হাতলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, 'তুমি রেস্ট টেস্ট নাও। আমি এখন যাই।'

আনন্দশেখর চলে যান। আশাভঙ্গের কারণে তিনি যে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন সেটা পরিষ্কার বোঝা গেছে।

জয়ন্ত ভেতরে ভেতরে রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ে। এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় জীবনে আর কখনও পড়েনি সে। যেভাবে আনন্দশেখর আর রাজা তার কাছে হুইস্কির খোঁজে এসেছে তাতে এ বাড়ির কেউ বোধহয় বাকি থাকবে না, সবাই প্রসেশান করে হানা দিতে থাকবে।

ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায় জয়ন্তর। নিজেদের বংশ সম্পর্কে বাবার সীমাহীন গর্ব। তাঁর মুখেই সে শুনেছে এ বাড়ির লোকজন নেশা করাটাকে আদপেই ভাল চোখে দেখে না। একটু আধটু মদ্যপান কেউ হয়তো করে কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে। তাঁদের কাছে এ ব্যাপারটা ট্যাবু। সাতাশ বছর পর বাবা হঠাৎ যদি এখানে এসে পড়েন নিজের ভাই এবং ভাইপোদের অধঃপতন দেখে যথেষ্ট আঘাত পাবেন। জয়ন্ত একবার ভাবে বাবাকে একবার তার এই অভিজ্ঞতাটার কথা লিখে জানাবে কিনা। পরক্ষণেই মনে হয়, তাঁর গৌরববোধটা ভেঙে দিয়ে কী লাভ? এদেশে আসার সম্ভাবনা নেই বাবার, সাতাশ বছর আগের স্মৃতি নিয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো তাঁর আনন্দে কাটুক।

জয়ন্তর ধারণা হয়েছিল, কিউ দিয়ে সামনের বারান্দায় আরও অনেকে তার ঘরে ঢোকার জন্য দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আনন্দশেখর চলে যাবার পর মিনিট কুড়ি কাটলেও কাউকে দেখা গেল না। জয়ন্ত খানিকটা আরাম বোধ করে। স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর যে চাপটা চলছিল সেটা অনেকখানি কমে যায়। আস্তে আস্তে উঠে তোয়ালে টোয়ালে নিয়ে সে বাথরুমে ঢুকে পড়ে।

যদিও এটা সেপ্টেম্বর মাস, সন্ধ্যের পর থেকে বাতাসে হালকা একটু

ঠাণ্ডার আমেজ টের পাওয়া যায়। কিন্তু বেশ গরমই লাগছে জয়ন্তর। সে হুড়মুড় করে গায়ে মাথায় জল ঢেলে অনেকক্ষণ স্নান করে, তারপর পোশাক পাল্টে চুল আঁচড়ে, বাথরুম থেকে বেডরুমে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা সোফায় রানা বসে আছে, তার চোখে মুখে ভেজা বেড়ালের ভাব।

রানাকে দেখামাত্র দীপার মুখটা মনে পড়ে যায়। নিজের অজান্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে জয়ন্তর। ঝুমা স্পষ্ট করে কিছু বলেনি তবু মনে হয়েছে রানা তার ভয়ঙ্কর কোনও ক্ষতি করে থাকবে।

চোখাচোখি হতে হাসির একটা ভঙ্গি করে রানা, বলে, 'তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করতে এলাম। তখন বসবার ঘরে অত ভিড়ে আলাদা করে কথা বলা যাচ্ছিল না।'

আলাদা করে কথা বলার মানেটা কী? এরও কি হুইস্কির বোতল চাই? জয়ন্ত ঠিক করে ফেলে, রানাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে। আসলে দীপার সেই কাতর, করুণ মুখটা তার মাথায় ফিক্সেশনের মতো আটকে আছে। তারপর অবশ্য মনে হয়, রানাকে বার করে দেওয়াটা ঠিক হবে না। তার প্রতিক্রিয়া হবে মারাত্মক, বড় জেঠারা ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন। দিন পনেরর জন্য সে কলকাতায় এসেছে। কী দরকার অচেনা একটা মেয়ের জন্য নিজের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কটাকে তিক্ত করার? বাবার সতর্কবাণী নতুন করে মনে পড়ে যায়। জয়ন্তর আচরণে, কথায়-বার্তায় কেউ যেন ক্ষুব্ধ না হয়।

আস্তে আস্তে জয়ন্ত রানার কাছে গিয়ে মুখোমুখি বসে পড়ে। হাজার চেষ্টা করেও এই জেঠতুতো দাদাটির প্রতি তার বিতৃষ্ণা চেপে রাখা যাচ্ছে না, ভেতর থেকে তার ঝাঁঝ বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঈষৎ রুক্ষ গলায় সে বলে, 'প্রথমেই বলে দিচ্ছি, আমি কিন্তু হুইস্কি-টুইস্কি দিতে পারব না।'

রানা চমকে ওঠে, 'মানে!'

জয়ন্ত বলে, 'আমি লণ্ডন থেকে মদের বোতল আনিনি, তাই দেওয়া সম্ভব না।'

রানা দ্রুত কিছু ভেবে নেয়। তারপর বলে, 'বুঝেছি, বাড়ির সবাই নিশ্চয়ই তোমাকে হুইস্কির জন্যে ধরেছে, তাই না?'

জয়ন্ত উত্তর দেয় না।

রানা এবার বলে, 'আমি হুইস্কির জন্যে আসিনি। দু-একটা সিগারেট টিগারেট খাই কিন্তু ড্রিংক করি না। বিলিতি মদের জন্যে তোমাকে বিরক্ত করব না।'

জয়ন্ত একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে, রানা তার ভাই রাজার মতো চোয়াড়ে বা রাফিয়ান টাইপের নয়। তার কথাবার্তাও ভাল, বেশ মার্জিত। মনে হয় সে খানিকটা লেখাপড়া করেছে।

মনে মনে একটু ধাক্কা লাগে জয়ন্তর। তার ধারণা ছিল রাজা আর আনন্দশেখরের মতো একই উদ্দেশ্যে এসেছে রানা। কিন্তু সে মদ খায় না, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর জানার পরও খুশি হতে পারে না জয়ন্ত। আসলে মাথা থেকে দীপার মুখটা কিছুতেই বার করে দেওয়া যাচ্ছে না।

কিছু বলতে গিয়ে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায় রানা। বারকয়েক চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত দ্বিধাটা কাটিয়ে ওঠে, বলে, 'একটা ব্যাপারে আমাকে একটু হেল্প করতে হবে জয়।'

কী ধরনের সাহায্য রানা তার কাছে চায়, বোঝা যাচ্ছে না। সন্দিগ্ধভাবে জয়ন্ত তাঁকে লক্ষ করতে থাকে। মুখে কিছু বলে না।

রানা অনুরোধের সুরে এবার বলে, 'তুমি আমার ছোট ভাই। দাদা হিসেবে তোমার কাছে সামান্য একটু হেল্প আশা করতেই পারি, না কী বল?'

রানা কী চায়, না জানা পর্যন্ত আগেভাগে কোনও কথাই দেবে না জয়ন্ত। সে সতর্ক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, 'কী হেল্প চাইছ?

সোজাসুজি উত্তর দেয় না রানা। সে পাল্টা প্রশ্ন করে, 'তুমি কি ইন্ডিয়ার খবর টবর রাখো?

'কিছু কিছু নিশ্চয়ই রাখি। তুমি কোন খবরের কথা বলছ?'

'ইকোনমিক।'

'ইকোনমিক! মানে?'

'অর্থনৈতিক। আমাদের দেশ একেবারে শেষ হয়ে গেছে। চাকরি নেই বাকরি নেই। ভবিষ্যৎ বলতে আমাদের জেনারেশানের সামনে শুধু অন্ধকার।'

জয়ন্ত বলে, 'হ্যাঁ, শুনেছি ইন্ডিয়ার অর্থনীতি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। অবশ্য ইংলন্ডের অবস্থাও খারাপ।

রানা বলে, 'তবু ইন্ডিয়ার চেয়ে তো বেটার।'

'হয়তো। আমি ঠিক বলতে পারব না।'

হঠাৎ জয়ন্তর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে রানা বলে, 'তুমি তো পনের দিন পর লণ্ডন ফিরছ। আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।'

জয়ন্ত হকচাকিয়ে যায়। বলে, 'এভাবে কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় নাকি? পাসপোর্ট ভিসার ব্যাপার আছে। সে সব করতে অনেক সময় লাগে। তা ছাড়া—'

'কী?'

'হঠাৎ লণ্ডনে যেতে চাইছ কেন?'

'ওখানে ইন্ডিয়ার তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ রয়েছে। মেজ কাকাকে বলে আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

রানার উদ্দেশ্যটা এবার পরিষ্কার হয়ে যায়। আস্তে আস্তে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জয়ন্ত জানায়, 'বৃটিশ গভর্নমেণ্ট টুরিস্ট ছাড়া অন্য দেশের সিটিজেনদের ব্যাপারে ভীষণ রেসট্রিকশন শুরু করেছে। যদি বোঝে কেউ চাকরির জন্যে যেতে চাইছে, ভিসাই দেবে না।'

'আমি জানি মেজ কাকার ওখানে খুব ইনফ্লুয়েন্স। উনি একটু চেষ্টা করলেই আমার একটা কিছু হয়ে যাবে।'

'চেষ্টা করলেও হবে না রানাদা। ব্রিটেনে এখন এত রিসেশান চলছে যে ওখানকার সিটিজেনদেরই চাকরি দিতে পারছে না। বিশ্বাস করো আনএমপ্লয়মেন্টের প্রবলেমটা ওখানেও অ্যালার্মিং।

'যত অ্যালার্মিংই হোক, মেজ কাকা একজনকে কি আর কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারবেন না? খুব পারবেন। আমি তো আর কোনও কোম্পানির চেয়ারম্যান কি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হতে চাইছি না। কেরানিগিরি ফেরানিগিরি যা হোক কিছু একটা জুটলেই আমি খুশি।'

হাজার বোঝালেও যে রানা বুঝবে না, তা টের পেতে অসুবিধা হয় না জয়ন্তর। যা বলা হয়েছে তার ওপর ব্রিটেনের আনএমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বললে ভুল বুঝবে সে। ভাববে জয়ন্ত তাকে এড়াতে চাইছে। আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে সেণ্টিমেণ্ট জিনিসটা

দারুণভাবে জড়ানো। সত্যি কথাটা অনেক সময় চাঁছাছোলা কড়া ভাষায় জানানোও যায় না। বাবার সতর্কবাণী সারাক্ষণ তার মাথায় কাজ করে যাচ্ছে।

একটু ভেবে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কিছু মনে করো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি।'

উৎসুক চোখে তাকায় রানা, 'কী?'

'তুমি কতদূর পড়াশোনা করেছ?'

'এই বি. এ পর্যন্ত।'

'গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছ?'

'না, মানে—বিব্রতভাবে রানা বলে, 'পাশটা ঠিক করে উঠতে পারিনি।'

সামান্য একটা গ্র্যাজুয়েশনের ডিগ্রি যার নেই, থার্ড ওয়ার্ল্ডের একটা দেশের থেকে এমন একজনকে লণ্ডনে নিয়ে চাকরি জোগাড় করে দেওয়া যে অসম্ভব ব্যাপার, এ কথাটা তো আর মুখের ওপর জানানো যায় না। জয়ন্ত শুধু বলে, 'তোমার একটা বায়োডাটা রেডি করে রেখো, আমি নিয়ে গিয়ে বাবাকে দেব?'

'থ্যাঙ্ক ইউ জয়। হোল লাইফ তোমার কাছে গ্রেটফুল হয়ে থাকব। আচ্ছা এখন তা হলে চলি, বায়োডাটাটা আজ রাত্তিরেই লিখে কাল টাইপ করিয়ে নেব।'

জয়ন্ত জানায় অত তাড়াহুড়োর দরকার নেই, সে ক'দিন তো আছেই। বায়োডাটাটা যাবার আগে পেলেই হবে।'

রানা উঠে পড়েছিল। এতক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে দীপার কথা মনে ছিল না। হঠাৎ তার মুখ আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জয়ন্ত বলে ওঠে, 'বসো রানাদা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

রানা ফের বসে পড়তে পড়তে জিজ্ঞেস করে, কী কথা?'

'দীপা কে?'

রানা চমকে ওঠে। এক ঝলক জয়ন্তর দিকে তাকায়, তারপর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। জড়ানো গলায় 'কেউ না, কেউ না—' বলতে বলতে একরকম দৌড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রতিক্রিয়াটা এরকম হবে ভাবা যায়নি। ঝুমার কথায় বোঝা গিয়েছিল, রানা দীপার সাংঘাতিক কিছু ক্ষতি করেছে। এখন সেটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যায়, নইলে ওভাবে রানা পালিয়ে যেত না।

রানা চলে যাবার পর বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে। এর ভেতর এ বাড়ির আর কেউ দর্শন দেয় নি।

লন্ডন থেকে কয়েকটা পেপার-ব্যাক এডিশনের থ্রিলার নিয়ে এসেছিল জয়ন্ত। সবগুলোই বেস্ট-সেলার লিস্টে রয়েছে। প্লেনে একটা পড়ে ফেলেছিল সে। বম্বেতে এসে সময় পাওয়া যায় নি। ডাক্তার প্যাটেলের ছেলেরা একটা কনটেসায় তুলে সকাল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত টর্নেডোর মতো তাকে সারা শহর ঘুরিয়েছে, এমন কি একদিন পুনেতেও নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য রাতেই ফিরে এসেছে। আর 'শান্তি-ভবন'-এ ঢোকার পর দুপুরে খানিকক্ষণ ঘুমনো ছাড়া একা থাকার সুযোগই পাওয়া যায়নি।

সুটকেশ থেকে একটা বই বার করে এখন খাটে শুয়ে শুয়ে পড়ছে জয়ন্ত। সানফ্রান্সিসকোর ব্যাকগ্রাউন্ডে লেখা বইটার পাতায় পাতায় চমকের পর চমক—খুন, মোটর চেজ, বন্দুকবাজি সেনসেশানাল সব ঘটনা। পড়তে পড়তে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। লেখার স্টাইলটা এত ভাল যে বইটা থেকে চোখ সরানো যায় না।

একসময় কাছাকাছি কোনও একটা পুরনো ঘড়িতে ঘড়-ঘড় আওয়াজ করে ন'টা বাজে। আর তখনই চারুলতা আর রাজশেখরের গলা ভেসে আসে, 'জয়—জয়—'

ব্যস্তভাবে উঠে বসে জয়ন্ত।

রাজশেখর আর চারুলতা ততক্ষণে ঘরের ভেতর চলে এসেছেন। চারুলতার হাতে বড় পেতলের পরাতের ওপর অনেগুলো ছোট-বড় প্লেট আর জলের গেলাস ধবধবে তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। তিনি পরাতটা সোফার সামনের সেন্টার টেবলটার ওপর নামিয়ে রাখেন।

রাজশেখর বলেন, 'তোমার ডিনার রেডি। ন'টা বেজে গেছে। যাও, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নাও।'

খাট থেকে নেমে জয়ন্ত বলে, 'আমি স্নান করে নিয়েছি।'

চারুলতা একটু অবাক হয়ে বলেন, ঠাণ্ডা জলে রাত্তিরে স্নান

করলে। দুপুরবেলা না তোমাকে বললাম, নতুন জায়গায় গরম-ঠান্ডা মিশিয়ে নেবে।'

'আমার খেয়াল ছিল না।'

'এবার থেকে মনে রাখবে। নাও, খেতে ব'সো।'

এ বেলাও প্রচুর খাবার দাবারের ব্যবস্থা করেছেন চারুলতারা। পরটা, পটল ভাজা, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, আলুকপির তরকারি, মাংস, রাবড়ি আর রসগোল্লা।

দুপুরবেলার অভিজ্ঞতা মনে আছে জয়ন্তর। সে জানে, আপত্তি করে লাভ নেই। চারুলতারা তার কোনও কথাই শুনবেন না। সে চুপচাপ খেতে বসে যায়।

চারুলতা আর রাজশেখর ও বেলার মতো সামনাসামনি বসে নানা রকম এলোমেলো গল্প করতে করতে জয়ন্তকে খাওয়াতে থাকেন।

গলা খাকরে হঠাৎ এক সময় রাজশেখর বলেন, 'ও বেলা তোমার বড় জেঠি আপত্তি করেছিল তাই জিজ্ঞেস করতে পারিনি।'

মুখ তুলে জয়ন্ত বলে, 'কী ব্যাপারে?'

'এই বাড়ির সম্বন্ধে।' রাজশেখর বলেন, 'সূর্যকে কিছুদিন আগে এই নিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। তুমি জানো, ও কোনও ডিসিশান নিয়েছে কিনা?'

জয়ন্তর মনে পড়ে যায়, অন্য ফ্যামিলি মেম্বারদের না জানিয়ে গোপনে বাড়ির বিষয়ে তার সঙ্গে রাজশেখর আলোচনা করুন, চারুলতার তাতে যথেষ্ট আপত্তি ছিল। কিন্তু এ বেলা তিনি চুপ করে রইলেন। অর্থাৎ রাজশেখরের সঙ্গে তাঁর হয়তো কিছু একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

জয়ন্ত বলে, 'নিজে ঠিক নেননি।'

'তা হলে?'

'আমাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে পাঠিয়েছেন বাবা। কলকাতায় এসে সব দেখেশুনে, আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আমি যা ভাল বুঝব তা-ই করতে বলেছেন।'

রাজশেখরের মুখচোখ দেখে মনে হয় এরকমটাই যেন তিনি আশা

করেছিলেন। ব্যগ্রভাবে বলেন, 'ঠিকই করেছে সূর্য। ছেলেরা উপযুক্ত হলে তাদের হাতে অনেক দায়িত্ব তুলে দিতে হয়।'

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের এই বাড়ির ব্যাপারে আপনারা কি কিছু ঠিক করেছেন?'

রাজশেখর আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন—করেছেন।

উৎসুক সুরে জয়ন্ত জানতে চায়, 'কী?'

'সেটা এখন বলছি না। কাল তোমার কি প্রোগ্রাম?'

'একবার পার্ক সার্কাস আর আলিপুর যেতে হবে।'

'জরুরি কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ। লন্ডন থেকে আসার সময় আমাদের দুই 'নেবার' দুটো প্যাকেট দিয়েছেন। সেগুলো তাঁদের আত্মীয়দের পৌঁছে দিতে হবে।'

একটু চিন্তা করে রাজশেখর বলেন, 'তা হলে পরশু সকালে আমরা যে ক'ভাই এখানে আছি, তোমার সঙ্গে বসতে চাই। ধর, ন'টা নাগাদ। অসুবিধে হবে না তো?'

বেশিদিন এখানে থাকছে না জয়ন্ত। বাড়ির ব্যাপারে তার মধ্যেই যা করার করে যেতে বলেছেন বাবা। কেননা, বার বার তাদের কারুর পক্ষেই লন্ডন থেকে এত দূর ছুটে আসা সম্ভব নয়। জয়ন্ত জানায়, না, পরশু তার কোনও অসুবিধে নেই।

পাঁচ

ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস জয়ন্তর। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। তবে যখন ঘুম ভাঙল তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি কিন্তু সে বিছানা ছাড়ার আগেই কলকাতা জেগে উঠেছে। সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে মাইকে হিন্দি গানের আওয়াজে আর কয়লার ধোঁয়ায়। 'শান্তি-ভবন'-এর চারপাশে যত বস্তি-টাস্তি টাইপের বাড়ি আছে, তার প্রায় সবগুলোতেই উনুন ধরানো হয়েছে। সেপ্টেম্বরে এবছর কলকাতায় সামান্য কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। তার সঙ্গে কয়লার ধোঁয়া মিশে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। পলিউশনটা এ শহরে বোধ হয় ভোরেই শুরু হয়ে যায়।

আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় জয়ন্ত। দূরে রাস্তায় লোকজন দেখা যাচ্ছে। অনেকেই ফুটপাথে ঘুমিয়ে আছে। কেউ কেউ কলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে। ফুটপাথে উনুন ধরিয়ে চার পাঁচটা চা-ওলা বেশ জাঁকিয়ে কারবার চালাচ্ছে। তাদের ঘিরে দিনমজুর রিকশাওলা ঠেলাওলা জাতীয় খদ্দেরদের ভিড়।

জয়ন্ত শুনেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতার ফুটপাথে থাকে। ইণ্ডিয়া দু'ভাগ হবার পর এ শহরে নাকি পপুলেশন এক্সপ্লোসান ঘটেছে। এখনও চব্বিশ ঘন্টা পেরোয়নি সে কলকাতায় এসেছে। তারই মধ্যে জনবিস্ফোরণের কিঞ্চিৎ নমুনা টের পাচ্ছে।

মাইকের ভলিউমটা হঠাৎ আরও কয়েক পর্দা চড়ে গেল। জয়ন্ত জানে নিজেদের কালচার, ভাষা, মিউজিক, লিটারেচার—এ সব নিয়ে বাঙালিদের ভীষণ গর্ব। কিন্তু কলকাতায় পা দেবার পর একটা বাংলা গানও শোনা যায়নি। শুধু চটকদারি হিন্দি ফিল্মের গান কলকাতার কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। বাঙালির প্রাইডটা কোথায় গিয়ে তাহলে ঠেকেছে!

'ছোটদা—'

পরিচিত কন্ঠস্বরটি শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকায় জয়ন্ত। ঝুমা দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

জয়ন্ত দু'পা এগিয়ে এসে বলে, 'ওখানে কেন, ভেতরে এস।'

ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে ঝুমা বলে, 'তুমি তো বেশ আর্লি-রাইজার। ভেবেছিলাম এখনও ঘুমোচ্ছ।'

একটু হাসে জয়ন্ত। তার কথার উত্তর না দিয়ে বলে, 'কাল ঠাকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে এসে সেই যে চলে গেলে আর তোমার পাত্তা নেই। পরে তোমাকে একবার এক্সপেক্ট করেছিলাম।'

ঝুমা চোখ কুঁচকে বলে, 'কেন, আমাকে ছাড়া তোমার ভালই তো কেটেছে। অনেকেই তোমাকে কোম্পানি দিয়ে গেছে।'

ঝুমার কথায় কতটা মজা আর কতটা বিদ্রূপ মেশানো, বোঝা যাচ্ছে না। জয়ন্ত বলে, হ্যাঁ, 'ফাইন কোম্পানি।'

এক পলক স্থির চোখে জয়ন্তকে লক্ষ করে ঝুমা। তারপর বলে,

'সে যাক। আজও তুমি বড় জেঠাদের গেস্ট। দেখলাম বড় জেঠি তোমার ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা এখানে আসবে। আমি তার আগেই পালাব। আজ ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলার কথা মনে আছে তো?'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'আমি সাড়ে ন'টায় এসে তোমাকে নিয়ে বেরুব। রেডি থেকো। চলি—'

ঝুমা চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'এখনই যাবে কেন? বড় জেঠিমা এলে যেও। ব'সো ওখানে।' বলে সোফা দেখিয়ে দেয়।

'না, না, এখন বসার সময় নেই।'

'এত কী কাজ?'

'পড়াতে যেতে হবে।'

বুঝতে না পেরে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'পড়াতে মানে।'

ঝুমা বলে, 'প্রাইভেট টিউশান। ক্লাস সেভেন আর ক্লাস নাইনের দুটো বোনকে পড়াই। উইকে তিন দিন। এর জন্যে আড়াইশ টাকা করে পাই।'

নিজের লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে সময় বাঁচিয়ে রোজগার করাটা দোষের কিছু নয়। স্বাবলম্বী হওয়াটা চমৎকার ব্যাপার, তাতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ওদেশে ছাত্রছাত্রীরা, যত বড় ফ্যামিলি থেকেই আসুক না, কিছু না কিছু করে থাকে। বিশেষ করে লম্বা ভ্যাকেশনের সময়। 'ডিগনিটি অফ লেবার' ওদেশে শুধু কথার কথা নয়। এদেশে যে তার ঢেউ এসে লেগেছে তাতে খুশিই হল জয়ন্ত। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগে ফের ঝুমা বলে ওঠে, 'আমাদের অবস্থা তো তুমি জানো না। টুইশানিটা না করলে আমার পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। তা ছাড়া যা মাইনে পাই তার থেকে বেশ কিছু ফ্যামিলিকে কনট্রিবিউট করতে হয়।'

রীতিমতো চমকই লাগে জয়ন্তর। আর্থিক কোন লেভেলে 'শান্তি ভবন'-এর লোকেরা পড়ে আছে, এখানে পা দিয়ে টের পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে ঝুমা টিউশানি করে সংসারে টাকা দিচ্ছে, এতটা ভাবতে পারেনি সে।

ঝুমো আর দাঁড়ায় না, ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যায়।

ঝুমো যাবার পর শেভ করে মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরুতে না বেরুতেই চারুলতা টোস্ট ডিম কলা চা ইত্যাদি নিয়ে হাজির হন। আজ রাজশেখর অবশ্য সঙ্গে আসেননি।

খাদ্যবস্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে সংকোচই বোধ করে জয়ন্ত। ঝুমোর মুখে শুনে মনে হয়েছে ওদের ইউনিটটি আর্থিক দিক থেকে বেশ খারাপ অবস্থাতেই রয়েছে। রাজশেখরদের হাল তার চেয়ে ভাল কিছু হবার কথা নয়। তাঁর দুইছেলের একজন লোফার, একজন মস্তান। আরেকজন বেকার। রাজশেখরেরও স্থায়ী রোজগার কিছু আছে বলে মনে হয় না। তা হলে রোজ এত তোয়াজ করে এমন দামি দামি খাবার কেন তাকে খাওয়ানো হচ্ছে সেটা জয়ন্তর কাছে ধাঁধার মতো। জিজ্ঞেস করে সে জেনে নেবে তারও উপায় নেই। তবে এটুকু আঁচ করা যাচ্ছে, ঝুলি থেকে বেড়াল শিগগিরই বেরিয়ে পড়বে। রাজশেখরদের চরিত্র যা বোঝা গেছে তাতে মনে হয় না বিনা স্বার্থে লণ্ডনপ্রবাসী ভাইয়ের ছেলেকে এমন রাজকীয় আদরযত্ন করা হচ্ছে। কিন্তু এরা তার জন্য এত খরচ করছে কীভাবে? ধারটার করে কি?

ঝুমো চলে যাবার পর মনে মনে জয়ন্ত ঠিক করে ফেলেছিল, দুপুরে আজ আর বাড়িতে খাবে না। ব্যাংকে অ্যাকাউণ্ট খুলে ঝুমোকে সঙ্গে করে আলিপুর আর পার্ক সার্কাস যাবে। তার ফাঁকে কোনও বড় রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেবে। আসলে জয়ন্তর ইচ্ছা, ভাল করে এই শহরটাকে দেখা। অন্তত একদিনে যতটা পারা যায়। কলকাতার সে কিছুই চেনে না, ঝুমো সঙ্গে থাকলে তার সুবিধাই হবে।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে জয়ন্ত বলে, 'দুপুরে আমার জন্যে রান্না করবেন না বড় জেঠিমা।'

চারুলতা জিজ্ঞেস করেন, 'কেন রে ছেলে?'

'আমি একটু বেরুব, কখন ফিরতে পারব জানি না।'

'সেই পার্ক সার্কাস আর আলিপুরে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে দুপুরে খাওয়ার কী হবে?'

জয়ন্ত বলে, 'বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।' ঝুমোকে সঙ্গে নিয়ে

কলকাতায় ঘুরবে, রেস্তোরাঁয় খাবে, ব্যাঙ্কে যাবে—এ সব আর জানায় না। কাল দুপুর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত এই কয়েক ঘণ্টায় জয়ন্ত টের পেয়ে গেছে এ বাড়িতে কারুর সঙ্গে কারুর সম্পর্ক মধুর নয়। পরস্পরের মধ্যে কোথায় যেন অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং সূক্ষ্ম রেষারেষি রয়েছে। একজনের কথা আরেকজনকে না জানানোই ভাল।

চারুলতা জিজ্ঞেস করেন, 'কখন বেরুবে?'

'সাড়ে ন'টায়।'

'স্নান করে যাবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'ন'টা নাগাদ গরম জল পাঠিয়ে দেব।'

'আচ্ছা।'

সাড়ে ন'টার ভেতর স্নান টান সেরে একটা সুটকেশে দুটো গিফ্ট প্যাকেট আর বারো হাজার টাকা পুরে অপেক্ষা করতে থাকে জয়ন্ত। বাকি হাজার দেড়েক টাকা তার চামড়ার পার্সে রয়েছে।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টাতেই দরজার সামনে ঝুমাকে দেখা যায়। স্নানটান সেরে, সুন্দর একখানা প্রিন্টেড শাড়ি পরেছে সে। চুল এক-বেণী করা, কপালে মেরুন রঙের বড় একটা টিপ, বাঁ হাতে লেডিজ ঘড়ি, ডান হাতে বড় চামড়ার ব্যাগ এবং বই আর বাঁধানো খাতা।

জয়ন্ত একটু হেসে গিফটের প্যাকেটওলা সুটকেশটা তুলে নেয়। ঝুমার কাছে গিয়ে বলে; 'চল।'

বারান্দার শেষ মাথায় সিঁড়ি। সেখানে এসে দু'জনে পাশাপাশি নিচে নামতেই চারুলতার মুখোমুখি পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কপাল কুঁচকে যায়, চোখ তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। ঝুমাকে সন্দিগ্ধ সুরে তিনি জিজ্ঞেন করেন, 'তুই জয়ের সঙ্গে যাচ্ছিস নাকি?'

উত্তরটা দেয় জয়ন্ত, 'হ্যাঁ বড় জেঠিমা, কলকাতায় ও আমার গাইড।'

চারুলতা আর কোনও প্রশ্ন করেন না। তাঁর পলকহীন ধারাল দৃষ্টির সামনে দিয়ে জয়ন্ত আর ঝুমা একতলা পেরিয়ে সামনের ফাঁকা জায়গায় চলে যায়।

ঝুমা বলে, 'দিয়ে এলে তো বড় জেঠির মেজাজের বারোটা বাজিয়ে।'

বুঝতে না পেরে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'মানে।'

'আরে বাবা, এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝছ না? বড় জেঠি নিশ্চয়ই ভাবছে, তোমাকে হাতের মুঠোয় পুরে আমি অনেক কিছু আদায় করে নিচ্ছি।'

'দূর, এরকম কেউ ভাবে নাকি?'

'আমাদের এ বাড়ির লোকেরা কত কুচুটে, তাদের চরিত্র কত কমপ্লেক্স তোমার ধারণা নেই ছোটদা।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ঝুমা আবার বলে, 'আমি এখন তোমার সঙ্গে না গিয়ে রাজাদা কি রানাদা যদি যেত, আমার মা-বাবাও বড় জেঠির মতোই সন্দেহ করত। তুমি জানো না ছোটদা, আমরা কতটা নিচে নেমে গেছি।'

'শান্তি ভবন'-এর ভাঙা গেট পেছনে ফেলে সামনের রাস্তা দিয়ে ওরা কয়েক পা যেতে না যেতেই কেউ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে অশ্লীল আওয়াজ করে সিটি দিতে থাকে।

চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত দেখতে পায়, খানিক দূরে রোয়াকে তারই বয়সী কয়েকটা ছোকরা কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদেরই একজন সিটিটা দিচ্ছে, বাকি সবাই দাঁত বার করে কুৎসিত ভঙ্গি করে হাসছে। সিটি আর হাসির লক্ষ্য যে ঝুমা, বুঝতে অসুবিধা হয় না জয়ন্তর। রাগে তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে, দুই চোখে আগুন জ্বলতে থাকে। চাপা গলায় সে বলে, 'হু আর দিজ স্কাউন্ড্রেলস?'

মুখ নামিয়ে ঝুমা বলে, 'রাজাদার বন্ধু ওরা।'

'আগেও তোমাকে এভাবে বিরক্ত করেছে, না এই প্রথম?'

ঝুমা চুপ করে থাকে।

বোঝাই যাচ্ছে, ঝুমাকে প্রায়ই এ ধরনের ইতরামি সহ্য করতে হয়। জয়ন্ত বলে, 'রাজাদা এই রাসকেলগুলোকে কিছু বলে না?'

ঝুমা দ্বিধান্বিতভাবে এবার বলে, 'কী আর বলবে! ও নিজেও

তো এই টাইপের। নেহাত আমি বোন বলে আমার সঙ্গে অসভ্যতাটা আর করে না। নইলে—'

ওদিকে নোংরা অঙ্গভঙ্গি আর সিটির আওয়াজ আরও বাড়ছিল। মাথায় হঠাৎ রক্ত চড়ে যায় জয়ন্তর। দাঁতে দাঁত চেপে বলে 'সোয়াইন-গুলোর জিভ ছিঁড়ে দেবো। একটু ওয়েট কর।'

জয়ন্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো দৌড়ে ছোকরাগুলোর দিকে যাচ্ছিল, ঝুমা সন্ত্রস্তভাবে তার হাত চেপে ধরে। চাপা গলায় বলে, 'তুমি ওদের জানো না ছোটদা। কথায় কথায় ওরা ছোরা আর পিস্তল টিস্তল চালিয়ে দেয়। যেও না, যেও না—'

জয়ন্ত হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলে, 'এখানে পুলিশ অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন বলে কিছু নেই, না জঙ্গলের রুল চলছে?'

ঝুমা অসহায় ভঙ্গিতে বলে, 'ওদের গায়ে হাত দেবার সাহস কারও নেই।'

'কেন?'

'এখানকার পলিটিক্যাল লিডাররা ওদের প্রোটেকশান দেয় যে।'

'মানে?'

'সেটা তুমি বুঝবে না। চল, চল।'

এই শহর নিয়ে বাবার কত গর্ব। এটাই নাকি ভারতের কালচারাল ক্যাপিটাল। এখানকার মানুষদের মতো সভ্য, রুচিশীল, ভদ্র সিটিজেন নাকি পৃথিবীর আর কোনও মেট্রোপলিটনে পাওয়া যাবে না। কিন্তু রুচি আর সংস্কৃতির যে নমুনাটুকু চোখের সামনে দেখা গেল, বাবা তা দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। তাঁর স্মৃতির কলকাতার চিহ্নমাত্র এ শহরে আর অবশিষ্ট নেই।

জয়ন্ত হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল। উত্তেজিত মুখে বলে, 'কিছুতেই না। প্রোটেস্ট একটা করা দরকার, নইলে এদের উৎপাত বেড়েই যাবে।'

মারাত্মক একটা কিছু ঘটে যেতে পারত, হঠাৎ ডান দিকের একটা গলি থেকে রাজা বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এতক্ষণ সে এখানে ছিল না। জয়ন্ত আর ঝুমাকে চট করে একবার দেখে নিয়ে দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে রোয়াকের ছোকরাগুলোর দিকে তাকায়। কিছু একটা আঁচ করে নিয়ে আরেকটু কাছে এসে বলে, 'কী হয়েছে?'

ঝুমা তীব্র গলায় বলে, 'নতুন কী আর হবে? আমি রাস্তায় বেরুলে ওই ফেউগুলো কী করে, তুই জানিস না?'

রাজা ঝুমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই জয়ন্ত তাকে বলে, 'এই ব্লাডি স্ট্রিট ডগগুলো তোমার বন্ধু?'

রাজা হকচকিয়ে যায়। বলে, 'এই মানে—'

'শেম রাজাদা, শেম। নিজের বোনের সঙ্গে লোফারগুলো অসভ্যতা করে আর তুমি তাদের ইনডালজেন্স দাও! শেম—' ঘৃণায় রাগে জয়ন্তর মুখ কঠোর দেখায়।

রাজা যে ধরনের ছেলে তাতে এসব শোনার পর রুখে ওঠার কথা। কিন্তু যার কাছ থেকে কাল রাতে কুড়িটা টাকা আদায় করা গেছে এবং ভবিষ্যতে আরও পাওয়ার সম্ভাবনা, তাকে হুট করে চটিয়ে দেওয়াটা যে 'ডাহা' বোকামি সেটা সে জানে। জয়ন্তকে শান্ত করার জন্য দু-হাত নেড়ে নেড়ে শশব্যস্ত বলে, 'না না, ওরা খারাপ না। ঝুমার সঙ্গে স্লাইট মাজাক ফাজাক করে।'

'মাজাক' শব্দটা জয়ন্তর জানা। সে বলে, 'এই বদমাইসির নাম মাজাক! তুমি যদি তোমার বন্ধুদের না সামলাও, আমি কিন্তু ছেড়ে দেব না।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি দেখছি।' রাজা ঘাড় ফিরিয়ে ছোকরাগুলোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই মাকড়ারা থাম—থাম বলছি—'বলে দৌড়ে ওদের কাছে কিছু একটা বলে আবার ফিরে আসে।

সিটি এবং কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি বন্ধ হয়ে যায়।

জয়ন্ত বলে, 'আজই শুধু নয়, তোমাকে কথা দিতে হবে ঝুমাকে ওরা যেন ডিসটার্ব না করে।'

'ওকে ওকে, আমি বলে দেব।'

জয়ন্ত আর দাঁড়ায় না, ঝুমাকে সঙ্গে করে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'এই বাজে থার্ডক্লাস ছেলেগুলো রাজাদার বন্ধু, ভাবতে খারাপ লাগছে।' একটু থেমে আবার শুরু করে, 'যাক, তোমাকে ওরা আর বিরক্ত করবে না।'

ঝুমা বলে, 'তুমি যে ক'দিন আছ, হয়তো করবে না। সে যাক,

কুকুরদের ঘেউ ঘেউ শোনাটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। এ নিয়ে তুমি ভেবো না।'

বড় রাস্তায় মিনিট দুই হাঁটতেই ব্যাঙ্ক। এখানে ঝুমার একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে। এমপ্লয়িরা অনেকেই তার চেনা। আধ ঘন্টার ভেতর জয়ন্তর অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে গেল।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে জয়ন্ত বলে, 'আজ কিন্তু সারাদিনের প্রোগ্রাম ঝুমা। প্রথমে ট্যাক্সি ধরে দু'জনে আলিপুর যাব। তারপর—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে ঝুমা বলে, 'আমি তো আজ তোমার সঙ্গে যেতে পারব না ছোটদা।'

'কেন?'

'আমাকে কলেজে যেতে হবে। তিনটে ইমপর্ট্যান্ট ক্লাস আছে। আজ নিজে নিজে কলকাতাকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করো। কাল যদি বেরোও আমি তোমার গাইড হব।'

জয়ন্তকে হতাশ দেখায়। সে বলে, 'ভেবেছিলাম দু'জনে কোথাও লাঞ্চ খাব। তুমি সব গোলমাল করে দিলে।'

ঝুমা বলে, 'সেটা আরেক দিন হবে। দাঁড়াও তোমাকে ট্যাক্সি ধরে দিচ্ছি। এখন অবশ্য অফিস টাইম, পাওয়া খুব মুশকিল, তবু দেখা যাক।'

জয়ন্তকে ফুটপাতে দাঁড় করিয়ে খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করে গলদ-ঘর্ম হয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে ফেলে ঝুমা বলে, উঠে পড় ছোটদা—'

এভাবে এখানে ট্যাক্সি ধরতে হয় জানা ছিল না জয়ন্তর। কলকাতার মানুষদের প্রতিদিনের জীবন যে খুবই কষ্টকর, ক্রমশ টের পাচ্ছে সে।

জয়ন্ত উঠে পড়েছিল। ঝুমা ট্যাক্সিওলাকে বলে দেয়, 'ইনি কলকাতায় নতুন এসেছেন, আলিপুরের যে ঠিকানাটা বলবেন সেই বাড়ি পর্যন্ত একটু কষ্ট করে পৌঁছে দেবেন।'

বয়স্ক অবাঙালি ড্রাইভারটি বলে 'বেশখ বহেনজি—'

আধ ঘন্টা পর আলিপুরের রাজা সন্তোষ রোডে একটা বিরাট কমপাউন্ডের ভেতর বাগানওলা একটা ঝকঝকে তেতলা বাড়ির সামনে এসে জয়ন্তদের ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রকান্ড গেটের পাশের

দেওয়ালে পাথরের ফলকে লেখা আছে, 'আগরওয়াল নিকেত'। বাইরে থেকে শুধু বাগানই না, পাঁচ-ছ'টা দেশি এবং ফোরেন কার, অনেকগুলো চাকর-বাকর এবং মালীকেও দেখা যাচ্ছে। 'আগরওয়াল নিকেত' যে মাল্টি মিলিওনেয়ারের বাড়ি, সেটা বলে না দিলেও চলে।

এই অঞ্চলটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথাও আবর্জনা জমে নেই, চকচকে মসৃণ রাস্তায় গর্তটর্ত চোখে পড়ে না। চারপাশে 'আগরওয়াল নিকেত'-এর মতো বিশাল বিশাল এলাকা নিয়ে অজস্র বাড়ি, মাঝে মাঝে অবশ্য হাই-রাইজও আকাশে মাথা তুলে রয়েছে।

এখানে ফুটপাতগুলো হকারদের দখলে চলে যায়নি, রাস্তায় জবরদখল ঝুপড়ি টুপড়িও দেখা যাচ্ছে না। চতুর্দিকে প্রচুর গাছ-পালা, পাখি। সব মিলিয়ে অঞ্চলটা শান্ত আর নিরিবিলি। বোঝা যায় এটা অভিজাত বড়লোকদের পাড়া। কলকাতার এখন পর্যন্ত যেটুকু জয়ন্ত দেখেছে তার সঙ্গে সেই জায়গাটার আকাশপাতাল তফাত।

'আগরওয়াল নিকেত'-এর মালিক রাধাপ্রসাদ আগরওয়াল কলকাতার বড় বিজনেসম্যান। তাঁর ছেলে রামপ্রসাদ লণ্ডনে জয়ন্তদের প্রতিবেশী, সেখানে তাঁর ইলেকট্রনিক গুডসের ব্যবসা। রামপ্রসাদ জয়ন্তর হাত দিয়ে মা-বাবার জন্য একটা গিফট প্যাকেট পাঠিয়েছেন।

সুটকেশ খুলে রাধাপ্রসাদদের প্যাকেটটা বার করে নিয়ে নেমে পড়ে জয়ন্ত। ট্যাক্সিটা অবশ্য ছাড়ে না। চব্বিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি সে এই শহরে এসেছে। এর মধ্যেই টের পেয়ে গেছে একবার ছাড়লে আরেকটা জোটানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ট্যাক্সিওলাকে মিনিট কয়েক অপেক্ষা করতে বলে সে 'আগরওয়াল নিকেত'-এর গেটের কাছে চলে আসে। সেখানে উর্দি-পরা দারোয়ান মজুদ রয়েছে।

দারোয়ানের কাছে জানা যায়, রাধাপ্রসাদজি কলকাতায় নেই, সস্ত্রীক দিল্লিতে তাঁদের মেয়ের কাছে গেছেন, দিন কুড়ি সেখানে থাকবেন। অগত্যা প্যাকেটটা তার জিম্বায় রেখে এবং রাধাপ্রসাদজীরা ফেরামাত্র তাঁদের হাতে দেবার অনুরোধ জানিয়ে ফের ট্যাক্সিতে উঠে জয়ন্ত বলে, 'এবার পার্ক সার্কস চলুন—'

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে, 'পার্ক সার্কস কঁহা?'

পার্সের ভেতর একটা ছোট কাগজের টুকরোয় ডরোথি আর ম্যাকলিন ও'ব্রায়েনের ঠিকানা লেখা আছে। সেটা বার করে এক পলক দেখে বলে, 'ইলিয়ট রোডে।'

'ঠিক হ্যায়।'

ট্যাক্সি আলিপুর পেছনে ফেলে নানা রাস্তা ধরে ছুটতে থাকে। এ শহরের প্রায় সবটাই জয়ন্তর অচেনা। সে মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করছে, 'এই রাস্তার নাম কি? এটা কোন এলাকা?'

ড্রাইভার মানুষটি ভাল। সে তুখোড় গাইডদের মতো শুধু নামই না, কোন জায়গার কী স্পেশালিটি, সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এটা চেতলা সেন্ট্রাল রোড, এটা কালিঘাট ব্রীজ, ডান পাশে কেওড়াতলা শ্মশান, বাঁ পাশে খানিকটা গেলে কালী মন্দির, ব্রিজের পর রাসবিহারী অ্যাভেনিউ ইত্যাদি। এইভাবে ধারা বিবরণীর স্টাইলে বলতে বলতে ট্যাক্সিওলা দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে বাঁয়ে ঘুরে ল্যান্সডাউন রোডে তার গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু খানিকটা এগিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে, 'সত্যনাশ হো গিয়া সাব।'

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কী হল?'

'দেখিয়ে না, সামনে জুলুস চল রহা—'

খানিকটা দূরে গোটা রাস্তা জুড়ে বিশাল প্রসেশান চলেছে। কাল এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় বড় মিছিল চোখে পড়েছিল, আজও আরেকটা দেখা গেল। সত্যিই কলকাতা সিটি অফ প্রসেশানস।

ট্যাক্সিওলা উদ্বিগ্ন মুখে ফের বলে, 'কতক্ষণ জুলুসের পেছনে পেছনে কছুয়ার (কচ্ছপের) মতো যেতে হবে কে জানে!'

জয়ন্ত বলে, 'কেন ওদের বললে বেরিয়ে যাবার জন্য জায়গা দেবে না?'

একটা হাত স্টিয়ারিংয়ে রেখে ঘাড় ফিরিয়ে ট্যাক্সিওলা অন্য হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে একটা মাপ দেখিয়ে বলে, 'নেহি সাব, এক সেন্টিমিটার জায়গাও দেবে না।'

'তা হলে এক কাজ করুন।'

'গাড়ি ব্যাক করে অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলুন।'

'পিছা দেখিয়ে—'

পেছন দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে জয়ন্ত। সেখানে শ'খানেক গাড়ির জমাট ভিড়। সেই ভিড় ঠেলে বেরুবার মতো একটুও ফাঁক নেই। জয়ন্ত বলে, 'খুব মুশকিলে পড়া গেল তো।'

ড্রাইভার সায় দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, বহুত মুশকিল।'

'এই মিছিল কোথায় চলেছে?'

'কৌন জানে! সব জুলুস ধরমতল্লা যায়। এ ভি যায়েগা, মালুম হোতা।'

জয়ন্ত আর প্রশ্ন করে না।

মিছিলটা ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। তার পেছনে অগুনতি বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, মিনিবাস, ভ্যান ইত্যাদি। ক্রমশ গাড়ির ভিড় বেড়েই চলেছে।

মাঝে মাঝে মিছিলটা থেকে সমুদ্রের গর্জনের মতো শ্লোগান ভেসে আসছে। ওরা কী বলছে, এতদূরে থেকে অবশ্য বুঝতে পারছে না জয়ন্ত।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলার পর গাড়িগুলো ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকে। একসঙ্গে সবাই হর্ন বাজাতে শুরু করে। শ্লোগান আর একটানা হর্নের আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম। আলিপুর বাদ দিলে এখন পর্যন্ত জয়ন্ত যেখানে গেছে সেখানেই সাউন্ড পলিউশান।

অনবরত হর্ন বাজানোতে কাজ হয়। তা ছাড়া সামনের মিছিলটার লোকজনেরা খুব সম্ভব তেমন অবিবেচক নয়, তারা একধারে সরে গিয়ে দু'ধারের গাড়ির জন্য রাস্তা করে দেয়।

ট্যাক্সিওলা হাঁফ ছাড়ার ভঙ্গিতে বলে, 'বঁচ গিয়া—'

এতক্ষণ বুকে হেঁটে ঘণ্টায় তিন মাইল স্পিডে পেছনের গাড়িগুলো এগুচ্ছিল। এবার গতি বাড়ে, একে একে তারা মিছিল পার হয়ে যেতে থাকে।

কাছাকাছি আসতে শ্লোগানগুলো এবার পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

'বধূহত্যার—'

'প্রতিকার চাই, প্রতিকার চাই।'

'কল্পনা নাহারের খুনিদের শাস্তি—'

দিতে হবে, দিতে হবে।'

'পুলিশের ঘুষ খেয়ে কল্পনা হত্যার কেস—'

'চেপে যাওয়া চলবে না, চলবে না।'

মিছিলের বেশির ভাগই মহিলা, তবে পুরুষও রয়েছে যথেষ্ট। অনেকের হাতেই প্ল্যাকার্ড রয়েছে। ওরা যা শ্লোগান দিচ্ছে সে সব বড় বড় হরফে প্ল্যাকার্ডগুলোতে লিখে এনেছে।

বোঝা যাচ্ছে, কোনো এক কল্পনা নাহার নামে এক গৃহবধূকে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ টাকা খেয়ে হত্যাকারীদের ধরছে না। তারই প্রতিবাদে এই মিছিল। তবে এরা কোথায় চলেছে, সেটা জানা যাচ্ছে না।

আরও খানিকটা যাবার পর মিছিলের মুখের দিকটায় নজর পড়তেই চমকে ওঠে জয়ন্ত। মুঠো পাকানো হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে প্লেনের সেই মেয়ে দু'টি—পল্লবী আর বিশাখা উত্তেজিত কণ্ঠে গলার শির ছিঁড়ে শ্লোগান দিচ্ছে। দুপুরের চড়া রোদ এসে পড়েছে তাদের ওপর। দু'জনেরই মুখ লাল, ঘামে জামা ভিজে গেছে।

কালই জানা গিয়েছিল, বিশাখা আর পল্লবী সোশাল অ্যাক্টিভিস্ট। আজই যে তাদের মিছিলে দেখা যাবে, ভাবতে পারেনি জয়ন্ত। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের চাঞ্চল্য অনুভব করে সে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এদের ডাকতে যাবে, তার আগেই ট্যাক্সিটা হুস করে বেরিয়ে গিয়ে ডান দিকের আরেকটা রাস্তায় ঢুকে পড়ে।

জয়ন্ত একবার ভাবে, ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে পল্লবীদের সঙ্গে দেখা করবে কিনা। পরক্ষণেই মনে হয়, ওদের অর্গানাইজেশনের ঠিকানা তার কাছে আছে, সেখানে গিয়ে পরে দেখা করা যেতে পারে। আপাতত ও'ব্রায়েনদের প্যাকেটটা দিয়ে আসা যাক।

ইলিয়ট রোডে ও'ব্রায়েনদের পুরনো প্লাস্টার-খসা দোতলা বাড়িটা রাস্তার ওপরেই। সেখানে এসে ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল জয়ন্ত।

ও'ব্রায়েনরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। জয়ন্ত শুনেছে, স্বাধীনতার আগে এই কমিউনিটির লোকদের দারুণ দাপট ছিল কলকাতায়। নিজেদের তারা ইংরেজদের কাছাকাছি ভাবত। বলত, তারা হল রাজার জাত—

ব্রিটিশ আদার ব্যাঙ্ক। স্বাধীনতার পর তাদের রমরমা আর প্রতাপ আর রইল না। চাকরি-বাকরি ব্যবসা বা অন্য সব সুযোগও দ্রুত কমে আসতে লাগল। কিন্তু বেঁচে তো থাকতে হবে। তাই ঝাঁক বেঁধে তাদের বেশির ভাগই চলে গেল অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে তখন অজস্র কাজের লোকের দরকার। এমনিতে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা প্রচণ্ড পরিশ্রমী, তার ওপর ক্রিশ্চান এবং ইংরেজি-জানা। অস্ট্রেলিয়া ওদের জন্য হাজারটা দরজা খুলে দিল। ওদের কাছে সে দেশটা হয়ে উঠল—'কাণ্ট্রি অফ মিল্ক অ্যাণ্ড হানি।' কেউ কেউ চলে গেল কানাডায়, কেউ কেউ ব্রিটেনে।

কিন্তু অনেকেই থেকে গেল কলকাতায়। যেমন ডরোথি আর ম্যাকলিন ও'ব্রায়েন। ওঁদের মেয়ে আর জামাই থাকে লণ্ডনের আউট-স্কার্টে—রিচমণ্ডে। জয়ন্তদের বাড়ির তিনটে বাড়ির পর ওদের চমৎকার বাংলো। মেয়ে-জামাই স্টেলা আর হেনরি ও'ব্রায়েনদের জন্য গিফ্ট প্যাকেট পাঠিয়েছে। মাঝে মধ্যে এরকম উপহার, বড়দিন আর নতুন বছরে গ্রিটিংস—এসবের মধ্যেই মা-বাবা এবং শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা কোনোরকমে টিকে আছে।

ডরোথি আর ম্যাকলিন ও'ব্রায়েন বাড়িতেই ছিলেন। ডরোথির বয়স ষাটের ওপর, ভারী চেহারা তাঁর, গায়ের রং বাদামি, চুলের বেশির ভাগটাই এখনও কাঁচা।

ম্যাকলিন ডরোথির চেয়ে বছর চার পাঁচেকের বড়। পাতলা, মেদহীন শরীর, চুল অবশ্য প্রায় সবটাই সাদা হয়ে গেছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

বাড়ির চেহারা দেখে টের পাওয়া যায়, আর্থিক দিক থেকে ও'ব্রায়েনরা ভাল নেই।

ম্যাকলিন একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াতেন, বছর তিনকে আগে রিটায়ার করেছেন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্রাচুইটি যা পেয়েছিলেন, ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে মাসে মাসে তার ইন্টারেস্ট পান। তা ছাড়া বাড়িতে ক'টি ছেলেমেয়েকে স্পোকেন ইংলিশে তালিম দেন। তার থেকে কিছু আয় হয়। পিয়ানো শিখিয়ে ডরোথিও মাসে তিন চার শ টাকা রোজগার করেন। এইভাবে দু'জনের সংসার চলে যায়।

দু'জনেই খুবই হাসিখুশি আর আনন্দে। লণ্ডন থেকে জয়ন্ত তাঁদের জন্য উপহারের প্যাকেট বয়ে এনেছে জেনে তাকে নিয়ে কী করবেন, কোথায় বসাবেন, কেমন করে আপ্যায়ন করবেন যেন ভেবে উঠতে পারছেন না। হাত ধরে ড্রইং রুমে বসিয়ে ম্যাকলিন বলেন, 'থ্যাংক ইউ জয়ন্ত। তুমি যে অতদূর থেকে আমাদের জন্যে এত কষ্ট করে গিফট প্যাকেট নিয়ে এসেছো সে জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

ভীষণ বিব্রত বোধ করছিল জয়ন্ত। 'সে বলে, 'দয়া করে ওভাবে বলবেন না। আমার একটুও কষ্ট হয়নি।'

ডরোথি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জয়ন্ত সম্বন্ধে সব জেনে নিয়ে বলেন, 'আজ আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে যাবে।'

এই দুপুর বেলা খেতে রাজি হলে বয়স্কা মহিলাটিকে আবার হয়তো রান্নাবান্না চড়াতে হবে। ব্যস্তভাবে জয়ন্ত বলে, 'আমি খেয়ে এসেছি।'

'সত্যি বলছ?' সোজাসুজি জয়ন্তর চোখের দিকে তাকান ডরোথি, 'আমি তোমার মায়ের মতো। মিথ্যে বলবে না।'

চোখ নামিয়ে জয়ন্ত বলে, 'না না, সত্যি।' একবার মুখ থেকে যা বেরিয়ে গেছে তার উল্টোটা তো আর বলা যায় না। সেটা খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

ডরোথি এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেন না। একটা প্লেটে ঘরে তৈরি একটা কেক আর এক গেলাস সরবত এনে জয়ন্তকে দিতে দিতে বলেন, 'অন্তত এটুকু না খেলে আমরা খুব দুঃখ পাব।'

আর আপত্তি করাটা অভদ্রতা। চামচ দিয়ে কেক থেকে একটা টুকরো কেটে মুখে পোরে জয়ন্ত।

ডরোথি জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তো দিন পনের কলকাতায় আছো। আমাদের এখানে কবে লাঞ্চ খাবে বল। লাঞ্চ বা ডিনার, যা তোমার ইচ্ছে।'

জয়ন্ত বলে, 'একদিন খেলেই হয়।'

'তুমি অ্যাভয়েড করতে চাইছ। আমি একজাক্ট ডেট চাই।'

'না না, অ্যাভয়েড করব কেন? ঠিক আছে, আজ তো টোয়েন্টি সেকেন্ড সেপ্টেম্বর, টোয়েন্টি নাইনথ লাঞ্চ খাব।'

ডরোথি ও'ব্রায়েন ডান পাশের লম্বা ওয়াল ক্যালেন্ডারে ঊনত্রিশ তারিখের নিচে লিখে রাখেন, 'জয়ন্ত ইনভাইটেড অ্যাট লাঞ্চ।' তারপর মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'লাঞ্চ বলে একেবারে দুপুরবেলা হাজির হয়ো না, সকালের দিকে চলে এস। অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে।'

ম্যাকলিন এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বলেন, 'ন'টার ভেতর তোমাকে এক্সপেক্ট করব।'

ও'ব্রায়েনদের আন্তরিকতা খুব ভাল লাগছিল জয়ন্তর। সে বলে, 'আমি তার মধ্যে চলে আসব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর জয়ন্ত ফের বলে, 'আপনাদের মেয়ে আর সন-ইন-ল একটা কথা বলতে বলেছেন।'

ম্যাকলিন এবং ডরোথি জিজ্ঞেস করেন, 'কী ?'

'ওঁদের ইচ্ছে, আপনার এখানকার বাড়ি বিক্রি করে ওদের কাছে চলে যান।'

স্বামী-স্ত্রী উত্তর দেন না।

জয়ন্ত ওঁদের দিকে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'আমি ওঁদের কী বলব ?'

ম্যাকলিন তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গভীর গলায় বলেন, 'প্রতিটি চিঠিতেই ওরা এই কথাটা লেখে। তুমি কলকাতায় আসছ জেনে তাই তোমাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে। কিন্তু—'

'কী ?'

'আমি আর ডরোথি স্থির করে ফেলেছি, এখান থেকে কোথাও যাব না।'

বিমূঢ়ের মতো জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'যাবেন না ?'

আস্তে আস্তে মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে হেলিয়ে ম্যাকলিন ও'ব্রায়েন বলেন, 'না।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের মেয়ে জামাইয়ের মুখে একটা কথা শুনেছি। দুঃখ যদি না পান, সেটা বলতে চাই।'

'ওরা কী বলেছে, 'অনুমান করতে পারছি। তবু তুমি বল।'

'আপনাদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কমিউনিটির নাকি এদেশে কোনো-

রকম ফিউচার নেই। এখানে তাঁদের বেঁচে থাকাটাই ভীষণ কষ্টকর।'

'ট্রু, অ্যাবসোলুটলি ট্রু—'

জয়ন্ত আগে যা শুনেছিল, ম্যাকলিন ও'ব্রায়েন ঠিক সেই কথাগুলোই আরেকটু বিশদভাবে জানান। কলকাতার পার্ক সার্কাস, এন্টালি, রিপন স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, মার্কুসন স্ট্রিট, ইলিয়ট রোড ইত্যাদি এলাকা এক সময় ছিল পুরোপুরি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের পাড়া। দেশ স্বাধীন হবার পর তাদের অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে গেছে। পড়ে আছে কিছু বুড়োবুড়ি আর যারা বিদেশে যাবার কোনোরকম ব্যবস্থা করতে পারেনি এমন সব মানুষ। তাদের বেশির ভাগেরই অবস্থা ভাল না। অবশ্য বেশ কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। যত কষ্টই হোক তারা এদেশ ছেড়ে যাবে না। যেমন ডরোথি আর ম্যাকলিন ও'ব্রায়েন।

বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন ম্যাকলিন, 'হোয়াই, হোয়াই আই উড লিভ দিস কান্ট্রি? এটা আমার দেশ—আমার জন্মভূমি। কত পুরুষ আমরা এখানে আছি, নিজেরাই জানি না। যে বাড়িতে বসে এখন আমরা কথা বলছি সেটাব বয়স কত জানো? অ্যাবাউট নাইনটি ইয়ার্স। আমার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার ওটা বানিয়েছিলেন। আমার স্ত্রীর আর আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক, এখান থেকে আমরা যাচ্ছি না। জন্মেছি এদেশে, মরবও এদেশেই। যারা ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যেতে চায় তাদের বোঝাই, শুধু আমরাই না, সবাইকেই এখানে স্ট্রাগল করে বাঁচতে হচ্ছে। সো ফাইট, ফাইট অ্যান্ড ফাইট। নেভার সে ডাই।'

ও'ব্রায়েনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বোধ করতে থাকে জয়ন্ত। এঁরা সত্যিকারের ন্যাশনালিস্ট। সে শুনেছে, ভারতবর্ষ ছেড়ে বিদেশে যাবার জন্য কাতারে কাতারে মানুষ ব্রিটেন আমেরিকা, জার্মানি আর কানাডার এমব্যাসিগুলোতে লম্বা 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে মুখ ফুটে একবার 'হ্যাঁ' বললেই ও'ব্রায়েনরা এক মাসের ভেতর লন্ডন চলে যেতে পারেন। কিন্তু এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাবেন না। দেশের জন্য এমন আবেগ আগে আর কোনো ভারতীয়, বিশেষ করে কলকাতার মানুষের মধ্যে সে দেখেনি।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ার জয়ন্ত বলে, 'কিন্তু আপনাদের তো যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। মানুষ ইমমর্টাল নয়। আপনাদের যদি তেমন কিছু হয়—'কথাটা আর শেষ করে না সে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন ও'ব্রায়েনরা। ম্যাকলিন হেসে হেসে বলেন, 'আমরা উইল করে রেখেছি। আমাদের মৃত্যুর পর স্টেলা মানে আমাদের মেয়ে এই বাড়িটাড়ি পাবে। সে আর তার হাজব্যান্ড তখন যা ভাল বুঝবে করবে।'

এরপর আরও খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে উঠে পড়ে জয়ন্ত।

ছয়

ও'ব্রায়েনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করেও ট্যাক্সি ধরা গেল না। বেশ ক'টা ফাঁকা ট্যাক্সি হুস করে সামনে দিয়ে চলে যায়। জয়ন্ত প্রচুর ডাকাডাকি করল কিন্তু ট্যাক্সিওলারা ফিরেও তাকায় না।

কাল এয়ারপোর্টে আর আজ বউবাজারে ট্যাক্সি পেতে অসুবিধা হয়নি জয়ন্তর। সে দুটো বোধহয় ব্যতিক্রম ছিল। কেন যে কলকাতার ট্যাক্সিওলাদের এত দুর্নাম তার কিঞ্চিৎ নমুনা এখন টের পাওয়া যাচ্ছে। এমন অসভ্য, ইতর ট্যাক্সিওলা লন্ডনে ভাবাই যায় না।

খিদে পেয়ে গিয়েছিল মারাত্মক। এখানে কোথায় ভাল রেস্তোরাঁ বা হোটেল আছে জয়ন্ত জানে না। ডরোথি ও'ব্রায়েনকে মিথ্যে করে খেয়ে আসার কথাটা না বললেই হত। সামান্য একটু সংকোচের জন্য এখন তাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে।

রাস্তার লোকদের জিজ্ঞেস করে করে প্রায় দেড় কিলোমিটার হেঁটে পার্ক স্ট্রিটে এসে একটা এয়ার-কনডিশান্ড রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেয় জয়ন্ত। তারপর বাইরে বেরিয়ে লক্ষ্যহীনের মতো হাঁটতে শুরু করে।

এখন তার কোনো কাজ নেই। অবশ্য বাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু বউবাজারের ঘিঞ্জি গলিতে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। 'শান্তি ভবন'-এর যে আবহাওয়া, যা পরিবেশ, ওখানকার মানুষগুলোর যা ধরন-ধারণ

তাতে একদিনেই তার দম বন্ধ হয়ে এসেছে। শুধু ঝুমা ছাড়া আর কেউ সুস্থ বা স্বাভাবিক নয়। ও বাড়ির প্রতিটি বাসিন্দা অত্যন্ত স্বার্থপর, ইতর এবং ধূর্ত। ওদের সংস্রব এড়িয়ে যতক্ষণ বাইরে থাকা যায় ততক্ষণ বোধ হয় ভাল।

কিন্তু কলকাতায় যখন সে এসেই পড়েছে তখন এই শহরটাকে ভাল করে দেখাও তো দরকার। লন্ডনে ফিরে গেলে মা-বাবা জিজ্ঞেস করবেন সে এখানে কী কী দেখেছে, কোথায় কোথায় ঘুরেছে। তা ছাড়া কলকাতায় ছড়িয়ে রয়েছে তাদের বংশের শিকড়। জীবনে হয়তো আর কখনও এখানে আসা হবে না।

পার্ক স্ট্রিটটা খুব ভাল লেগে যায়। বিরাট বিরাট ম্যানসন, হোটেল, বড় বড় এম্পোরিয়াম, শো-উইন্ডো, সারি সারি রেস্তোরাঁ—সব মিলিয়ে লন্ডনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

বেলা পড়ে আসছে। সেপ্টেম্বরের এই সময়টা ভারি চমৎকার। রোদের রং এখন সোনালি হলুদ। দক্ষিণ দিক থেকে ঝির-ঝির স্রোতের মতো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। দিনের তাপও জুড়িয়ে আসছে।

হাটতে হাঁটতে চৌরঙ্গিতে এসে পড়ে জয়ন্ত। অজস্র বাস, মিনি-বাস, ভ্যান, প্রাইভেট কার আর ট্রাম দু'দিক থেকে ছুটে আসছে। ওধারে ময়দান, মেট্রো রেলের স্টেশন, তার গায়ে কার যেন একটা স্ট্যাচু।

চৌরঙ্গির মুখে খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্ত। ট্রাফিক সিগন্যাল চলন্ত গাড়িগুলোকে থামিয়ে দিলে কী ভেবে রাস্তা পেরিয়ে ওধারে চলে যায়। ওখান থেকে অন্য একটা রাস্তা কোণাকুণি ময়দানের ভেতর দিয়ে কোথায় গেছে সে জানে না। একপাশে নিচু কংক্রিটের ফলকে লেখা আছে, গুরু নানক রোড। নামটা পড়ে সামনের দিকে পা বাড়ায় জয়ন্ত।

গুরু নানক রোডটা বেশ ভাল। দু'দিকেই সবুজ কার্পেটের মতো মাঠের ফাঁকে ফাঁকে নানা ক্লাবের টেন্ট। তবে ডান পাশে চৌরঙ্গির গা ঘেঁষে অনেকটা ঘেরা জায়গায় কিসের যেন গোডাউন।

জয়ন্ত একসময় আরেকটা রাস্তার ক্রসিংয়ের কাছে এসে পড়ে। এই রাস্তাটার নাম ইন্দিরা গান্ধী সরণি। চারিদিকে স্রোতের মতো গাড়ি

ছুটে যাচ্ছে। সকালের দিকে সে যখন আলিপুর যায়, ট্যাক্সিওলা দূরে থেকে ইডেন গার্ডেন আর গভর্নর হাউস দেখিয়ে দিয়েছিল।

কলকাতার এই এলাকাটা লন্ডনের কোন একটা জায়গার মতো যেন। এখন ঠিক মনে পড়ছে না। সে শুনেছে ইংরেজরা এই শহরটার কোনো কোনো অংশ লন্ডনের মডেলে গড়ে তুলেছিল। যাই হোক, ইডেন গার্ডেনটা তার অচেনা নয়। টিভিতে বিখ্যাত এই স্টেডিয়ামে টেস্ট ম্যাচ আর ওয়ান-ডে ক্রিকেট দেখেছে জয়ন্ত। আস্তে আস্তে ডান দিকে ঘুরে চওড়া ফুটপাত ধরে সে এগিয়ে যায়। খানিকটা যেতেই বিরাট এক স্ট্যাচু। ওটা যে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মূর্তি, দেখামাত্রই চিনতে পারল জয়ন্ত। কেননা নানা বইয়ে সুভাষচন্দ্রের ছবি সে আগেই দেখেছে।

নেতাজির স্ট্যাচু বাঁয়ে রেখে রানি রাসমণি রোড ক্রস করে জয়ন্ত একসময় সুরেন্দ্রনাথ পার্কে ঢুকে পড়ে। এখানে অগুনতি ট্রামের লাইন। নানা দিক থেকে ট্রাম এসে একটু থেমে কিছু প্যাসেঞ্জার নামিয়ে, নতুন প্যাসেঞ্জার তুলে বিভিন্ন গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। গোটা পার্ক জুড়ে কত যে হকার তার হিসেব নেই। কেউ ফলওলা, কেউ চিনাবাদামওলা, কেউ তেল মালিশওলা, কেউ সস্তা জামাপ্যান্ট, কেউ শরবত, কেউ পানবিড়ি, কেউ হাকিমি দাওয়াই—এমনি নানা জিনিস নিয়ে বসেছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তারা খদ্দের ডাকছে। হই চই এবং চিৎকারে সমস্ত এলাকাটা সরগরম হয়ে উঠেছে। পার্কটা যেন পার্ক নয়, একটা বিরাট গমগমে বাজার। এখানে থিকথিকে ভিড়। একটা পা ফেললে তিনজনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। এধারে ওধারে তাকিয়ে জয়ন্ত একেবারে হাঁ হয়ে গেল। অবলীলা ক্রমে বেশ কিছু লোক পার্কের রেলিংয়ের ধারে পেচ্ছাপ করছে। এমন মুক্ত মূত্রাঙ্গন পৃথিবীর আর কোনো শহরে আছে কিনা সন্দেহ।

কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো চারপাশের ভিড়, হকারদের বেচাকেনা এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকজনের পেচ্ছাপ করা দেখল জয়ন্ত। তার মনে হতে লাগল দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে পার্ক থেকে বেরুতে যাবে, হঠাৎ লাউড স্পিকারে কোনো মহিলার গলা ভেসে এল। এক-টানা বক্তৃতার ঢংয়ে মহিলাটি কিছু বলে যাচ্ছে।

কণ্ঠস্বরটা কোত্থেকে আসছে প্রথমটা বুঝতে পারল না জয়ন্ত। এদিকে সেদিকে তাকাতে তার চোখে পড়ল পার্কের বাইরে, সামনের দিকের রাস্তায় প্রচুর লোক জমা হয়েছে। খুব সম্ভব ওখানে মিটিং-টিটিং চলছে। কৌতূহলের বশে জয়ন্ত এগিয়ে যায়।

লণ্ডনের হাইড পার্কে রোজ বিকেলে খাস ব্রিটিশ থেকে শুরু করে ইণ্ডিয়ান, পাকিস্তানি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের লোক, বাংলাদেশি, চীনা, শ্রীলঙ্কান, এমনি কেউ না কেউ কোনো না কোনো বিষয়ে বলে যায়। বক্তাকে ঘিরে রীতিমতো ভিড় জমে। মাঝে মাঝে সময় পেলে সেখানে গিয়ে বক্তৃতা শুনে আসে জয়ন্ত। পৃথিবীতে কত রকমের সমস্যা যে আছে সেটা এইসব লোকের কথা শুনলে জানা যায়।

এখন জয়ন্তর হাতে অঢেল সময়। তার খানিকটা মহিলার বক্তৃতা শুনেই না হয় খরচ করা যাক। কলকাতার বিশেষ কোনো দিকের একটা সমস্যা সম্পর্কে হয়তো আঁচ পাওয়া যাবে। অবশ্য এখানকার কোনো ব্যাপারেই তার জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে নেই। পনের দিনের জন্য সে এসেছে। এই শহরের ব্যাপারে তার কিসের ইনভলভমেণ্ট! নেহাত সময় কাটানোর জন্যই বক্তৃতা শুনতে যাওয়া।

সুরেন্দ্রনাথ পার্কের বাউণ্ডারি ঘিরে অন্য দিকে লোহার মজবুত রেলিং চোখে পড়ল জয়ন্তর কিন্তু এদিকে অনেকখানি জায়গায় কিচ্ছু নেই, কারা যেন রেলিং উপড়ে ফেলেছে।

ট্রাম লাইন পেরিয়ে ওধারের রাস্তায় চলে যায় জয়ন্ত। হাইড পার্কের মতো চেয়ার বা প্যাকিং বাক্সর ওপর দাঁড়িয়ে এখানে বক্তৃতার ব্যবস্থা নয়, দস্তুরমতো বিরাট মঞ্চ খাড়া করে সভা চলছে। চারিদিকে প্রচুর ফেস্টুন আর প্ল্যাকার্ড। সেগুলোর দিকে চোখ পড়তেই বেশ অবাক হয়ে যায় জয়ন্ত। আলিপুর থেকে পার্ক সার্কাস যাবার সময় বিশাখাদের মিছিলে এই সব ফেস্টুন দেখেছে সে। নিশ্চয়ই বিশাখারা এখানে মিটিংয়ের আয়োজন করেছে।

জয়ন্তর আগ্রহটা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। সে শ্রোতাদের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে মঞ্চের কাছে চলে আসে। উঁচু ডায়াসে অনেকে বসে আছেন, তাদের ভেতর বিশাখা আর পল্লবীদের দেখা যায়।

একজন বর্ষীয়ান মহিলা, খুব সম্ভব গণ্যমান্য কেউ হবেন,

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হয়ে যাবার পর ঘোষণা করা হয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং অধ্যাপিকা বিশাখা চ্যাটার্জি আজকের সভার শেষ বক্তা। এবার তিনি ভাষণ দেবেন।

বিশাখা ধীরে ধীরে মাইকের সামনে এসে বলতে শুরু করে। পণ-প্রথা ভারতীয় সোসাইটিকে কিভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে তার ভূমিকা করার পর বধূহত্যার প্রসঙ্গে চলে আসে। গরিবই হোক আর বড়লোকই হোক, মানুষের লোভ এত বেড়ে গেছে যে ভাবা যায় না। টাকা চাই, অনেক অজস্র টাকা। এই টাকা আদায়ের এক সহজ পথ হল বিয়ের পণ। বাপের বাড়ি থেকে দাবি অনুযায়ী পণ না আনতে পারলে মেয়ে-দের নিস্তার নেই। তাদের ওপর যে ধরনের নির্যাতন চলে সে বর্বর-তার তুলনা মেলা ভার। বিশেষ করে পয়সাওলা লোকেদের বাড়িতেই এই নারী নিগ্রহ আর বধূহত্যার ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

বিশাখা বলতে থাকে, 'আপনারা সবাই জানেন, কল্পনা নাহারকে পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে আমাদের অর্গানাইজেশন 'উইমেন্স্ ওয়ার্ল্ড' আজকের এই সভার আয়োজন করেছে। কল্পনা উপলক্ষ মাত্র। আমাদের সোসাইটিতে এমন হাজার হাজার কল্পনাকে খুন করা হচ্ছে। কল্পনা কলকাতা শহরে থাকত, তাই তার হত্যাকাণ্ডটি চাপা যায়নি কিন্তু ছোট ছোট শহরে বা গ্রামাঞ্চলে যেখানে কোনো রকম মিডিয়া পৌঁছায় নি, 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর মতো অর্গানাইজেশন নেই, সেই সব জায়গায় কল্পনাদের খবর কেউ জানতেও পারে না। আমাদের প্রোস্টেট এ সবের বিরুদ্ধে।

'কল্পনার অপরাধ কী ছিল? সে অর্থবান মা-বাবার মেয়ে। বিয়েও হয়েছে অগাধ টাকাওলা পরিবারে। পণ হিসেবে তার মা-বাবা প্রচুর নগদ অর্থ, তিন চার লাখ টাকার গয়না, আসবাব এবং আরো অনেক কিছু দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির খাঁই তাতে মেটেনি। বিয়ের পর একটা বছরও কাটল না, কল্পনার ওপর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ক্রমাগত চাপ দিতে লাগল বাবার কাছ থেকে আরো টাকা আনতে হবে। প্রথম প্রথম মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে গণ্ডগোলে যেতে চাননি কল্পনার বাবা, মুখ বুজে ওদের খাঁই মিটিয়ে গেছেন। কিন্তু কল্পনা

অন্য ধরনের মেয়ে। সে শিক্ষিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। শ্বশুরবাড়ির এই অন্যায় জুলুম সে মেনে নেয়নি। সে প্রোটেস্ট করেছে বার বার। ফলে তাকে প্রচণ্ড মারধর করা হত, শেষ পর্যন্ত গায়ে আগুন ধরিয়ে কল্পনাকে খুন করে আত্মহত্যা বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। পুলিশকে এ ব্যাপারে মোটা টাকা ঘুষও নাকি দেওয়া হয়েছে, যাতে কেসটা নিয়ে তারা বেশি হইচই না করে। কিন্তু আমাদের 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড' ব্যাপারটা জানতে পেরে তক্ষুনি কল্পনার শ্বশুরবাড়ি ছুটে যায়। ফলে খুনটা চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

'আপনাদের জানানো প্রয়োজন, মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা আজই কল্পনা হত্যার বিষয়ে স্মারকলিপি দিয়ে এসেছি। তিনি তক্ষুনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন, খুনিদের যেন ছাড়া না হয়। আমার বিশ্বাস আজই কল্পনার শ্বশুর, স্বামী, শাশুড়ি, দেওর—অর্থাৎ যারা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তাদের অ্যারেস্ট করা হবে।

'কল্পনা নাহার আর ফিরে আসবে না। যে মূল্যবান জীবনটি নষ্ট হয়ে গেল সে ক্ষতি কোনো দিন পূরণ হবার নয়। ক'টা অত্যন্ত ইতর লোকের লোভের জন্য কল্পনা বলি হয়ে গেল। তার হত্যাকারীদের যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এই শোকাবহ ঘটনার মধ্যে সেটুকুই যা সান্ত্বনা।

'যাতে এভাবে আর কারুর জীবন শেষ না হয়ে যায়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এটা আমাদের সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্ব।'

'স্বাধীনতার পর ক্রমশ একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মানুষ বড় আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর হয়ে উঠছে। নিজের এবং নিজের পরিবারের বৃত্তের বাইরে সে আর কিছু ভাবতে চায় না। প্রত্যেকেই যে যার চামড়া বাঁচিয়ে চলতে চায়। কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে যে পচন শুরু হয়েছে তা থেকে এভাবে নিজেকে বাঁচানো যায় না।

'পণপ্রথা, বধূহত্যা, নারীনির্যাতনের মতো ঘটনা আজ ক্যানসারের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। এটা দু-চারজনের পক্ষে ঠেকানো সম্ভব নয়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই পাপ এই অন্যায় নির্মূল করতে হবে।

'আজ যারা এই সভায় উপস্থিত আছেন তাঁদের কাছে আমার

একান্ত অনুরোধ, আপনারা এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। যেখানেই নারীহত্যা নারী নিগ্রহের মতো ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দেবে, সঙ্গে সঙ্গে তা প্রতিরোধ করুন। পুলিশকে জানান। যদি কোনো অসুবিধে থাকে আমাদের 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিসে খবর দিন। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এ পাপ বন্ধ হতে বাধ্য। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ। নমস্কার।'

বিশাখার বলার স্টাইলটা চমৎকার। কণ্ঠস্বরকে কখনও উঁচুতে তুলে কখনও নামিয়ে অদ্ভুত এক আবেগকে সে শ্রোতাদের ভেতর চারিয়ে দিতে পেরেছে।

শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল জয়ন্ত। এখন থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে অন্য এক সোসাইটিতে সে মানুষ। ডাউরি সিস্টেমের কথা সেখানে ভাবাই যায় না। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই পছন্দ করে ওদেশে বিয়ে করে। মা-বাবা তাদের আশীর্বাদ করে কিছু উপহার দেন। এই দেওয়ার ভেতরে কোনোরকম জুলুম বা দাবি থাকে না।

ইণ্ডিয়ার পণপ্রথার কথা বইতে পড়েছে জয়ন্ত, মা-বাবার কাছেও কিছু কিছু শুনেছে। কিন্তু তার জন্য একটি বিবাহিতা মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খুন করতে পারে,. এটা অভাবনীয়। এই বর্বর সিস্টেম সভ্য সমাজে কীভাবে টিকে থাকতে পারে, জয়ন্তর মাথায় তা ঢুকছে না। ভারতবর্ষ কোন অন্ধকার যুগে পড়ে আছে, কলকাতায় না এলে জানতে পারত না জয়ন্ত।

'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড', বিশেষ করে বিশাখার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় জয়ন্তর। এরা পণপ্রথা, বধূহত্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এটা খুব সামান্য ব্যাপার নয়।

সভা শেষ হবার পর লোকজন চলে যেতে শুরু করেছে। ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে মঞ্চ থেকে বিশাখারা নেমে আসছে। জয়ন্ত লম্বা লম্বা পা ফেলে তাদের কাছে চলে আসে। বিশাখাকে বলে, 'চিনতে পারছেন?'

বিশাখা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বলে, 'চিনব না, বলেন কী! আমার স্মৃতিশক্তি এত খারাপ নয়। কিন্তু আপনি এখানে?'

জয়ন্ত একটু হেসে বলে, 'আপনার বক্তৃতা শুনেতে।'

বিস্ময়ের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বেড়ে যায় বিশাখার। সে বলে, 'আপনি জানতেন নাকি, আজ আমাদের এখানে মিটিং আছে?'

'না।'

'তবে?'

কীভাবে এখানে এসে পড়েছে, জানিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বলে, 'আপনি খুব ভাল বলেন—সুপার।'

জয়ন্তর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধতা ছিল। বিশাখার মতো স্মার্ট মেয়েও একটু লজ্জা পায়। তার মুখে রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ে।

জয়ন্ত এবার বলে, 'আমি জানতাম না এখানে ডাউরি সিস্টেমটা এত ভয়ঙ্কর।'

বিশাখা বলে, 'আপনি তো এদেশে থাকেন না, থাকলে বুঝতে পারতেন এখানে আরও অসংখ্য খারাপ সিস্টেম রয়েছে। তবে আমাদের বিষয় হল উইমেন, আমরা তাদের নিয়ে কাজ করি।'

এই সময় কয়েকটি অল্প বয়সের মেয়ে ছুটতে ছুটতে বিশাখাদের কাছে চলে আসে। তাড়া দিয়ে বলে, 'বিশাখাদি চল চল, সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সন্ধ্যেবেলা সেই মেয়েটা অফিসে আসবে। মনে আছে তো?'

বিশাখার কিছু মনে পড়ে যায়। সে ব্যস্তভাবে জয়ন্তকে বলে, 'আমাদের এবার যেতে হবে। একটি মেয়ে ভীষণ সমস্যায় পড়েছে। এখান থেকে গিয়ে তার কথা শুনব। তারপর কীভাবে তাকে সাহায্য করা যায় ভাবতে হবে। আচ্ছা নমস্কার।'

বিশাখা যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ জয়ন্ত ডাকে, 'শুনুন।'

বিশাখা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবেন?'

'আমি আপনাদের সঙ্গে গেলে অসুবিধা হবে?'

'কেন যেতে চাইছেন?'

'প্লেনে বলেছিলাম না, আপনাদের অর্গানাইজেশনের কাজকর্ম দেখতে চাই।'

'ও হ্যাঁ। তাই তো—'

সেই জন্যেই যেতে চাইছি। কল্পনা নাহারের মার্ডার সম্বন্ধে আপনারা যা করেছেন তার কিছুটা তো নিজের চোখে দেখলাম। যে মেয়েটি তার প্রবলেম নিয়ে আপনাদের অফিসে ওয়েট করবে তার সম্পর্কে কী করেন সেটাও জানতে চাই। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন—'

'কী?'

'আমার পূর্বপুরুষ ইণ্ডিয়ার মানুষ হলেও এদেশ আমার কাছে অলমোস্ট আননোন। যে ক'দিন এখানে আছি, তার ভেতর এতবড় একটা কাণ্ট্রির কিছুই জানা সম্ভব নয়। তবু আপনাদের অর্গানাইজেশনের অ্যাক্টিভিটি দেখে ইণ্ডিয়ান উইমেনদের ব্যাপারে যদি কিছু ধারণা করা যায়, সেই জন্যেই আর কি—'

'আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চান, আপত্তি নেই। কিন্তু—'

'বলুন—' গভীর আগ্রহে বিশাখার দিকে তাকায় জয়ন্ত।

বিশাখা বলে, 'আপনি তো ট্যাক্সি থেকে আমাদের মিছিল দেখেছেন। আমরা সেই ভাবেই, মানে প্রসেশন করে সাউথ ক্যালকাটায় 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিসে ফিরে যাব। প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে যেতে কষ্ট হবে না তো?'

'একেবারেই না।' জয়ন্ত বলে, 'সবাই পারলে আমিই বা পারব না কেন?'

বিশাখা একটু হাসে। বলে, 'ভালই হল। আমাদের দলে একজন বাড়ল। লণ্ডনে ফিরে গিয়ে আপনার এক্সপিরিয়েন্সের কথা ওখানকার লোকজনকে বলতে পারবেন।'

মিছিল করে ফেরার সময় পল্লবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মঞ্চে তাকে একবার দেখেছিল জয়ন্ত। তারপর কখন কোথা দিয়ে সে নেমে গিয়েছিল, লক্ষ্য করেনি। মজার গলায় পল্লবী বলে, 'কাল আলাপ হল, আর আজই আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন দেখছি।'

জয়ন্ত ঘাড় হেলিয়ে একটু হেসে বলে, 'হ্যাঁ। আপনাদের অ্যাক্টিভিটি দেখে খুব ইন্সপায়ার্ড ফিল করছি। যে ক'দিন আছি, আপনাদের সঙ্গে কাজ করলে আপত্তি আছে?'

'একটুও না। তবে—'

'কী?'

বিশাখা কাছাকাছিই ছিল। সে হঠাৎ বলে ওঠে, 'অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় আমাদের সঙ্গে আসবেন না, ইটস আ গ্রিম স্যোশ্যাল কজ। যদি হিউম্যানিটারিয়ান গ্রাউণ্ডে আসতে চান, ওয়েলকাম।'

জয়ন্ত জানায় মানবিক কারণেই সে বিশাখাদের সঙ্গে কাজ করাত চায়।

সাত

সন্ধ্যের কিছুক্ষণ পর সাউথ ক্যালকাটায় 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিসে পৌঁছে গেল বিশাখারা।

টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের কাছে, ডান দিকের একটা রাস্তায় অনেকখানি ফাঁকা জায়গার মাঝখানে একটা দোতলা বাড়িতে এই অফিস। সামনের দিকে একটা কাঠের ফলকে সুন্দর হরফে লেখা আছে, 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'।'

মিছিল করে যারা ফিরে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই আর অফিস কমপাউণ্ডে ঢুকল না, গেটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। শুধু থেকে গেল বিশাখা, পল্লবী, একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার মাঝবয়সী মহিলা এবং আরও দু-চার জন তরুণ তরুণী।

এদের সবাইকে আগেই দেখেছে জয়ন্ত। বয়স্কা ওই মহিলাটির বক্তৃতা শুনেই সে মিটিংয়ে ঢুকেছিল।

বিশাখা জয়ন্তকে বলে, 'চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক। সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

একতলায় দু'খানা ঘর নিয়ে 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিস। বড় ঘরখানায় বিরাট একটা টেবিল ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। দেওয়াল জুড়ে তিন চারটে বিরাট আলমারি, নানারকম বই আর কাগজপত্রে ঠাসা। একটা দেওয়ালে কী সব চার্ট টাঙানো রয়েছে। একধারে একটি মেয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কী সব লিখছে।

পাশের ঘরখানা তুলনায় ছোট। সেখানে কে বা কারা আছে দেখা যাচ্ছে না। তবে টাইপ মেশিনের একটানা খটখটানি ভেসে আসছে।

বিশাখা বলে, 'এতটা রাস্তা হেঁটে নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড হয়ে পড়েছেন। আগে বসে রেস্ট নিয়ে নিন।'

জয়ন্ত একটু হাসে। বলে, 'আপনারা তো বেশি টায়ার্ড। আমি একবার প্রসেশনে হেঁটেছি, আপনার দু দু'বার। তার ওপর মিটিং করেছেন।'

'ও সব আমাদের অভ্যাস আছে।'

সবাই বসে পড়েছিল। সেই মধ্যবয়সী সম্ভ্রান্ত চেহারার মহিলাটি বড় টেবিলের ওধারে বসেছেন। বাকি সবাই টেবিলের এধারে।

বিশাখা সবার সঙ্গে জয়ন্তর পরিচয় করিয়ে দেয়। বয়স্কা মহিলাটি সুরমাদি—সুরমা চৌধুরী। তিনি 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর ক্যালকাটা ইউনিটের প্রেসিডেন্ট। এই বাড়িটা তাঁরই। সুরমার জীবনে দুটো দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। বিয়ের দশ বছরের মাথায় তিনি স্বামীকে হারান। একটি ছ'বছরের মেয়ে ছাড়া সংসারে কেউ ছিল না। বিয়ের আগে বি. এ পাশ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রাইভেটে এম. এ পরীক্ষা দিয়ে ভাল রেজাল্ট করেন। এই বাড়ি ছাড়া কিছুই রেখে যেতে পারেননি স্বামী। তাই একটা চাকরি নিতে হয়েছিল তাঁকে। ব্যাঙ্কের চাকরি। গোড়ায় ছিলেন আপার ডিভিসন ক্লার্ক, তারপর কয়েক বছরের মধ্যে অফিসারস গ্রেডে প্রোমোশন পান। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে রুমিকে মানুষ করে তুলতে থাকেন। রুমি গ্র্যাজুয়েট হবার পর একটা অভিজাত পরিবারে তার বিয়ে দেন। এই বিয়ের পরিণাম সুখের হয়নি। কল্পনা নাহারের শ্বশুরবাড়ির মতো রুমির শ্বশুরদেরও টাকার খাঁই ছিল প্রচণ্ড, যা মেটানো সুরমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। রুমির ওপর এমন মানসিক নির্যাতন শুরু হয় যে শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রথমে এতই ভেঙে পড়েন সুরমা যে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন। মনে হয়, রুমির মৃত্যুর পর বেঁচে থাকাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। পৃথিবী তাঁর কাছে একেবারেই শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মধ্যে যেন বিস্ফোরণ ঘটে যায়। না, এভাবে নিজেকে ধ্বংস করার মানে হয় না। রুমির মতো আরও অসংখ্য রুমি রয়েছে। তাদের জন্য কিছু একটা করা দরকার। যদি একটি মেয়েকেও সামাজিক

জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তার মধ্যেই রুমি বেঁচে থাকবে।

গোড়ায় পণপ্রথা বধূহত্যার বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ শুরু করেছিলেন সুরমা। বছর তিনেক এভাবে চলার পর 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। সুরমা নিজের বাড়িতে তার ব্রাঞ্চ খোলেন। মহৎ কাজের নিজস্ব একটা শক্তি থাকে, চুম্বকের মতো তার প্রবল আকর্ষণ। ধীরে ধীরে অজস্র ঝকঝকে তরুণ তরুণী তাঁর সহযোদ্ধা হয়ে ওঠে। এখন তাঁদের এই কলকাতা ইউনিটের মেম্বারের সংখ্যা আড়াই শ'র ওপর।

সুরমা ছাড়া এ ঘরে রয়েছে আরও পাঁচজন। পল্লবীর সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছে। অন্য চারজন হল নীরা, তন্ময়, আনন্দ আর কোণের দিকে যে একমনে মাথা গুঁজে লিখে যাচ্ছে সে হল তাপসী। নীরা আর তন্ময় কলেজে পড়ায়, ওরা স্বামী-স্ত্রী, আনন্দ একটা ইমপোর্ট এক্সপোর্ট কোম্পানিতে একজিকিউটিভ। তাপসী পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করে।

পরিচয়ের পালা শেষ হলে জয়ন্ত বলে, 'আপনাদের এখানে এসে খুব ভাল লাগছে। বিদেশে কলকাতার ভীষণ বদনাম। অনেকের কাছেই শুনি, এটা নাকি ডেড সিটি। এখানে কিছুই হয় না। এভরিথিং ইজ স্ট্যাগনাণ্ট। কারও কোনও ব্যাপারে উৎসাহ নেই, চোখের সামনে মানুষ মরে গেলেও কেউ ফিরে তাকায় না। সো ইনডিফারেণ্ট, সো ক্রুয়েল ইজ দিস সিটি। কিন্তু আপনাদের দেখে খুব শ্রদ্ধা হচ্ছে। মনে হয়, কলকাতা মরে যায়নি। সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এখনও প্রোটেস্ট করতে জানে।'

আবেগের ঝোঁকে এক দমে কথাগুলো বলে একটু থামে জয়ন্ত, সবাইকে লক্ষ করতে করতে লাজুকভাবে হাসে। তারপর ফের শুরু করে, 'ওই দেখুন, ইমোশনালি অনেক কথা বলে ফেললাম।'

সুরমা বলেন, 'না না, ঠিক আছে। একটা কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। যদি কারও একটু কাজে লাগতে পারি, জীবনের একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। নইলে খেলাম, ঘুমোলাম, পয়সা রোজগার করলাম—এই সব করতে করতে একদিন আয়ু শেষ হয়ে গেল।

পোকামাকড়ের সঙ্গে এই জীবনের তফাতটা কী ?' বলতে বলতে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ডাকেন, 'তাপসী।'

কোণের মেয়েটি চোখ তুলে তাকায়। সুরমা জিজ্ঞেস করেন, 'সেই মেয়েটি, মানে সন্ধ্যেবেলা যার আসার কথা ছিল—সে কি এসেছে ?'

তাপসী বলে, 'আমি ঠিক বলতে পারব না। পাঁচটায় এখানে এসেছি। তারপর কাউকে আসতে দেখিনি।

'পাশের ঘরে ওয়েট করছে না তো ?'

'বলতে পারব না।'

পাশের ঘরে টাইপ করার আওয়াজ এখনও শোনা যাচ্ছে। সুরমা গলার স্বর উঁচুতে তুলে ডাকেন, 'কণা—কণা—'

টাইপ রাইটারের শব্দ থেমে যায়। 'যাই সুরমাদি—' বলতে বলতে একটি সুশ্রী তরুণী দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়, 'আপনারা যে এসে গেছেন, টের পাইনি। একটি মেয়ে ঘণ্টাখানেক ও ঘরে আপনাদের জন্যে ওয়েট করছে আর সমানে কাঁদছে।'

'কাঁদছে! কেন ?'

'অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু উত্তর দেয় না। একবার শুধু বলল যা জানাবার আপনাকে জানাবে।'

'ঠিক আছে, ওকে পাঠিয়ে দাও।'

কণা চলে যায়। মিনিটখানেক বাদে যে মেয়েটি এ ঘরে আসে তার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে জয়ন্ত। সে দীপা। তার চুল উস্কখুস্ক, পরনের শাড়িটি এলোমেলো, চোখ ফোলা ফোলা এবং টকটকে লাল, গালে চোখের জলের দাগ। বোঝা যায় সে অনেকক্ষণ কেঁদেছে। হয়তো দু-একদিন তার খাওয়াও হয়নি।

বিদ্যুৎচমকের মতো 'শান্তি ভবন'-এর সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা চোখের সামনে ফুটে ওঠে জয়ন্তর। রাজশেখর দীপাকে চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা মারতে মারতে বাড়ি থেকে বার করে দিচ্ছেন, বড় এবং মেজ জেঠিমারা হিংস্র ভঙ্গিতে চিৎকার আর গালাগাল করছেন। সেই দীপাকে 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিসে এভাবে দেখা যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল।

জয়ন্ত বুঝতে পারছিল দীপা তাকে চিনতে পারেনি। রাজশেখর

যখন ওকে জোর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন তখন দীপা নিশ্চয়ই তাকে লক্ষ করেনি। সেই সময়টা অন্য কোনও দিকে তার পক্ষে তাকানো সম্ভব ছিল না।

সুরমা বলেন, 'তোমার নাম নিশ্চয়ই দীপা। এখানে আসবে বলে কাল ফোন করেছিলে?' ঠিক মেয়েটিই এসেছে কিনা জেনে নেবার জন্য তিনি প্রশ্নটা করেন।

দীপা অবরুদ্ধ গলায় বলে, 'হ্যাঁ।'

'বসো।' একটা চেয়ার দেখিয়ে দেন সুরমা।

দীপা জড়সড় হয়ে বসে পড়ে।

সুরমা বলেন, 'বলেছিলে তুমি খুব বিপদে পড়েছ। কী হয়েছে?'

মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকে দীপা।

সুরমা সামনের দিকে ঝুঁকে এবার বলেন, 'কী হল? বল—'

চোখ তুলে আড়ষ্টের মতো ঘরের সবাইকে দেখে নেয় দীপা। তারপর ফের মুখ নিচু করে বলে, 'আমি—আমি—'

সুরমা দীপার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বলেন, 'আমি কী?'

দীপা আবছা, কাঁপা গলায় বলে, 'আপনাকে আলাদা বলতে চাই।'

কী ভেবে সুরমা বলেন, 'আমাকে যা বলবে, আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য মেম্বারদের কাছে তা গোপন থাকবে না।' একটু থেমে ফের বলেন, 'তোমার নিশ্চয়ই কিছু সমস্যা আছে। আমি একা তো আর প্রতিকার করতে পারব না, সবাই মিলে করতে হবে। তাই ওদেরও জানা দরকার।'

'কিন্তু—'বলে এক পলক জয়ন্ত তন্ময় আর আনন্দর দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায় দীপা।

সুরমা বুঝতে পারছিলেন, দীপার জীবনে হয়তো লজ্জাকর দুঃখজনক এমন কোনও ঘটনা আছে যা ছেলেদের সামনে বলা যায় না। তিনি জয়ন্তদের এ ঘরে বসিয়ে রেখে দীপা পল্লবী বিশাখা আর নীরাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যান।

আনন্দ এবং তন্ময় জয়ন্ত সম্পর্কে খুব কৌতূহল বোধ করছিল। লন্ডনে সে কতদিন আছে, কী করছে, ওখানকার সোসাইটিতে বাঙালিরা কতটা মানিয়ে নিতে পেরেছে, তাদের নিজস্ব আইডেন্টিটি বজায় রাখা

সম্ভব হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে তারা প্রশ্ন করতে থাকে। জয়ন্ত অন্যমনস্কর মতো উত্তর দিয়ে যায়। আসলে দীপার ব্যাপারে প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছিল তার। সাংঘাতিক কিছু সমস্যা যে দীপার রয়েছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু সেটা কী ধরনের এবং তার জন্য রানা কতটা দায়ী তা না জানা পর্যন্ত দারুণ মানসিক চাপ বোধ করছে জয়ন্ত।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর সুরমারা আবার এ ঘরে ফিরে আসেন। সবার মুখ ভীষণ থমথমে, শুধু দীপা আঁচলে মুখের অর্ধেকটা ঢেকে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে।

সুরমা তাঁর চেয়ারে বসতে বসতে বলেন, 'দীপার লাইফে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা তোমরা পরে শুনো। আজ সবাই বাড়ি যাও। কাল সন্ধ্যে ছ'টায় একবার এসো। যে মেম্বাররা এখন নেই তাদেরও ফোন করে কাল আসার কথা বলে দেব। তোমাদের সঙ্গে কারুর দেখা হলে জানিয়ে দিও। দীপার ব্যাপারে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলেন, 'যে কদিন দীপার প্রবলেমের কিছু একটা সলিউশান না হচ্ছে, ও আমার কাছেই থাকবে।'

অদ্ভুত রাগে বিশাখার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। সে বলে, 'ওই রাসকেলটাকে আমরা কিন্তু ছাড়ব না।'

'ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

কোন রাসকেলকে ছাড়া হবে না, তা ঠিকই আন্দাজ করতে পারছিল জয়ন্ত।

এরপর বিশাখা ছাড়া বাকি সবাই একে একে চলে যায়। পল্লবীর যাবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু তার বাড়িতে একটা জরুরি কাজ আছে, তাই সে থাকতে পারল না।

সকলে চলে গেছে কিন্তু জয়ন্তর ওঠার লক্ষণ নেই। বিশাখা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি বাড়ি যাবেন না? এরপর ট্যাক্সি পেতে কিন্তু অসুবিধে হবে।'

জয়ন্ত বলে, 'আপনাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, সেটা বলার পর যাব।'

'বেশ তো, বলুন।'

দীপাকে দেখিয়ে জয়ন্ত বলে, 'এর সামনে বলতে পারব না।'

সুরমারা খুব অবাক হয়ে যায়। বিশাখা বলে, 'কেন, অসুবিধেটা কী?'

জয়ন্ত জানায় তার বক্তব্য দীপার সম্পর্কেই। সে কাছে থাকলে তার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হবে না।

সবাই, বিশেষ করে দীপা চকিত হয়ে জয়ন্তর দিকে তাকায়। একটি অচেনা যুবক তার সম্বন্ধে কী বলতে চায়, সেটাই ভেবে পাচ্ছে না সে।

বিশাখা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি দীপাকে চেনেন?'

জয়ন্ত বলে, 'এ প্রশ্নের উত্তর আমি এখন দেব না।'

সুরমা পলকহীন জয়ন্তকে লক্ষ করছিলেন। তিনি দীপাকে বলেন, 'তুমি একটু পাশের ঘরে গিয়ে বসো। আমরা এর সঙ্গে কথা বলে তোমাকে ডেকে নেব।'

শ্বাসরুদ্ধের মতো জয়ন্তকে দেখতে দেখতে বাইরে বেরিয়ে যায় দীপা।

সুরমা বলেন, 'এবার বলুন—'

জয়ন্ত বলে, 'আমি আপনার থেকে অনেক ছোট। আপনি টাপনি করে বললে শুনতে খারাপ লাগে।'

অল্প হেসে সুরমা বলে, ঠিক আছে, 'বল।'

'আমি দীপার সম্বন্ধে ডিটেলে সব জানতে চাই। ওর সমস্যাটা কী?' বলে সুরমার চোখের দিকে তাকায় জয়ন্ত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন সুরমা। তারপর সতর্ক ভঙ্গিতে বলেন, 'তা জেনে কী হবে?'

'আমাকে জানতে হবে।' জয়ন্তর কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা ফুটে বেরোয়।

'কেন?'

জয়ন্ত বুঝতে পারছিল, তার উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত দীপার ব্যাপারে এঁরা মুখ খুলবেন না। এদিকে রানা বা তাদের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে কিছু যে সে জানাবে, এই মুহূর্তে তা-ও সম্ভব হচ্ছে না। জয়ন্ত সব দিক বাঁচিয়ে বলে, 'আমার ধারণা, দীপার

...মৌলিক কিছু ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতিটা কে করেছে, খুব সম্ভব তাকে আমি জানি।'

সুরমা আর বিশাখা চমকে ওঠে। সুরমা বলেন, 'স্ট্রেঞ্জ!'

'স্ট্রেঞ্জ কেন?'

'তুমি লন্ডনে থাকো, সবে কালই কলকাতায় এসেছ। তুমি জানলে কী করে?'

'ধরুন, হঠাৎ কোনওভাবে জেনে ফেলেছি।' বলে একটু চুপ করে থাকে জয়ন্ত। তারপর ফের শুরু করে, 'দীপার প্রবলেমের ব্যাপারটা জানতে পারলে হয়তো আমি কিছু সাহায্য করতে পারি।'

সুরমা মনস্থির করে উঠতে পারেন না। সম্পূর্ণ অচেনা এই ছেলেটা যে কিনা এ দেশের সিটিজেনও নয়—কীভাবে সাহায্য করবে, কে জানে। আবার এমনও হতে পারে, ওর কাছ থেকেই সব থেকে বেশি সহযোগিতা পাওয়া যাবে। দ্বিধান্বিতভাবে সুরমা বলেন, 'তোমার যখন এত আগ্রহ, শোন—'

এরপর তিনি যা বলে যান তা এই রকম। দীপা একটি যুবককে ভালবাসে, তার নাম রানা। রানা কলকাতার এক বিখ্যাত বংশের ছেলে। নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে তো বটেই, এই সেঞ্চুরিতেও স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত তাঁদের নাম শুনলে বাঙালিরা শ্রদ্ধায় এবং ভক্তিতে আপ্লুত হত। সোশাল হিস্টোরিয়ানরা এঁদের নানা কীর্তির কথা তাঁদের রিসার্চওয়ার্কে সসম্ভ্রমে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কলকাতার আর সব কিছুর মতো এই বংশেরও ক্ষয় শুরু হয়। এখন যাঁরা বংশধর, অধঃপতনের শেষ সীমায় নেমে গেছে। ইদানীং এদের দেখলে কষ্টই হয়। পুরনো গৌরবের সবটুকুই এরা নিজেদের হাতে ধ্বংস করে ফেলেছে। রানা এই নষ্ট জেনারেশনেরই একজন।

দীপার ব্যাকগ্রাউন্ডটা এইরকম। সে মিডল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়ে বাবা-মা, দুই বোন আর এক ভাই নিয়ে তাদের মাঝারি মাপের সংসার। ভাইবোনদের মধ্যে দীপা বড়। তারপর ভাই, সবার ছোট হল বোন। দুজনই কলেজে পড়ে। বাবা একটা বড় প্রাইভেট ফার্মে বড়বাবু।

রানাদের বাড়ি বউবাজার এরিয়ায়, দীপারা থাকে কলেজ স্ট্রিটের কাছে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে।

রানা আর দীপা একই কলেজে পড়ত। রানা তার চেয়ে বছর তিনেকের সিনিয়র। কলেজেই তাদের আলাপ, ঘনিষ্ঠতা এবং প্রেম। তারা ঠিক করে ফেলে বিয়ে করবে। কিন্তু করব করব করেও বিয়েটা ঝুলিয়ে রাখে রানা এবং দীপার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার চরম ক্ষতিটি করে বসে।

দীপা এখন গর্ভবতী। বার বার ব্যাকুলভাবে রানাকে সে বিয়েটা সেরে ফেলতে বলে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে রানা তাকে এড়িয়ে চলছে। এদিকে মা-বাবা তার প্রেগনান্সির খবরটা জানতে পেরেছেন।

পুরুষ শারীরিক দুষ্কর্ম করলে পার পেয়ে যেতে পারে, তার গায়ে কোনও দাগ লেগে থাকে না। কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা লুকিয়ে রাখার তো উপায় নেই, লোকের চোখে তা ধরা পড়বেই।

আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সোসাইটিতে কুমারী মেয়েদের গর্ভধারণ অতীব গর্হিত ঘটনা, এতে তার দোষ থাক আর না-ই থাক।

মা-বাবার পক্ষে অবিবাহিত মেয়ের গর্ভবতী হওয়াটা যেমন মর্মান্তিক তেমনি লজ্জাকর। লোকের কাছে মুখ দেখানো তখন অসম্ভব হয়ে পড়ে। দীপার মা-বাবা তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীরা জানার আগেই তাকে বিয়ে করতে হবে, নইলে তাঁদের বাড়িতে দীপার জায়গা হবে না। যে মেয়ে মা-বাবার মুখে চুনকালি লাগায় তার মরাই ভাল।

রানাকে ধরতে পারছিল না দীপা, তাই ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারার মতো ক'দিন ধরে সে ওদের বাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু রানার মা-বাবা বা অন্য আত্মীয়রা তার কোনো কথাই শুনতে চায় না। যত বার সে গেছে তত বার ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে দীপা 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এ এসেছে।

শুনতে শুনতে রানার ওপর অসহ্য রাগে কপালের দু'পাশের শিরাগুলো যেন ফেটে পড়ে জয়ন্তর। বড় জেঠামশাই, বড় জেঠাইমা এবং বাড়ির অন্য সবার সম্বন্ধে এখন তার মনোভাব একটাই, তা হল ঘৃণা—প্রচণ্ড ঘৃণা। অবশ্য এদের মধ্যে ঝুমা বাদ।

কেন রানা তাকে লণ্ডনে চাকরি যোগাড় করে দিতে বলেছে, এখন তা বোঝা গেল। সে কলকাতা থেকে পালাতে চায়। আশ্চর্য, ছেলে একটা মেয়ের চরম সর্বনাশ করল অথচ চারুলতা এবং রাজশেখর তার বিরুদ্ধে একটা আঙুল পর্যন্ত তোলেন নি। উল্টে দীপার চুলের ঝুঁটি ধরে মারতে মারতে রাস্তার কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছেন, যেন সমস্ত অপরাধটা তারই। এমন নিষ্ঠুরতা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সরমা বলেন, 'সব জানিয়ে ছিলাম। এটাকে দীপার ব্যাকগ্রাউণ্ড হিস্ট্রি বল তো ব্যাকগ্রাউণ্ড হিস্ট্রি, আর সমস্যা বল তো সমস্যা।'

জয়ন্ত রানা এবং 'শান্তি ভবন'-এর লোকজনের কথা ভাবছিল। চমকে উঠে বলে, 'প্রবলেমটা যে এত ভয়ঙ্কর, ভাবতে পারিনি।'

'দীপার যা মানসিক অবস্থা, আত্মহত্যা করে বসতে পারে। তাই ওকে আমার কাছে রেখে দিলাম, তাতে ওকে চোখে চোখে রাখতে পারব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সুরমা বলেন, 'সব শুনলে। এখন বল কীভাবে এই সমস্যায় সাহায্য করতে পারবে ?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় না জয়ন্ত। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে, 'আপনারা দীপার ব্যাপারে কী করতে চান ?'

'কিছু একটা স্টেপ তো নিতেই হবে।'

'কী ধরনের স্টেপ ?'

সুরমা বলেন, 'এই তো কিছুক্ষণ আগে দীপার কথা শুনলাম। এখনও এক ঘণ্টা হয়নি। ওর সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে, তারপর তো স্টেপের প্রশ্ন।'

জয়ন্ত বলে, 'আপনারা যা করবেন তাতে আমার ফুল সাপোর্ট রয়েছে। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।' তার খেয়াল থাকে না, মাত্র কয়েকদিনের জন্য সে কলকাতায় এসেছে। হিথ্রো এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে চড়ার আগে ঠিক করে রেখেছিল এখানকার কোনও ব্যাপারেই 'ইনভলভড' হবে না। কিন্তু নিজের অজান্তে সে দ্রুত জড়িয়ে যাচ্ছে।

সুরমা বলেন, 'তোমাকে আমাদের সঙ্গে পেলে তো ভালই হয়। যত সহযোদ্ধা পাওয়া যাবে ততই আমাদের শক্তি বাড়বে।'

'ধন্যবাদ।' জয়ন্ত বলে, 'আপনারা কী করবেন, আমি যেন জানতে পাই।'

'পাবে। তোমার ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দিয়ে যাও। আমরা কনট্যাক্ট করে নেব।'

ঠিকানা জানাতে গিয়ে থমকে যায় জয়ন্ত। এতক্ষণ আবেগের বশে চালিত হচ্ছিল সে। ঠিকানা দিতে হলে 'শান্তি ভবন'-এর কথা বলতে হয়। দীপা ও বাড়ির নামটাম নিশ্চয়ই সুরমাদের জানিয়ে দিয়েছে। সুরমারা যদি জানতে পারেন সে 'শান্তি ভবন'-এ আছে এবং রানা তার জেঠতুতো ভাই, তাহলে ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠতে পারে। তাকে নানারকম প্রশ্নের জবাবদিহি তো করতেই হবে, দীপা সম্পর্কে তার আন্তরিকতার ব্যাপারে সুরমারা সন্দিগ্ধও হয়ে উঠতে পারেন।

তাছাড়া আরেকটা দিকও আছে। খানিক আগে ঝোঁক এবং আবেগের বশে দীপার ব্যাপারে সে সাহায্য করার কথা বলে ফেলেছিল। এখন সচেতন হয়ে ওঠে। দীপার প্রবলেমের সলিউশান করতে গেলে, আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করে বড় জেঠাদের সঙ্গে কনফ্রনটেশন অনিবার্য। সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে কীভাবে সমস্যাটার সম্মানজনক সমাধান সম্ভব সেটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা দরকার। এ নিয়ে ঝুমার সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে। কেননা 'শান্তি ভবন'-এ একমাত্র ঝুমারই দীপার সম্পর্কে সহানুভূতি রয়েছে।

জয়ন্ত বলে, 'আমি যেখানে আছি সেখানে ফোন নেই। বাড়িতে আমাকে সব সময় পাবেনও না। অনেক বছর পর কলকাতায় এসেছি তো। এখানে আমাদের সব আত্মীয়-স্বজন থাকে। আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি করে হারিকেন ট্যুর দিতে হবে। এক কাজ করা যাক—' সে লক্ষ করেনি পাশে বসে বিশাখা তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সুরমা জিজ্ঞেস করেন, 'কী কাজ?'

'আমি রোজ বিকেলে একবার করে আপনাদের এখানে আসব। না আসতে পারলে ফোন করব।'

'তুমি এখানকার ফোন নম্বর জানো?'

'জানি। উনি দিয়েছেন।' বলে বিশাখাকে দেখিয়ে দেয় জয়ন্ত। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আজ চলি। আশা করি কাল আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।'

সুরমা এবং বিশাখাও উঠে পড়েছিল। সুরমা বলে, 'হোপ সো। গুড নাইট।

'গুড নাইট।'

বিশাখা বলে, 'আমাকেও এবার যেতে হবে। যাই সুরমাদি।' জয়ন্তকে বলে, 'আপনি তো এ শহরে একেবারে নতুন। চলুন, বড় রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি ধরিয়ে দিই।'

জয়ন্তর মনে হয়, শুধু ট্যাক্সি জোগাড় করে দেবার জন্যই বিশাখা তার সঙ্গে যাচ্ছে না, তার অন্য উদ্দেশ্যও রয়েছে। স্নায়ুগুলো টান টান রেখে সে বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিস থেকে বেরিয়ে চুপচাপ খানিকটা হাঁটার পর আচমকা বিশাখা বলে, 'আপনার কাছে তিনটে বিষয় জানার আছে।'

জয়ন্ত ভেতরে ভেতরে নিজেকে যতটা সম্ভব সতর্ক রেখে, বাইরে দারুণ আগ্রহ দেখিয়ে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'নাম্বার ওয়ান, আপনি কি লন্ডনে সোশাল ওয়র্ক-টোয়ার্ক করতেন?'

এর জন্য প্রস্তুত ছিল না জয়ন্ত। সে একটু অবাক হয়ে বলে, 'কেন বলুন তো!'

'আমি প্রশ্ন করতে বলিনি। উত্তর চেয়েছি।'

'অল রাইট। না, লন্ডনে সমাজ সেবার চিন্তা কখনো মাথায় আসেনি।'

'তা হলে কলকাতায় এসে এরকম মহৎ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে?'

হঠাৎ জয়ন্তর ওপর খানিকটা দুষ্টুমি যেন ভর করে। মাথাটা বিশাখার দিকে সামান্য হেলিয়ে, একটু হেসে সে বলে, 'ধরুন আপনার মহৎ অ্যাক্টিভিটি দেখে।'

'আমার!' কপাল কুঁচকে যায় বিশাখার।

জয়ন্ত শশব্যস্তে বলে ওঠে, 'সরি সরি, আপনাদের। আই মিন 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর।'

কপালটা মসৃণ হয় না বিশাখার, সেখানে ভাঁজ পড়েই থাকে। সে বলে, 'এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন। দীপার ব্যাপারে আপনি এত ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন কেন?'

'ইন্টারেস্ট না বলে সাহায্য করতে চাইছি কেন—তাই তো?'

আস্তে মাথা নাড়ে বিশাখা।

জয়ন্ত বলে, 'আপনারাও তো তাকে সাহায্য করতে চাইছেন।'

'সোশাল কমিটমেন্টের দিক থেকে ওটা আমাদের ডিউটি।' গলার স্বরে জোর দিয়ে বলে বিশাখা।

'এবার আমাকে এমন কিছু বলতে হবে যেটা আপনার ভাল লাগবে না।'

'না লাগলেও শোনাই যাক না।'

'সোশ্যাল ওয়ার্কটা ব্যক্তিগতভাবে কারুর একার বা কোনও অর্গানাইজেশনের মনোপলি নাকি? তারা ছাড়া আর কারুর বুঝি সমাজ সেবার অধিকার নেই?' বলে হাসতে থাকে জয়ন্ত।

বিশাখা হকচকিয়ে যায়, 'না, ঠিক তা নয়।'

উদারভাবে জয়ন্ত বলে, 'ঠিক আছে, আপনাকে আর এমব্যারাসিং অবস্থায় ফেলতে চাই না। আপনার তৃতীয় প্রশ্নটি এবার শোনা যাক।'

'ভেরি সিম্পল। সুরমাদি যখন আপনার ঠিকানা চাইলেন, এড়িয়ে গেলেন কেন?'

জয়ন্ত চমকে ওঠে। হতচকিত বোকাটে মুখে কিছুক্ষণ বিশাখার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হাসতে হাসতে বলে, 'ধরে ফেলেছেন?'

বিশাখা হাসেনি, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'আমাকে কি ডাফার বলে মনে হয়?'

'কক্ষনো না।' জোরে জোরে, মাথা নেড়ে জয়ন্ত বলে, 'ইন ফ্যাক্ট আপনার মতো ইনটেলিজেন্ট মহিলা আমার লাইফে খুব বেশি দেখিনি।'

জয়ন্ত কি তার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছে? তার ভাল মানুষের মতো সরল

আপনার মুখ দেখে তা অবশ্য মনে হয় না। বিশাখা জিজ্ঞেস করে, 'ঠিকানাটা দিলেন না কেন ?'

'ধরা যখন পড়েই গেছি তখন সত্যি কথাটাই বলা যাক। দীপার ক্ষতি যে করেছে সে আমার আত্মীয়—'

জয়ন্তর কথা শেষ হবার আগে বিশাখা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কিরকম আত্মীয় ?'

জয়ন্ত বলে, 'অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রানা আমার আপন জেঠতুতো দাদা। আর—'

'আর কী ?'

'আমি কলকাতায় এসে ওদের সঙ্গে এক বাড়িতে আছি। অবশ্য আমার অন্য কাকা-জেঠারাও তাঁদের ফ্যামিলি নিয়ে ওখানেই থাকেন।'

'কিন্তু—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় বিশাখা।

বিশাখার দিকে এক পলক তাকিয়ে তার মনোভাবটা বুঝে ফেলে জয়ন্ত। বলে, 'আমার পক্ষে দীপাকে সাহায্য করা সত্যিই সম্ভব হবে কিনা, নিশ্চয়ই জানতে চাইছেন ?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে বিশাখা।

জয়ন্ত জানায়, সাহায্যটা যতটা সম্ভব নিজেকে আড়ালে রেখে বিশাখাদের মারফত করতে চায় সে।

একটু চিন্তা করে বিশাখা বলে, 'সেটা কি শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে ? জানাজানি হয়ে যাবেই।'

'তখন সামনে চলে আসব।'

'তাতে আত্মীয়দের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা খারাপ হয়ে যাবে না ?'

'তার সেন্ট পারসেন্ট সম্ভাবনা।'

'তা হলে—'

জয়ন্ত বলে, 'যা হবার হবে। একটা মেয়ের লাইফ নষ্ট হয়ে যাবে আর রিলেশান নষ্ট হবে বলে আমি চুপ করে থাকব, তা হতে পারে না।'

খোলামেলা পারমিসিভ সোসাইটির দেশের এই যুবকটি সম্পর্কে খুব একটা উঁচু ধারণা ছিল না বিশাখার। এখন তার মনোভাব আগাগোড়া বদলে যায়। জয়ন্তর দিকে সসম্ভ্রমে তাকায় সে।

জয়ন্ত এবার বলে, 'অবশ্য ও বাড়িতে আমার আরেক জেঠার মেয়ে

ঝুমা আছে। সি ইজ অ্যান একসেপশান। দীপার ওপর তার যথেষ্ট সিমপ্যাথি রয়েছে। একমাত্র তার সাপোর্টটাই আমি পাব। বাট দ্যাটস নট এনাফ।' একটু থেমে ফের শুরু করে, 'ঝুমার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। দেখবেন ওকে খুব ভাল লাগবে।'

বিশাখা বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনার ওই বোনকে 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এ নিয়ে আসবেন।'

একটু চুপচাপ।

তারপর জয়ন্ত বলে, 'আমার কী মনে হয় জানেন?'

উৎসুক চোখে তাকিয়ে বিশাখা জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'দীপার জন্যেই হয়তো ও বাড়ি আমাকে ছাড়তে হবে।'

'তা হলে?'

'কোথায় থাকব, তাই ভাবছেন তো?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে বিশাখা।

জয়ন্ত বলে, 'কলকাতায় আমার অনেক রিলেটিভ আছে। তাদের কারুর কাছে চলে যেতে পারি। তা না হলে হোটেল তো রয়েছেই।'

কথায় কথায় ওরা বড় রাস্তায় চলে এসেছিল।

জয়ন্ত সম্পর্কে শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল বিশাখার। সে বলে, 'যেখানেই যান, আমাকে জানাবেন কিন্তু—'

'নিশ্চয়ই জানাব।'

একটা ট্যাক্সি ডেকে জয়ন্তকে তুলে দেয় বিশাখা।

জয়ন্ত বলে, 'আসুন, আপনাকে বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে যাই।'

বিশাখা বলে, 'আমার বাড়ি অন্য দিকে। আপনাকে অত ঘুরে যেতে হবে না।'

আট

বউবাজারে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। ঘড়িতে এখন ন'টা বেজে সতের।'

বাড়ির সবাই দারুণ উদ্বেগের মধ্যে ছিল। 'শান্তি ভবন'-এর গেট

পেরিয়ে জয়ন্ত ভেতরে ঢুকতেই রাজশেখর আর আনন্দশেখর 'জয় ফিরে এসেছে,' 'জয় ফিরে এসেছে' করে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে আসেন। ওঁরা খুব সম্ভব একতলার বিশাল বারান্দায় তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। চেঁচামেচি শুনে বাড়ির ভেতর থেকে হুড়মুড় করে আরও অনেকে বেরিয়ে আসে। সেই দলে ঝুমাও রয়েছে।

রাজশেখর উত্তেজিতভাবে বলেন, 'কী ছেলে তুমি! সেই ন'টা সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে গেলে, তারপর দুপুর গেল, এতটা রাত হল, ফিরে আর আসো না। অচেনা জায়গা, কী টেনশনে যে এতক্ষণ ছিলাম!'

আনন্দশেখর বলে, 'আর খানিকক্ষণ দেখে থানায় যাবার কথা ভাবছিলাম।'

রাজশেখর জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় ছিলে সারাদিন?'

জয়ন্ত বলে, 'যাদের গিফট দিতে গিয়েছিলাম, তাদের ওখানেই অনেকক্ষণ করে কেটে গেল। সহজে ওরা ছাড়তে চায় না।' বলতে বলতে তার চোখ ঝুমার দিকে চলে যায়। মেয়েটা এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'এতটা সময় ওদের ওখানেই ছিলে?'

ঝুমার দিকে চোখ রেখে জয়ন্ত বলে, 'প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ছিলাম। তারপর এখানে ওখানে একটু ঘুরে বাড়ি এলাম।' সে লক্ষ করেছে, এক মুহূর্তের জন্য ঝুমার চোখে পাতা পড়ছে না, ফলে ভেতরে ভেতরে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

রাজশেখর বলেন, 'সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি করে এসেছ। এখন ঘরে গিয়ে রেস্ট নিয়ে স্নানটা সেরে ফেল। তোমার জেঠিমা খাবার নিয়ে যাচ্ছে।' যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের উদ্দেশে বলেন, 'যাও সব, যাও। জয়কে রাস্তা দাও।'

জয়ন্তর সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকে সকলে এধারে ওধারে চলে যায়। কিন্তু ঝুমা তার সঙ্গ ছাড়ে না। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় বলে, 'মিথ্যে কথা বললে কেন?'

জয়ন্ত চমকে ওঠে, 'মানে?'

'গিফটের প্যাকেট নিয়ে আলিপুরে আর পার্ক সার্কাস গিয়েছিলে ঠিকই কিন্তু তাদের কারুর বাড়িতেই খাও নি।'

'তুমি জানলে কী করে ?'

'আমার চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা না, তোমার চোখমুখ দেখেই টের পেয়েছি। এবার বল কোথায় খেয়েছ ?'

'হোটেলে।'

ঝুমা জিজ্ঞেস করে, 'খাওয়ার পর কী করলে ?'

'মিছিলে ঘুরলাম।'

'মিছিল !'

'ক্যালকাটায় এসে যদি মিছিলে না হাঁটলাম তো মজাই থাকে না।' হালকা গলায় জয়ন্ত বলে, 'তখন মনে হচ্ছিল আমি ব্রিটিশ সিটিজেন নই, পারফেক্ট ক্যালক্যাসিয়ান।'

ঝুমা বলে, 'কিসের মিছিল ?'

'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর।'

'সেটা আবার কী ?'

বিশাখা আর তাদের ওই নারী-সংগঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে সব জানিয়ে দেয় জয়ন্ত। এমন কি তার সঙ্গে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের প্লেনে ওদের কিভাবে আলাপ হয়েছে সেটাও। তারপর বলে, 'ওদের অফিসেও গিয়েছিলাম।'

দু'জনে জয়ন্তর ঘরে চলে এসেছিল। জয়ন্ত একটা সোফায় বসে পড়ে। ঝুমা বসে না, একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে, 'সেখানেই বুঝি এতক্ষণ কাটিয়ে এলে ?'

'রাইট।'

'বিশাখা খুব চমৎকার মেয়ে, তাই না ছোটদা ?' বলে ঠোঁট টিপে রহস্যময় হাসে ঝুমা।

জয়ন্ত ঝুমার হাসিটা খেয়াল করেনি। সে বলে, 'ভেরি আপরাইট অ্যাণ্ড স্পিরিটেড ইয়াং লেডি। কলকাতায় এ ধরনের মেয়ে আছে, আমার ধারণা ছিল না।'

জয়ন্তর উচ্ছ্বাসটা লক্ষ করেছে ঝুমা। চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'এদেশে এসে এটা তোমার একটা ডিসকভারি বলতে পার।'

অন্যমনস্ক মতো জয়ন্ত বলে, 'তা বলা যায়।'

'দেখতে কেমন ?'

হোয়াইট হ্যাণ্ডসাম। অ্যান্ড ভেরি ভেরি স্মার্ট।' বলতে বলতে ই কিসের একটা সংকেত পেয়ে থেমে যায়। তারপর হাসতে হাসতে বলে, 'য়ু আর নটি গার্ল। ভেরি ভেরি নটি।'

ভালমানুষের মতো মুখ করে ঝুমা বলে, 'বা রে, আমি নটি হলাম কী জন্যে? একটা মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে। তার চেহারা কেমন, সেটা জানতে চাওয়া কি দোষের?'

'নট অ্যাট অল। তবে তুমি যা মিন করতে চাইছ, সেই লেভেল পর্যন্ত এখনও আমরা পৌঁছই নি।' জয়ন্ত বলে, 'বিশাখাকে বলেছি তোমাকে ওদের অফিসে নিয়ে যাব। তোমাদের দুজনেরই দুজনকে ভাল লাগবে।'

ঝুমা বলে, 'ঠিক আছে, নিয়ে যেও।'

একটু চুপচাপ।

তারপর জয়ন্ত বলে, 'আজ 'উইমেন্স ওয়াল্ড'-এর অফিসে গিয়ে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল।'

ঝুমা বলে, 'অর্গানাইজেশানটা যখন মহিলাদের তখন একজন কেন, একশ'টা মেয়ের সঙ্গে দেখা হতে পারে।'

'তা ঠিক। তবে এই মেয়েটিকে তুমিও চেনো, আমিও চিনি।'

ঝুমা উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কে সে?'

সামনের একটা সোফা দেখিয়ে জয়ন্ত বলে, 'বসো, বলছি।'

ঝুমা বসতে না বসতেই সেই কাজের মেয়েটা অর্থাৎ অন্নদা গরম জলের বালতি এনে বাথরুমে রেখে জয়ন্তকে স্নান করে নেবার জন্য তাড়া দিয়ে বেরিয়ে যায়।

জয়ন্ত এবার বলে, 'মেয়েটির নাম দীপা।'

ঝুমা চমকে ওঠে, 'দীপা! মানে—'

'হ্যাঁ, বড় জেঠা যাকে চুলের মুঠি ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন।' বলে সোজা ঝুমার চোখের দিকে তাকায় জয়ন্ত।

বিমূঢ়ের মতো ঝুমা বলে, 'দীপা 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিসে গিয়েছিল কেন?'

'ওর যে প্রবলেমের কথা তুমি আমাকে বলতে পারনি সেটা জানিয়ে সাহায্য চাইতে।' জয়ন্ত বলতে থাকে, 'রানাদা ওর কী ধরনের ক্ষতি করেছে তা আমি জানতে পেরেছি।'

ঝুমা মুখ নামিয়ে নেয়।

জয়ন্ত এবার বলে, 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড' কিন্তু রানাদা কি বড় জেঠাদের ছাড়বে না।'

ঝুমা জিজ্ঞেস করে, 'না ছাড়াই উচিত। কী করতে চাইছে ওরা?'

'সেটা এখনও ঠিক করে নি। তবে এমন একটা স্টেপ নেবে, রানাদা জীবনে ভুলবে না।'

'হ্যাঁ, ওর একটা ভালরকম শিক্ষা হওয়া দরকার। কিন্তু—'

'কী?'

'আমার কী মনে হয় জানো?'

উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকে জয়ন্ত।

ঝুমা বলে, 'তুমিও এর ভেতর আছ।'

'মানে?'

'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড়দাকে শিক্ষাটা তুমিও দিতে চাও।'

জয়ন্ত হেসে ফেলে, 'ঠিক ধরেছ। দীপা আর ছোট কাকিমার ব্যাপারে আমি কিছু করি, সেটা তো তুমিও চেয়েছিলে।' একটু থেমে ফের বলে, 'আমার ইচ্ছে তুমিও আমাদের সঙ্গে থাক।'

ঝুমা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'এর রি-অ্যাকশন কী হবে নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছ।'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নেড়ে জয়ন্ত বলে, 'বড় জেঠারা ভীষণ রেগে যাবেন। কিন্তু তাঁদের খুশি রাখতে গেলে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। সেটা আমি হতে দেব না।' সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে বলে, 'মেয়ে হয়ে অন্য একটা মেয়ের বিপদে সাহায্য করবে না ঝুমা?' জয়ন্তর গলায় চাপা ব্যাকুলতা ফুটে বেরোয়।

ঝুমা উত্তর দেয় না। তার মুখচোখ দেখে মনে হয়, ভেতরে ভেতরে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে।

জয়ন্ত কী ভেবে, আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসে বলে, 'না, তোমাকে এর ভেতর জড়ানো ঠিক হবে না। আমি দু'দিন পর চলে যাব। তোমাকে তো এ বাড়িতে থাকতে হবে।'

ঝুমা বলে, 'আমাকে দীপার ব্যাপারে একটা দিন ভাবতে দাও।

পরশ্ন তোমাকে আমার ডিসিশান জানাব। স্নান করে নাও। আম চলি।' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়।

মিনিট কুড়ি পর স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে জয়ন্ত দেখতে পায় চারুলতা তার জন্য খাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করছেন। সে খেতে বসে যায়।

আরো কিছুক্ষণ বাদে কাছে বসে, নানারকম গল্প করতে করতে তাকে খাইয়ে চারুলতা চলে যান। আজ যথেষ্ট হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি হয়েছে। তাছাড়া দীপার কারণে সমস্ত স্নায়ু টান টান হয়ে ছিল, এখন সেগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল জয়ন্তর। দরজা বন্ধ করে সে শুতে যাবে সেই সময় কালকের মতো রাজা হানা দিল।

রাজাকে দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় জয়ন্তর। একটা লোফার, রাফিয়ান। ও বেলার সেই বিশ্রী ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। রাজারই বন্ধু কতকগুলো বাজে ছোকরা ঝুমার সঙ্গে ইতরামো করছিল আর রাজা বলে, ওটা নাকি মজা!

রাজা জিজ্ঞেস করে, 'বিছানায় বডি ফেলতে যাচ্ছিলে নাকি?'

ওর কথার অন্তর্নিহিত মানেটা আন্দাজে বুঝে নিয়ে জয়ন্ত বলে, 'হ্যাঁ।'

'এখনো এগারটা বাজে নি, এর মধ্যেই ঘুমোতে চাইছ! তুমি মাইরি লণ্ডনের নাম ডোবালে!'

'লণ্ডনের লোকেরা এগারটার পর ঘুমোতে যায়, এ খবরটা তোমাকে কে দিলে!'

'তুমি চেপে যাচ্ছ। সেখানে হোল নাইট কত মজা, কত রকমের ফুর্তি! সে সব ফেলে কেউ বিছানায় ঝট করে 'ইন' করে?' বলে চোখ টিপে অশ্লীল একটা ভঙ্গি করে রাজা।

এই নোংরা টাইপের ছোকরাটাকে দেখলেই—হোক তার আপন জেঠতুতো ভাই—গা ঘিন ঘিন করে। ওর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি এবং কথা-বার্তা থেকে পচা নর্দমার দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে। জয়ন্ত বেশ রুক্ষ গলায় বলে, 'তোমার কিছু দরকার আছে?'

কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনটা লক্ষ করেছিল রাজা। সে একটু থতিয়ে

যায়। তারপর বলে, 'ওনলি ফাইভ মিনিটস টাইম নেব তোমার। এদিকে এস, তোমার সঙ্গে কনফারেন্সটা করে ফেলি।'

'বসার দরকার নেই। যা বলার দাঁড়িয়েই বলা যেতে পারে।' জয়ন্তর ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে যখন বার করা যাচ্ছে না তখন চটপট কথা শেষ করে রাজা চলে যাক এটাই সে চায়।

রাজা বলে, 'ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে একটা কনট্রাক্ট করতে চাই।'

জয়ন্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'কনট্রাক্ট! কিসের?'

'এখন তো ইলেকশান ফিলেকশন নেই যে ক্যাণ্ডিডেটদের জন্যে খাটলে টু পাইস পকেটে আসবে। ক্যাশটা খুব শর্ট যাচ্ছে। এদিকে রোজ রাত্তিরে—' দুই হাত দিয়ে মদের বোতলের আকার দেখিয়ে বলে, 'এটি না হলে হেলথ্ খারাপ হয়ে যায়। তাই যে ক'দিন আছ, ডেইলি দু'খানা করে টেন রুপিজের পাত্তি দিলে একজনের লাইফটা বাঁচে। দাদা হিসেবে এই ডিমাণ্ডটা জরুর আমি করতে পারি, না কী বল?'

নিঃশব্দে জামার পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বার করে রাজাকে দিয়ে জয়ন্ত বলে, 'এবার আমি ঘুমাবো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, বহুৎ সুক্রিয়া। আর তোমাকে ডিসটার্ব করছি না।' বলতে বলতে সট করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

জয়ন্ত ভাবে, কুড়ি টাকা করে পনের দিনে তিন শ টাকা ট্যাক্স দিলে রাজাকে হাতের মুঠোয় রাখা যাবে। প্রথমত. ঝুমাকে ওর বন্ধুরা এরপর আর বিরক্ত করবে না। কুড়ি টাকার কান্ট্রি লিকার তো শুধু ওর পাকস্থলীতেই ঢুকবে না, আরও কয়েকজনের পেটে যাবে। টাকার কারণেই বন্ধুদের সামাল দিয়ে রাখবে রাজা। তা ছাড়া দীপার ব্যাপারেও হয়তো ওর সাহায্য দরকার হবে। সেটা কিরকম, পরে ভেবে দেখতে হবে।

নিশ্চিন্ত হয়ে জয়ন্ত যে শুতে যাবে তার উপায় নেই। বাইরে থেকে রানার গলা ভেসে আসে, 'জয়ন্ত—'

জয়ন্তর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'ভেতরে এস।'

ঘরে ঢুকে একটু হাসে রানা। গলায় যতটা সম্ভব বিগলিত ভাব এনে বলে, 'আমার কথাটা মনে আছে তো ভাই।'

ভুলে যাবার কোনও কারণ নেই। তবু জয়ন্ত বলে, 'কোনটা ?'

'ওই যে লণ্ডনে আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবার কথা বলেছিলাম—'

'ও, হ্যাঁ।'

'যদি ভুলে যাও, মনে করিয়ে দিতে এলাম। যে ক'দিন আছ, রোজ একবার করে এসে চাকরির কথাটা বলে যাব। তা হলে বুঝতে পারবে একটা কাজ আমার কতটা দরকার।'

অর্থাৎ রাজার মতো রানাও রোজ হানা দেবে। এমনিতেই দীপার ব্যাপারটা জানার পর থেকে তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে জয়ন্ত। সে বলে, 'তোমার সম্বন্ধে বাবাকে বলব কিন্তু একটা কণ্ডিশান আছে।'

'কী কণ্ডিশান ?' শঙ্কিতভাবে জয়ন্তর দিকে তাকায় রানা।

জয়ন্ত সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে, 'দীপার সম্বন্ধে কী ঠিক করেছ ?'

রানা ভীষণ হকচকিয়ে যায়, 'তুমি—তুমি দীপাকে জানো ?'

জয়ন্ত বলে, 'না জানলে নামটা বললাম কী করে ? আমি আরও অনেক কিছুই জানি।'

রানা ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো এধারে ওধারে তাকাতে থাকে।

জয়ন্ত থামেনি, 'দীপার ব্যাপারে তোমাকে পজিটিভ কিছু করতে হবে। তাতে যদি আমি স্যাটিসফায়েড হই তবেই বাবাকে বলব।' তার গলার স্বর অত্যন্ত রূঢ় শোনায়, 'একদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে ভেবে আমাকে তোমার ডিসিশান জানিও।'

রানা উত্তর দেয় না। আতঙ্কগ্রস্তের মতো পিছু হাঁটতে হাঁটতে দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে বারান্দায় চলে যায়। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে চোখের পলকে উধাও হয়।

নয়

ভোর হতে বেশি দেরি নেই।

ঘুমটা পাতলা হয়ে আসছে জয়ন্তর। তার মধ্যেই আবছাভাবে সে

টের পায়, তার ঠোঁটে গলায় গালে এবং কপালে খুব নরম আর আলতো কিছু একটা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। অনেকটা পালকের ছোঁয়ার মতো অনুভূতি। খুব ভাল লাগছিল তার।

খানিকক্ষণ এভাবে চলার পর হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যায় জয়ন্তর। আর তখনই দেখতে পায় শুকনো সরু ডালের মতো দুটো হাত তার সারা মুখে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে আর একটা শীর্ণ মুখ তার ওপর ঝুঁকে গভীর আগ্রহে কী যেন দেখছে।

আগন্তুকের তোবড়া গাল, মাথায় হাজামজা কয়েক গাছা ফ্যাকাসে চুল, চোখ এক আঙুল গর্তে ঢোকানো, চামড়া কুঁচকে গেছে। এই মুখটা জয়ন্তর চেনা—চেনা।

ঘুম ভেঙে গেলেও রেশটা এখনও থেকে গেছে। তাই জয়ন্ত মনে করতে পারছে না তার ওপর ঝুঁকে পড়া মুখটা আগে কোথায় দেখেছে।

এদিকে তাকে চোখ মেলতে দেখে সেই ভাঙাচোরা মুখটায় শব্দহীন স্নিগ্ধ হাসি ফুটে বেরোয়। ঠোঁট ফাঁক হয়ে দু'পাটি দাঁতহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়ে।

কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ চিনে ফেলে জয়ন্ত—তার ঠাকুমা রাজলক্ষ্মী দেবী।

কিন্তু উনি তো থাকেন ছাদের ঘরে, নিচে আসতে হলে সিঁড়ি ভেঙে নামতে হয়। ওঁর সঙ্গে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তার মানে ছাদ থেকে একা নেমে এসে খুঁজে খুঁজে তার ঘরে ঢুকে পড়েছেন রাজলক্ষ্মী।

মৃদু, জড়ানো গলায় রাজলক্ষ্মী বলেন, 'আমার সূর্যর ছেলে—আমার দাদাভাই, আমার সোনামানিক—' বলতে বলতে গাঢ় আবেগে তাঁর ঘোলাটে চোখ জ্বল জ্বল করতে থাকে। খানিক আগে ধীরে ধীরে জয়ন্তর মুখে হাত বুলোচ্ছিলেন, এবার হাত দুটো তার বুকে গলায় কাঁধে মাথায় দ্রুত ছোটাছুটি করে।

বৃদ্ধার আবেগ জয়ন্তর মধ্যেও চারিয়ে গিয়েছিল। ধড়মড় করে উঠে বসে ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে সে তার পাশে বসায়। একটা কথা ভেবে জয়ন্ত ভীষণ অবাক হচ্ছিল। পরশু রাজলক্ষ্মী তাকে চিনতে

পারেন নি, ঝুমা যখন তার কথা বলছিল, তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন শুধু। কিন্তু আজ ঝুমা বা আর কেউ সঙ্গে এসে পরিচয় করিয়ে দেয় নি, তা হলে রাজলক্ষ্মী তাকে চিনলেন কী করে ?

জয়ন্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় বাইরে হই চই শোনা যায়। পায়ের আওয়াজে টের পাওয়া যায়, অনেকে চেঁচামেচি করতে করতে বারান্দা দিয়ে এদিকে আসছে।

প্রথমেই ঘরে ঢোকে ঝুমা, তার পেছন পেছন চারুলতা, রাজশেখর, আনন্দশেখর, সরস্বতী, শশিশেখর, মনোরমা এবং আরও দু-একজন সকলেরই চোখে মুখে উত্তেজনার সঙ্গে প্রবল উৎকণ্ঠা ফুটে বেরিয়েছে।

ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে ঝুমা, 'এই তো ঠাকুমা এখানে, ছোটদার কাছে—' রাজলক্ষ্মীর উদ্দেশে বলে, 'না বলে কয়ে ফট করে চলে এলে যে !'

রাজলক্ষ্মী নিদাঁত ফোকলা মুখে হেসে হেসে বলে, 'বারে, আসব না ! আমার সূর্যর ছেলে বিলেত থেকে এসেছে। তার কাছে না এসে পারি ?'

'আমাকে বললেই নিয়ে আসতাম।'

'বলব কী, তুই তো তখন ঘুমোচ্ছিলি। ডাকাডাকি করলে রেগে যেতিস না ?'

রাজশেখর বলেন, 'না মা, তোমার এভাবে হুট করে চলে আসা ঠিক হয়নি ?'

অন্য সকলে তাঁর কথায় সায় দেন। শশিশেখর বলেন, 'নিজের হাত-পায়ের ওপর কনট্রোল নেই। সিঁড়ি দিয়ে পা ফসকে গড়িয়ে পড়লে আজ একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেত।'

অন্যেরা বলে, 'কেলেঙ্কারি বলে কেলেঙ্কারি !'

ছেলেদের, পুত্রবধূ এবং নাতিনাতনিদের উদ্বেগটুকু খুব ভাল লাগছিল রাজলক্ষ্মীর। তিনি বলেন, 'আরে না না, পা ফসকাবে কেন ? আমি রেলিং ধরে ধরে খুব সাবধানে নেমে এসেছি।

মনোরমা বলেন, 'ঝুমা গিয়ে যখন খবর দিল মাকে পাওয়া যাচ্ছে না, আমার বুক এমন কাঁপতে লাগল যে কী বলব !'

সরস্বতী বলেন, 'আমার তো হার্ট ফেল হবার যোগাড়।'

সবার টুকরো টুকরো কথা থেকে জয়ন্ত এটুকু বুঝতে পারে, কাল রাতে ঝুমা রাজলক্ষ্মীর কাছে শুয়েছিল। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই সে দেখে, ঠাকুমা পাশে নেই। তক্ষুনি সে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়। ছাদের ঘরের গায়ে একটা ছোট বাথরুম আছে, রাজলক্ষ্মী সেখানে যান নি। তখন এক সঙ্গে দু-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে দোতলায় এবং একতলায় সবার ঘরের দরজায় ধাক্কা মেরে ঠাকুমার খবরটা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সকলে হই হই করতে করতে বেরিয়ে পড়ে। গোটা 'শান্তি ভবন' তোলপাড় করে শেষ পর্যন্ত জয়ন্তর ঘরে এসে তাঁকে পাওয়া যায়।

ভোরের ঘুমটা চটে যাওয়ায় কেউ বোধ হয় খুশি হয়নি। রাজশেখর মাকে বলেন, 'তুমি তোমার নাতির সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প কর, আমি আরেকটু শুই গে। শুধু শুধু ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে সকলকে উদ্ব্যস্ত করার মানে হয়?'

বাকি সবাই বলেন, 'আমারও যাই।'

রাজশেখররা যখন ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, রাজলক্ষ্মী হঠাৎ চারুলতাকে ডাকেন, 'ও বড় বৌমা—'

চারুলতা ঘুরে দাঁড়ান। রাজলক্ষ্মী বলেন, 'আমার যে ক'টা মোহর ছিল ভাগ করে সব নাতি-নাতনিদের দিয়েছি। সূর্যর ছেলেমেয়ের জন্যে দু'খানা দু'খানা চারখানা মোহর তোমার কাছে রেখেছিলাম। সেগুলো এনে দাও তো—'

মোহর ফেরত দেবার কথায় চারুলতা যে আদৌ সুখী হন নি সেটা তাঁর চোখমুখ দেখেই আন্দাজ করা যায়। গম্ভীর মুখে তিনি বলেন, 'পরে দেবো'খন।'

'না না, এতকাল পর ছেলেটা এসেছে, আর হয়তো কখনও আসবে না। খালি হাতে কি আমি চাঁদমুখ দেখব?'

মোহর চারখানা চারুলতার কাছে গচ্ছিত থাকায় অন্যেরা খুব সম্ভব সন্তুষ্ট হন নি। তাঁদের ধারণা ছিল, জয়ন্তরা কলকাতায় আর আসবে না, চার চারটে সাবেক কালের দামী মোহর চারুলতাদের পেটে

ঢুকে যাবে। সেগুলো টেনে বার করার এত বড় সুযোগ কেউ কি হাতছাড়া করতে চায়?

সরস্বতী আর মনোরমা গলা মিলিয়ে বলেন, 'মা তো ঠিক কথাই বলেছেন। যাও বড়দি, মোহরগুলো এনে দাও।'

চারুলতা আর কিছু না বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যান। মিনিট দুই বাদে চারটে মোহর এনে রাজলক্ষ্মীর হাতে দিয়ে নিঃশব্দে চলে যান। অন্যেরাও দাঁড়িয়ে থাকেন না, ধীরে ধীরে দরজার দিকে পা বাড়ান। রাজশেখর আর চারুলতা ছাড়া বাকি ক'জনের মুখে চাপা হাসি। চারুলতাদের মোহর গায়েব করার ব্যাপারটা যে বানচাল করা গেছে তাতে বেজায় খুশি সবাই।

রাজশেখররা চলে গেলেও ঝুমা কিন্তু থেকেই গেছে। সে রাজলক্ষ্মীকে বলে, 'ঠাকুমা, তুমি একটি ডেঞ্জারাস মহিলা। মোহরের কথাটা ঠিক মনে করে রেখেছ!'

রাজলক্ষ্মী হাসতে হাসতে বলেন, 'রাখব না? যার জিনিস তাকে বুঝিয়ে না দিলে চলে!'

জয়ন্ত এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। সে শুধু অবাক বিস্ময়ে রাজলক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে ছিল। পরশু তাঁকে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয়নি—কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ। ঝুমাও বলেছিল, ঠাকুমার স্মৃতি মাঝে মাঝেই নষ্ট হয়ে যায়, তখন কাউকে চিনতে পারেন না। কিন্তু আজ তাঁকে অত্যন্ত স্বাভাবিক লাগছে। পরশু রাতে শয্যাশায়ী অসুস্থ যে বৃদ্ধাকে সে দেখেছিল তাঁর সঙ্গে এখনকার এই হাসিখুশি, প্রাণবন্ত রাজলক্ষ্মীর কোনো মিল নেই।

ঝুমা জয়ন্তর মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। সে তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলে, 'কাল রাত্তিরে ঠাকুমার স্মৃতি ফিরে এসেছে।'

জয়ন্ত চকিত হয়ে ওঠে, 'উনি এ ঘরে এলেন কী করে?'

'তুমি যে কলকাতায় এসেছ, কাল রাতে ঠাকুমাকে বলেছিলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোমার কথা জিজ্ঞেস করল। কবে এসেছ, কোন ঘরে উঠেছ, কত দিন থাকবে—এই সব। তখন কি জানতাম বুড়ি ভোর হতে না হতেই তোমার ঘরে ছুটে আসবে!'

আগেরটা শুনতে না পেলেও শেষের কথাগুলো রাজলক্ষ্মী শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'রক্তের টান রে ছুঁড়ি, রক্তের টান। আমার রক্ত তো ওর গায়েও বইছে। না এসে কি পারি ?'

'সকাল হলে এলেই পারতে। না, একেবারে হুলস্থুল বাধিয়ে বসলে। নাও এবার মোহর দিয়ে নাতির চাঁদমুখ ভাল করে দেখ।'

'দেখবই তো, এই নাও দাদাভাই—' বলে কাঁপা কাঁপা হাতে জয়ন্তর একখানা হাত তুলে নিয়ে চারখানা মোহর দেন, 'একটা তোমার, আরেকটা আমার দিদিভাইয়ের। কী যেন নাম তার ?'

জয়ন্ত বুঝতে পারে, ঠাকুরমা তার বোন জয়ার কথা বলছে। সে বলে, 'জয়া।'

'জয়া, জয়া—' বারকয়েক নামটা আউড়ে বৃদ্ধা বলেন, 'দিদি-ভাইকে আমার আশীর্বাদ দিও।'

'নিশ্চয়ই।'

এবার রাজলক্ষ্মী জয়ন্তর মুখটা দু'হাতে তুলে ধরে বলে, 'সেই কত ছোটটি দেখেছিলাম। এখন একেবারে যুবা পুরুষ। আর কী সুন্দর হয়ে উঠেছ। দেখে আমারই মাথা ঘুরে যাচ্ছে। তা হ্যাঁ গো দাদা—'

খুব লজ্জা পেয়ে যাচ্ছিল জয়ন্ত কিন্তু রাজলক্ষ্মীকে ভীষণ ভালও লাগছিল। তার ঠাকুমা যে এত মজাদার এত স্নেহময়ী আগে কে ভাবতে পেরেছে। সে বলে, 'কী বলছেন ?'

রাজলক্ষ্মী রগড়ের গলায় বলেন, 'বিলেতে মেম ছুঁড়িরা তোমার পেছনে ছোঁক ছোঁক করে না ? তাদের নিয়ে লীলাখেলা কেমন কর, শোনাও দেখি।'

জয়ন্ত হাসতে থাকে, 'আপনার কী মনে হয় ?'

রাজলক্ষ্মী কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ঝুমা বলে ওঠে, 'তোমার নাতিটি বিলেতে কত কী কাণ্ড করে বসে আছে, তা কি আর তোমাকে বলবে !'

নকল রাগে চোখ কুঁচকে জয়ন্ত গলা চড়িয়ে বলে, 'অ্যাই ঝুমা !'

ঝুমা হাসে।

রাজলক্ষ্মী এবার বলেন, 'বিলেতেই যখন থাকতে হবে, একটা ফুট-ফুটে মেম বিয়ে ক'রো, আর জয়াদিদির সঙ্গে সাহেবের বিয়ে দিও।'

জয়ন্ত অবাক হয়ে যায়। বউবাজারের বনেদি বংশের এক প্রাচীন মহিলার মধ্যে এমন একটি সংস্কারমুক্ত আধুনিক মন রয়েছে, ভাবতে পারে নি সে। রাজলক্ষ্মীর প্রতি শ্রদ্ধায় তার বুকের ভেতরটা ভরে যায়।

রাজলক্ষ্মী থামেন নি, 'তোমাদের বিয়ে তো আর দেখে যেতে পারব না, এটাই যা দুঃখ।' শেষ দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে আসে।

ঝুমা বলে, 'পারবে পারবে। তোমার সবে নাইনটি নাইন, সেঞ্চুরি কাবার না করে তুমি ওয়ার্ল্ড থেকে নড়ছ না। তুমি বেঁচে থাকতে থাকতে আমরা তোমার শতবর্ষ পালন করব। তার মধ্যে ছোটদা আর জয়ার বিয়ে হয়ে যাবে। তখন প্লেনে চাপিয়ে তোমাকে বিলেত নিয়ে যাওয়া হবে, তাই না ছোটদা?' বলে জয়ন্তর দিকে তাকায় সে।

জয়ন্ত বলে, 'নিশ্চয়ই।'

একটু চুপচাপ। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সূর্যশেখর, জয়ন্তর মা সুপ্রীতি আর জয়ার খবর নিয়ে রাজলক্ষ্মী বলেন, 'বাবার বড় একটা অসুখ করেছিল, না?'

সূর্যশেখরের ক'বছর আগে একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। সে কথাটা রাজলক্ষ্মীকে জানানো হয় নি। বলা হয়েছিল বড় অসুখ করেছে। বৃদ্ধা সেটা ঠিক মনে করে রেখেছেন। জয়ন্ত বলে, 'হ্যাঁ।'

'তাকে বেশি খাটাখাটনি করতে বারণ করবে। বলবে এটা তার মায়ের হুকুম।'

'বলব।'

'বিলেতে চেতল মাছ পাওয়া যায়?'

চিতল মাছ চেনে জয়ন্ত। মা মাঝে মাঝে মার্কেট থেকে কিনে আনেন। সে জিজ্ঞেস করে, 'কেন বলুন তো?'

রাজলক্ষ্মী বলেন, 'সূর্য চেতল মাছ আর পায়েস খুব ভালবাসত।'

জয়ন্ত জানায়, তার মা ওই দুটি সুখাদ্যই মাঝে মাঝে নিজের হাতে রেঁধে বাবা এবং তাদের দুই ভাইবোনকে খাওয়ান।

রাজলক্ষ্মী খুশি হন। তারপর বিষণ্ণ সুরে বলেন, 'কতকাল যে

ছেলেটাকে নিজের হাতে কিছু করে খাওয়াই না। তা হ্যাঁ গো দাদাভাই, সূর্যর কি আমার কথা মনে আছে!'

জয়ন্ত হকচকিয়ে যায়, 'সে কি, মাকে ছেলেরা কী ভুলে যায়?'

'বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু সে তো একবারও আমাকে দেখতে আসে না। কী এত কাজ তার?'

'আমি বাবাকে আসার কথা বলব।'

'বলো, কিন্তু ও আসবে না। ইচ্ছে থাকলে কি এতদিন আসতে পারত না?'

মন খারাপ হয়ে যায় জয়ন্তর। স্ট্রোক হয়েছে ঠিকই, কাজের চাপও প্রচণ্ড, সকাল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই, তবু কি বাবা মাঝখানে দু-চার বার এসে তাঁর মাকে দেখে যেতে পারতেন না? ব্রিটিশ সিটিজেন ছেলের ওপর ভারতীয় মায়ের অভিমান হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

'শান্তি-ভবন'-এর নীচতা ইতরামি আর স্বার্থপরতার আবহাওয়ায় এক কোণে স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝখানে পড়ে আছেন নব্বই বছরের রাজলক্ষ্মী। ঝুমা ছাড়া (ছোট কাকিমা অনুরাধার কথা জানে না জয়ন্ত) আর কেউ তাঁর বিশেষ খোঁজখবর নেয় বলে মনে হয় না। বড় অযত্নে আর অবহেলায় একটা ময়লা বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিন কাটছে রাজলক্ষ্মীর। হঠাৎ জয়ন্তর মনে হয়, ঠাকুমাকে এখান থেকে লণ্ডনে নিয়ে গেলে কেমন হয়? ক'দিন আর বাঁচবেন! অন্তত জীবনের শেষ পর্বটা একটু আরামেই কাটুক। তাছাড়া ওঁর ভাল চিকিৎসা দরকার। মাঝে-মাঝে স্মৃতি যে নষ্ট হয়ে যায়, সেভাবে ট্রিটমেণ্ট করলে নিশ্চয়ই সেটা ঠিক হয়ে যাবে।

জয়ন্ত বলে, 'ঠাকুমা, আপনি লণ্ডনে যাবেন?'

রাজলক্ষ্মী বলেন, 'এই বয়সে বিলেত নিয়ে যেতে চাইছ!'

'হ্যাঁ।'

'যেতে পারলে তো ভালই হয়। বলতে পারব আমি বিলেত ফেরত।

জয়ন্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'তাহলে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে বাবাকে বলি। চেষ্টা করলে তিন মাসের ভেতর আপনাকে নিয়ে যেতে পারব।

লাউনটা খুব খারাপ জায়গা না। ওখানেও রামকৃষ্ণের মন্দির আছে, শিবমন্দির আছে, মঠ আছে। গেলে আপনার ভাল লাগবে।'

'মঠ মন্দির থাকলেই বা কী, আর না থাকলেই বা কী। মনে ভক্তি থাকাটাই আসল। সবচেয়ে বড় কথা তোমরা যেখানে আছ সেখানে ভাল তো লাগবেই। কিন্তু দাদাভাই—'

'কী?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন রাজলক্ষ্মী। তারপর বলেন, 'এই 'শান্তি ভবন' ছেড়ে আমার তো যাওয়া হবে না।'

জয়ন্ত বলে, 'কেন ঠাকুমা?'

রাজলক্ষ্মী বলেন, 'সূর্য ছাড়া আমার অন্য ছেলেগুলো তো মানুষ হয়নি। তোমার পিসিও যেন কেমন হয়ে গেছে, সে-ও এ বাড়ির ত্রি-সীমানা মাড়ায় না।'

রাজলক্ষ্মী কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে জয়ন্ত।

একটু চিন্তা করে বৃদ্ধা এবার বলেন, 'মাঝে মাঝে আমার যে কিছুই মনে থাকে না, সব ভুলে যাই, এটা তোমাকে কেউ বলেছে?'

আস্তে মাথা নাড়ে জয়ন্ত, 'হ্যাঁ।'

'আবার মাঝে মাঝে সমস্ত মনে পড়ে যায়। তখন কী বুঝতে পারি জানো দাদাভাই?'

'কী?

'এই বাড়িটা নিয়ে আমার এখানকার ছেলেরা, ছেলের বউরা কিছু একটা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। সূর্য কি কিছু জানে?'

'বলতে পারব না। তবে—'

'তবে কী?'

কিছুক্ষণ ভেবে জয়ন্ত বলে, 'বাবা আমাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে পাঠিয়েছেন। এখানকার অবস্থা বুঝে আমি যা করব বাবা তাই মেনে নেবেন।'

রাজলক্ষ্মী বলেন, 'তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ। মানাই তো উচিত। কিন্তু আমার একটা কথা আছে। সমস্ত দিক বিবেচনার পর যা করার করবে।' একটু থেমে বলেন, 'ছোট বৌমাকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গেও একবার দেখা করো।'

নব্বই বছরের এই বৃদ্ধার মাথাটা খুব পরিষ্কার। ছোট কাকিমা অর্থাৎ অনুরাধার ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে সেটা তিনি বুঝিয়ে দিলেন। এই বাড়ির ব্যাপারে ছোট কাকিমার মতামতকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। রাজলক্ষ্মী তাই চান।

জয়ন্ত ঝুমার দিকে তাকায়। সে-ও তাকে লক্ষ করছিল কিন্তু কিছু বলে না।

রোদ উঠে গেছে। সেপ্টেম্বরের ঝলমলে আলোয় ভরে গেছে চারিদিক। তবু অনিবার্য নিয়মে একটানা মাইক বাজা শুরু হয়েছে অনেক আগেই, সেই সঙ্গে চারপাশে কয়েক শ' জ্বলন্ত উনুন থেকে গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

রাজলক্ষ্মী বলেন, 'আমি এবার যাই দাদাভাই। পরে আবার দেখা হবে। তুমি এখন মুখটুখ ধোও।' ঝুমাকে বলেন, 'চল রে দিদি, আমাকে ছাদে নিয়ে চল।'

রাজলক্ষ্মী বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ বাদে জয়ন্ত যখন বাথরুমে ঢুকতে যাবে, সেই সময় সরস্বতী আর আনন্দশেখর চায়ের সরঞ্জাম এবং প্রচুর খাবার দাবার নিয়ে ঘরে ঢোকেন। বোঝা যায়, তার আদর-যত্নের দায়িত্বটা আজ ওঁদের।

সরস্বতী বলেন, 'এ কী, এত বেলা হয়েছে, এখনো মুখ ধোওনি। যাও—যাও, আর দেরি করো না।'

'ঠাকুরমার সঙ্গে গল্প করছিলাম কিনা—' বলতে বলতে বাথরুমে চলে যায় জয়ন্ত।

মিনিট দশেক বাদে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে আনন্দশেখর এবং সরস্বতীর সঙ্গে এলোমেলো গল্প করছিল জয়ন্ত। এই সময় রাজশেখর এ ঘরে আসেন। একটু দূরে খাটের এক কোণে বেশ জুত করে বসে বলেন, 'সেই কথাটা মনে আছে তো বাবা?'

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কোনটা?'

'তোমার সঙ্গে বাড়ির ব্যাপারে বসার কথা আছে না?'

একটু চুপ করে থাকে জয়ন্ত। ছোট কাকিমার কথাটা একবার ভেবে নেয়। তারপর বলে, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু বড়

জেঠামশায়, আজ আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ডিসকাশানটা আরেক দিন করলে অসুবিধে হবে?'

একজনটা কে তা নিয়ে প্রশ্ন করেন না রাজশেখর। বলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, অন্যদিন করলেও হবে। কবে বসতে চাও? মানে বুঝতেই পারছ, তুমি তো বেশিদিন থাকতে পারবে না। তার আগেই—'

রাজশেখরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে জয়ন্ত বলে, 'পরশু বসব।'

'তা হলে ও ডেটটাই ফাইনাল রইল।'

'নিশ্চয়ই।'

ব্রেকফাস্ট খাইয়ে সরস্বতীরা চলে যান। তারপর চটপট পোশাক বদলে অনুরাধা আর বিল্লুর জন্য যে গিফট প্যাকেট দুটো ছিল একটা ব্যাগে পুরে সোজা ছাদে ঠাকুমার ঘরে চলে যায় জয়ন্ত।

ঝুমা ঠাকুমাকে দুধ পাউরুটি খাওয়াচ্ছিল। সে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মেজ জেঠা, মেজ জেঠি আর বড় জেঠা তোমাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল?'

তার মানে রাজশেখরদের তার ঘরে ঢুকতে দেখেছে ঝুমা। জয়ন্ত হাসে, জানায়, সহজে কি ওঁরা ছাড়তে চান, একটা অজুহাত খাড়া করে মুক্তি পাওয়া গেছে। বলে, 'আমি বড় রাস্তায় গিয়ে ওয়েট করছি। তুমি ঠাকুমাকে খাইয়ে চটপট শাড়ি টাড়ি বদলে চলে এসো।'

'কেন?'

'ছোট কাকিমার বাড়ি যাব।'

ঝুমা বুঝতে পারে, কাল তারা একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। আজও বেরুলে অনেকের কপাল কুঁচকে যাবে, সকলে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে। নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য (যদিও সেটা আছেই) খুঁজে বেড়াবে। তাই রাজশেখরদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য আগে পরে বেরুনোর ব্যবস্থা।

ঝুমা বলে, 'কিন্তু যাব কী করে? আজও আমার তিনটে ইমপর্টান্ট অনার্স ক্লাস আছে।'

'ছোট কাকিমার কাছে যাওয়াটা তার চেয়ে কম ইমপর্টান্ট নয়।

পরে অন্য বন্ধুদের কাছ থেকে ক্লাস লেকচারের নোটগুলো পেয়ে যাবে। কিন্তু আমি তো কলকাতায় বেশিদিন থাকতে পারব না। ছোট কাকিমার সঙ্গে কথা বলতে না পারলে আমার পক্ষে কোনও ডিশিসান নেওয়া সম্ভব নয়। একবার চলে গেলে আবার কবে আসতে পারব ঠিক নেই। এখানকার সমস্যা কিন্তু থেকেই যাবে।'

'কাল চল।'

'কাল পিসিমার বাড়ি যাব ভেবেছি। ওঁর সঙ্গেও দেখা হওয়া দরকার।'

'তা হলে পরশু—'

জয়ন্ত জানায়, পরশু রাজশেখরদের সঙ্গে বসতে হবে। আজই বসার কথা ছিল কিন্তু ছোট কাকিমাদের কথা মাথায় রেখে আজ আর কাল দুটো দিন সময় চেয়ে নিয়েছে সে। পরশু না বসলে সেটা খুব খারাপ দেখাবে। বড় জেঠামশাইরা ভাববেন তার কথার ঠিক নেই।

রাজলক্ষ্মী এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। এবার বলেন, 'জয়ন্তদাদা ঠিকই বলেছে। তুই আজই ওকে নিয়ে ছোট বৌমার ওখানে চলে যা।'

একটু চুপ করে থাকে ঝুমা, তারপর বলে, 'আচ্ছা।'

কথামতো বড় রাস্তায় গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে জয়ন্ত। মিনিট কুড়ি বাদে ঝুমা আসে।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'ছোট কাকিমা থাকেন কোথায়?'

ঝুমা বলে, 'টালিগঞ্জে ওঁর বাপের বাড়িতে। তবে ওঁকে এখন ওখানে পাওয়া যাবে না।'

'কেন?'

'তোমাকে হয়তো বলিনি, ছোট কাকিমা একটা স্টেনো টাইপিস্টের চাকরি নিয়েছেন। ক্যামাক স্ট্রিটে ওঁদের অফিস। ওঁকে এখন ধরতে হলে অফিসেই যেতে হবে।'

'কিন্তু তা হলে বিল্লুর সঙ্গে তো দেখা হবে না।'

'আগে তো ছোট কাকিমার কাছে যাই।'

'সেই ভাল। ওঁর সঙ্গে কথা বলে টালিগঞ্জ যাওয়া যাবে!'

'সেই বিকেলের আগে বিল্লুকে কিন্তু পাওয়া যাবে না!'

'কেন?'

'বিল্টু স্কুলে গেছে না ?   ওর ছুটি হবে সেই বিকেলে।'

'হ্যাঁ।   তাই তো—' একটু হতাশ দেখায় জয়ন্তকে।   সে বলে, 'তা হলে ওর প্যাকেটটা ছোট কাকিমাকে দেব।   পরে লণ্ডনে ফেরার আগে একদিন গিয়ে ওকে দেখে আসব।'

পৌনে দশটার মতো বাজে।   রাস্তায় অফিস টাইমের ভিড় এবং ব্যস্ততা চোখে পড়ছে কিন্তু 'পিক আওয়ার্স' আরও কিছুক্ষণ বাদে শুরু হবে।   এখনই বাস এবং ট্রামে গাদাগাদি করে লোক চলেছে ডালহৌসি কি এসপ্ল্যানেডের দিকে, এরপর জানালার রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে যাবে।

এখনও চেষ্টা করলে ট্যাক্সি পাওয়া যায়।   মিনিট পাঁচেক ছোটা-ছুটি করে একটা পেয়েও গেল জয়ন্তরা।   গাড়িটা বউবাজার স্ট্রিট ধরে খানিকটা এগিয়ে একটা মোড় ঘুরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে চলতে থাকে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটার পর দ্বিধান্বিতভাবে ঝুমা ডাকে, 'ছোটদা—'

জানালার বাইরে তাকিয়ে কিছু ভাবছিল জয়ন্ত।   মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবে ?'

আস্তে মাথা নাড়ে ঝুমা, 'হ্যাঁ।'

২৷৹ জয়ন্ত তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

করে ঝুমা মনে মনে তার বক্তব্য বোধহয় গুছিয়ে নেয়।   তারপর বলে, তুমি কাকিমা সম্পর্কে তোমাকে এমন একটা খবর দেব, শুনলে তুমি তা শকড্ হবে।'

য়ন্ত চমকে ওঠে, 'কী খবর ?'

ঝত্তর না দিয়ে ঝুমা বলে যায়, 'এমন কি, ছোট কাকিমাকে শ্রদ্ধা আজও পারবে না।'

উঠবেয়ন্ত একটু হেসে বলে, 'আগে শোনাই যাক।   তারপর আমার কী তাঅ্যাকশন হয় সেটা তো পরের ব্যাপার।'

তবুও যেন মনস্থির করে উঠতে পারে না ঝুমা।

জয়ন্ত তাড়া লাগায়, 'আরে বলই না।   ছোট কাকিমা কি কোনও স্ক্যাণ্ডালে জড়িয়ে পড়েছেন ?'

'না, ঠিক তা নয়।'

'উইদআউট হেজিটেশন বলে যাও। আমি যে দেশের সিটিজেন সেখানে কেউ কারুর পার্সোনাল ব্যাপারে মাথা ঘামায় না, অবশ্য সেটা যদি অন্যের পক্ষে হার্মফুল না হয়।'

'ঠিক আছে, বলছি।'

ঝুমা এবার যা বলে তা এইরকম। ছোট কাকার মৃত্যুর পরও বছর আটেক 'শান্তি ভবন'-এ ছিলেন অনুরাধা। কিন্তু বাড়ির অবস্থা তো ভাল না। সংসার ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ছোট কাকা খুব অল্প বয়সেই তো মারা গেছেন। মাঝারি ধরনের একটা চাকরি করতেন। তিনি মারা যাবার পর অফিস থেকে যা পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে সারা জীবন চলতে পারে না, কোনও রকমে টায়টোয় দুটো বছর কেটেছে। তারপর ভীষণ বিপদে পড়ে যান অনুরাধা। একটা তো নয়, দু দুটো পেট। তার ওপর বিল্লুর পড়াশোনা, তার ভবিষ্যৎ।

ভাগাভাগি করে এক মাস বড় জেঠার, এক মাস মেজ জেঠার সংসারে এইভাবে ছোট কাকিমাদের চলছিল। কিন্তু তাঁদেরও তো আজকের দিনটা কাটলে কালকের চিন্তা করতে হয়। ফলে রোজ রোজ অশান্তি, খিটিমিটি, তিক্ততা। ছোট কাকার অকালমৃত্যুতে যে আবেগটা ছিল ততদিনে তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। সবাই ভাবছে, দুটো বাড়তি মানুষের ভার সারা জীবনের জন্য বুঝি তাদের ঘাড়ে চেপে গেল।

কিন্তু ছোট কাকিমা খুবই তেজি মেয়ে, আত্মসম্মানবোধ তাঁর খুবই তীব্র। তিনি বুঝতে পারছিলেন, এভাবে সারা জীবন বেঁচে থাকা অসম্ভব। পেটে না হয় দু'মুঠো খাওয়া গেল কিন্তু ছেলের ভবিষ্যৎ? অনুরাধা টিউশনি শুরু করলেন, সেই সঙ্গে টাইপ রাইটিং আর স্টেনোগ্রাফির ক্লাসও করতে লাগলেন। মাস ছয়েক বাদে স্পিড উঠলে নানা অফিসে চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশান পাঠানো শুরু করেন। দু'মাসের মধ্যে এখন যে কাজটা করছেন, সেটা জুটে যায়।

'শান্তি ভবন'-এর মেয়ে এবং বউরা কেউ কখনও চাকরি বাকরি

করেনি। এই নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয় কিন্তু ঠাকুমা ছোট কাকিমাকে পুরোপুরি সাপোর্ট দিয়ে যায়। রাজা যত খারাপই হোক, এই একটা ব্যাপারে চিৎকার চেঁচামেচি করে সবাইকে চুপ করিয়ে দেয়।

চাকরি পাওয়ার পর এ বাড়িতেই বিল্লুকে নিয়ে নিজের আলাদা এস্টাব্লিশমেন্ট করে নেন অনুরাধা, সেই সঙ্গে নেন ঠাকুমার দায়িত্ব।

রাজলক্ষ্মী তো ভাগের মা, প্রচণ্ড অবহেলার মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। তার ওপর মাঝে মাঝেই ছিল স্মৃতি হারানোর ব্যাপারটা। ছোট কাকিমা ঠাকুমার দায় নেওয়ায় সবাই বেঁচে গিয়েছিল। একমাত্র রাজা ছাড়া কেউ অবশ্য মুখ ফুটে তা বলেনি।

আরও দু'বছর কেটে যায়, তারপর নতুন আরেকটা সমস্যা দেখা দেয়। আ রিয়াল প্রবলেম।

অনুরাধার এক কলিগের সঙ্গে তাঁর একটা মানসিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। ছোট কাকার প্রতি ছোট কাকিমার শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা অটুট ছিল কিন্তু একজন মৃত মানুষের স্মৃতি নিয়ে একটি তরুণীর পক্ষে বাকি জীবন কাটানো খুবই কঠিন কাজ।

আগেকার দিনে অল্পবয়সী বিধবারা অন্য পুরুষকে ভালবেসে ফেললেও নানারকম সামাজিক চাপে দাঁতে দাঁত চেপে থাকত, অবদমিত কষ্টে তাদের বুক ফেটে যেত, তবুও মনের কথা মুখ দিয়ে ক...না।

তুমি কাহু অনুরাধা শিক্ষিত, সাহসী এবং অত্যন্ত আত্মমর্যাদা ...গা শব্দুষ। তাঁর চরিত্রে কপটতা নেই, লুকিয়ে চুরিয়ে তিনি কিছু ...য়ন্ত করে ফেললে স্বীকার করার মতো মনের জোর তাঁর আছে।

ঝড়...দন সোজাসুজি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে অনুরাধা জানিয়ে- আজগো...বার বিয়ে করবেন। গোটা 'শান্তি ভবন' কয়েক মুহূর্ত উঠবেয়ন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারপর বিস্ফোরণ ঘটে যায়। পারলে তাঁর্য্য ভাসুর এবং জায়েরা তাঁকে ছিঁড়ে ফেলতেন। মৃত স্বামীর ...ড়তে দাঁড়িয়ে এ জাতীয় কথা কেউ গলা দিয়ে বার করতে পারে, এ ভাবা যায় না।

রাগে উত্তেজনায় 'শান্তি ভবন' ফেটে পড়েছিল সেদিন। সবাই

চিৎকার করছিল, গলার শিরা ছিঁড়ে অকথ্য গালাগাল দিচ্ছিল অনুরাধাকে। মনে হচ্ছিল তাদের মাথায় খুন চড়ে গেছে।

একজনই শুধু চুপচাপ একধারে দাঁড়িয়ে সব দেখে গেছেন, তিনি রাজলক্ষ্মী। পরে ঠাকুমা ঝুমাকে বলেছেন, ছোট বৌমার সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে আছে, করুক না আবার বিয়ে। পুরুষ মানুষের এই বয়েসে বৌ মরলে সে ফের বিয়ে করে না? তবে এ বাড়িতে থেকে করলে সেটা খুব খারাপ দেখাবে।

শুনতে শুনতে একেবারে হাঁ হয়ে গেছে জয়ন্ত। তাদের বংশের সব চেয়ে বয়স্ক এই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে তার মন ভরে যায়। আপ্লুত গলায় বলে, 'ঠাকুমা তো দারুণ মডার্ন! এরকম মহিলা এ দেশে আছে, ভাবা যায় না।'

ঝুমা তার কথার উত্তর না দিয়ে বাকিটা শেষ করে ফেলে।

রাজলক্ষ্মী ছাড়া বাড়ির সবাই চাইছিল, ছোট কাকিমা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ছোট কাকার মৃত্যুর পর থেকে চাপা ষড়যন্ত্র চলছিল কীভাবে অনুরাধাকে তাঁর স্বামীর পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যায়। ছোট কাকা বেঁচে থাকলে তাঁর অংশ তাঁরই থাকত, এ নিয়ে ঘোঁট পাকানোর প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু পরের ঘরের একটি মেয়ে মাত্র সাড়ে তিন বছর 'শান্তি ভবন'-এর একটি ছেলের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে তার পৈতৃক সম্পত্তির ভাগীদার হয়ে বসবে, এটা কেউ মেনে নিতে পারছিল না।

কিন্তু ছোট কাকিমাকে তাড়ানো বা তাঁর ন্যায্য পাওনা না দেওয়া, এর কোনওটাই সম্ভব ছিল না। কেন না আইনকানুন অনুরাধার পক্ষে, তাছাড়া ছোট কাকার একটা ছেলেও রয়েছে।

কিন্তু সহকর্মীকে বিয়ে করার কথাটা যখন অনুরাধা জানালেন, সবাই হাতে একটা দুর্দান্ত অস্ত্র পেয়ে গেল। দিনরাত তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে শেষ পর্যন্ত বড় জেঠারা তাঁকে তাড়িয়ে ছাড়লেন। বিল্লুকে নিয়ে তিনি একদিন টালিগঞ্জে বাপের বাড়ি চলে গেলেন।

অনুরাধাকে উৎখাত করার পেছনে বাড়ির লোকেদের মনোভাবটা হয়তো এইরকম। মৃত ভাইয়ের স্ত্রী আরেকটি স্বামী সংগ্রহ করতে চাইছে, এটা চরম অপমানজনক ব্যাপার। তার ওপর নতুন স্বামীকে

নিয়ে যদি তিনি সোজা 'শান্তি ভবন'-এই এসে ওঠেন লোকে তাদের এক গালে চুন আরেক গালে কালি মাখিয়ে দেবে। তাছাড়া আরও একটা দিক আছে। যদিবিয়েটা অনুরাধাকরেই ফেলেন আইনত প্রাক্তন স্বামীর পৈতৃক প্রোপার্টি পাবেন কিনা কে জানে। তবে নৈতিক এবং মানসিক দিক থেকে দাবি করার জোরটা অনেক কমে যাবে। নতুন সংসারে গিয়ে বিল্টুর জন্য তার বাবার সম্পত্তি আদায় করার মতো কতটা আগ্রহ আর উদ্যম অবশিষ্ট থাকবে সেটাও ভাবার বিষয়।

কথা শেষ করে ঝুমা বলে, 'এই হল ছোট কাকিমার ব্যাকগ্রাউণ্ড হিস্ট্রি।'

উচ্ছ্বসিত সুরে জয়ন্ত বলে, 'ফ্যানটাসটিক। এ দেশের উইডোদের মতো উপোস করে আর নিরামিশ খেয়ে জীবনটা যে ছোট কাকিমা নষ্ট করে দিতে চাননি, এটা একটা দারুণ ব্যাপার। লাইফ ইজ ফর এন-জয়মেন্ট—'

ঝুমা চুপ করে থাকে।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'বিয়েটা কি হয়ে গেছে ?'

ঝুমা বলে, 'না বোধহয়।'

'বোধহয় বলছ কেন ?'

'বিয়েটা করলে আমাকে নিশ্চয়ই জানাতেন ছোট কাকিমা।'

এই শহরের কোনও গতি নেই। দু'শ গজ যেতে না যেতেই জয়ন্ত-দের ট্যাক্সি জ্যামের ফাঁদে আটকে যাচ্ছে। এভাবে ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছতে মিনিট পঞ্চাশ লেগে যায়।

ছোট কাকিমাদের অফিস একটা বিরাট মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংয়ে গোটা সাতটা তলা জুড়ে। এটা ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিশাল প্রাইভেট ফার্ম। লিফটে করে ওপরে উঠে রিসেপশানে স্লিপ লিখে তিন মিনিটও অপেক্ষা করতে হয় না, ছোট কাকিমা অর্থাৎ অনুরাধা চলে আসেন।

অনুরাধার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। তবে অতটা মনে হয় না। শ্যামবর্ণ সুশ্রী চেহারা। হাইটটাও বেশ ভাল, পাঁচ ফিট ছয় টয় হবেন। পরনে হালকা ক্রিম রংয়ের শাড়ি, গলায় সরু হার, আঙুলে লাল পাথর বসানো আংটি আর বাঁ হাতে স্টিল ব্যাণ্ডে ছোট্ট ওভাল শেপের ঘড়ি ছাড়া সাজসজ্জায় কোনও রকম চমক নেই, কিন্তু পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ

রয়েছে। তার এই ছোট কাকিমাটি যে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা দেখামাত্র টের পাওয়া যায়।

ঝুমা আর জয়ন্ত তাকে দেখে উঠে পড়েছিল।

অনুরাধা খুব সম্ভব ঝুমাকে অফিসে আশা করেন নি। বলেন, 'এ কি—তুমি এখানে! টালিগঞ্জে গেলেই তো পারতে। এক সপ্তাহ আগে সেই যে বিল্টুকে দেখতে গিয়েছিলে তারপর থেকে তোমার কোনও খবর নেই। ছেলেটা সমানে দিদি দিদি করছে।' কথা বলতে বলতে বার বার তাঁর চোখ জয়ন্তর দিকে চলে যাচ্ছিল।

ঝুমার সঙ্গে অনুরাধার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে, সেটা বুঝতে পারছিল জয়ন্ত। ঝুমা সত্যিই অন্যরকম।

ঝুমা বলে, 'কলেজের সিলেবাস কমপ্লিট হয় নি, তাই এখন রোজ পাঁচটা ছ'টা করে ক্লাস করতে হচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি না ছোট কাকিমা। বিল্টু কেমন আছে?'

'ভাল। মান্থলি টেস্টে ফার্স্ট হয়েছে। মেজাজ খুব ভাল। তবে হি-ম্যানের একটা সেট কিনে না দিলে পরের টেস্টে কী করবে বলা মুশকিল।' কথা বলছিলেন ঠিকই কিন্তু জয়ন্তর দিক থেকে চোখ সরান নি অনুরাধা।

ঝুমা হেসে হেসে বলে, 'তা হলে তো দিতেই হবে।'

অনুরাধা বলেন, 'এবার বলো হঠাৎ অফিসে কেন এলে? নিশ্চয়ই জরুরি কিছু ব্যাপার আছে।'

'হ্যাঁ।' বলে জয়ন্তর দিকে আঙুল বাড়ায় ঝুমা, 'একে চিনতে পারছ?'

'খুব চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ঠিক—'

'ভাল করে দেখ।'

আরও কিছুক্ষণ জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে থাকেন অনুরাধা। বোঝা যায় স্মৃতি তোলপাড় করে তাকে চেনার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ তাঁর চোখেমুখে বিস্ময়ের ঝলক এসে লাগে যেন। গলার স্বর উঁচুতে তুলে তিনি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ও জয় না?'

ঝুমা বলে, চিনেছ তা হলে!'

'চিনব না! প্রত্যেক বছর ওদের নতুন নতুন ফোটো দেখিয়ে

যাও। সব আমার মনে থাকে। তবে ওকে আজ এখানে দেখব ভাবতে পারিনি। তাই একটু অসুবিধে হচ্ছিল। বলে অনুরাধা জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করেন, 'কবে এসেছ জয় ?'

জয়ন্ত বুঝতে পারে, ফি বছর জানুয়ারিতে তারা তাদের যে সব ফোটো পাঠায়, লুকিয়ে চুরিয়ে ঝুমা অনুরাধাকে দেখিয়ে যায়। সেগুলো স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন তিনি। সে বলে, 'এই দিন তিনেক হল।'

জয়ন্ত প্রণাম করার জন্য ঝুঁকে অনুরাধার পায়ের দিকে হাত বাড়াতে যাবে, তিনি তাকে ধরে ফেলেন, সস্নেহে বলেন, 'থাক বাবা, থাক। সেজদা, জয়া আর সেজদি কেমন আছেন ?'

'ভাল।'

'ওঁরা এলেন না যে ?'

'বাবার কাজের ভীষণ প্রেসার, মাকেও ছুটি দিচ্ছে না। তাই এবার আসা সম্ভব হল না।'

ভারী গলায় অনুরাধা বলেন, 'আমার বিয়ের সময় সেজদা আর সেজদিকে দেখেছিলাম। তোমাকে এই প্রথম দেখলাম, জয়াকে তো দেখিইনি। সেজদাদের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা কে জানে।'

জয়ন্তর মনে পড়ে, ছোট কাকার বিয়ের সময় মা আর বাবাই শুধু কলকাতায় এসেছিলেন। তার আগে জয়ার তখন পরীক্ষা চলছিল, তাই আসা হয়নি। সে বলে, 'বাবা আমায় আসার সময় বলছিলেন, নেক্সট ইয়ারে একবার কলকাতায় আসবেন।'

'এলে হয়তো দেখা হবে।'

যে উদ্দেশ্যে ছোট কাকিমার কাছে আসা সেটা এই অফিসে বসে বলা সম্ভব নয়। তার জন্য খানিকটা সময় দরকার, মন প্রস্তুত করে নেবার জন্য পরিবেশটা খুব জরুরি। জয়ন্ত কী বলবে যখন ভাবছে, অনুরাধাই হঠাৎ বলে ওঠেন, 'তোমরা এখানে একটু বসো, আমি ছুটি নিয়ে আসছি।'

ঝুমা জিজ্ঞেস করে, 'কিসের ছুটি ?'

অনুরাধা বলেন, 'বা রে, জয় কত দূর থেকে এসেছে, ওকে বাড়ি নিয়ে যাব না! বিল্টু ওকে দেখলে কী খুশি যে হবে! তাছাড়া এখানে বসে কথা হয় নাকি ?' বলে ভেতরে চলে যান।

রিসেপশান কাউন্টারের একটা চেয়ারে ঝুমার পাশাপাশি বসতে বসতে জয়ন্ত ভাবে, ঠিক এইটাই চেয়েছিল সে। ছোট কাকিমা হয়তো তা টের পেয়েছেন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটার পর জয়ন্তর মাথায় একটু দুষ্টুমি ভর করে। চোখের কোণ দিয়ে ঝুমাকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করে, 'মাস্কেটিয়ারটি কোথায় ?'

ঝুমা অন্যমনস্কর মতো বসে ছিল। মুখ ফিরিয়ে বলে, 'সে আবার কে ?'

'তুমি তখন বললে না, ছোট কাকিমা তাঁর একজন কলিগকে বিয়ে করবেন। আমি তাঁর কথা বলছি।'

'ছি ! ছোট কাকিমা আমাদের গুরুজন, মায়ের মতো। তিনি যাঁকে বিয়ে করবেন তাঁর সম্বন্ধে এভাবে বলতে নেই।'

ঝুমার বলার ভঙ্গিতে ধিক্কার মেশানো ছিল। জয়ন্ত বলে, 'গুরু-জনদের নিয়ে একটু মজাও করা যাবে না ? জিনিসটা স্পোর্টিংলি নাও।'

ঝুমা উত্তর দেয় না। সে যে অনুরাধার কলিগ সম্পর্কে এরকম হালকা চালের মন্তব্য পছন্দ করছে না, বুঝতে পেরে জয়ন্ত বলে, 'আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। ওভাবে আর বলব না। তা আমাদের এই নতুন কাকাটিকে দেখেছ ?'

ঝুমা চোখ বড় করে বলে, 'আবার ?'

হাতজোড় করে জয়ন্ত কী বলতে যাচ্ছিলেন একটা বিরাট লেডিজ ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ফিরে আসেন অনুরাধা, বলেন, চল—'

পাঁচ মিনিটের ভেতর লিফটে করে নিচের রাস্তায় নেমে আসে সবাই।

কলকাতার বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট হল ডালহৌসি এসপ্ল্যানেড পার্ক স্ট্রিট ক্যামাক স্ট্রিট, এইসব এলাকা ঘিরে। অফিস টাইমে চারিদিক থেকে 'রাশ'টা হয় এই দিকেই। উল্টোদিকের বাস টাস তখন গাদা গাদা মানুষ নামিয়ে দিয়ে প্রায় খালিই ফিরে যায়। ফাঁকা ট্যাক্সিও চোখে পড়ে।

জয়ন্ত একটা ট্যাক্সি ডাকতে যাচ্ছিল, অনুরাধা তাকে থামিয়ে দেন। বলেন, 'চল, তোমাকে মেট্রোতে চড়িয়ে নিয়ে যাই।'

জয়ন্ত বলে, 'মেট্রো কী?'

'তোমাদের লন্ডনে যাকে 'টিউব' বলে, আমাদের এখানে সেটাই মেট্রো। তবে পাতাল রেল কথাটা লোকের মুখে মুখে চলছে।'

কলকাতায় যে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সারভিস চালু হয়েছে খবরের কাগজে তার রিপোর্ট পড়েছিল জয়ন্ত। মনে আছে প্রতিবেদক এই সারভিসটার যথেষ্ট প্রশংসা করেছিল। কলকাতার বাইরেটা নোংরা, কুৎসিত, ভাঙাচোরা ধ্বংসস্তূপের মতো, কিন্তু মাটির তলায় যেন ড্রিমল্যান্ড।

অনুরাধা হালকা গলায় বলেন, 'তোমাদের মেট্রো তো ওয়ার্ল্ড ফেমাস, তবে আমাদের পাতাল রেল খুব পিছিয়ে নেই। মাটির তলায় নামলেই বুঝতে পারবে।'

জয়ন্ত বুঝতে পারে, কলকাতার মেট্রো নিয়ে অনুরাধার খুব গর্ব। একটু হেসে বলে, 'ঠিক আছে, মেট্রোতেই চড়াই যাক।'

ক্যামাক স্ট্রিট থেকে ডানপাশের রাস্তা দিয়ে টাটা সেন্টারের কাছে এসে চৌরঙ্গি পেরিয়ে এরা 'ময়দান' স্টেশনে গিয়ে টালিগঞ্জের ট্রেন ধরে।

খবরের কাগজের প্রতিবেদকটি যা লিখেছিল তার একটা অক্ষরও মিথ্যে নয়। সত্যিই স্বপ্নরাজ্য, অন্তত কলকাতার ওপরের অংশটার তুলনায় তো বটেই।

টালিগঞ্জ স্টেশনে নেমে সোজা মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই অনুরাধার বাপের বাড়ি। পুরনো আমলের এই ছোট্ট দোতলাটা একেবারেই ছিরিছাঁদহীন। তবে সেটাকে ঘিরে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে নানা রকম ফুলটুলের বাগান। এ বাড়ির লোকজনদের গাছপালার শখ আছে, সেটা বাগানের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়।

অনুরাধা জয়ন্ত আর ঝুমাকে একটা ঘরে বসিয়ে দৌড়ে তার মা আর বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। জয়ন্তর সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

জয়ন্ত এবং ঝুমা ওঁদের প্রণাম করতেই দুজনে বলেন, 'বসো, বসো।'

অনুরাধার বাবা নকুলেশ ঘোষের বয়স পঁয়ষট্টি। কিন্তু নিয়মিত নানা ধরনের রোগে ভোগেন বলে শরীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। বয়সের তুলনায় তাঁকে অনেক বেশি বুড়োটে দেখায়। তুলনায় অনুরাধার মা আনন্দময়ীর বয়স সাতান্ন আটান্ন হলেও তাঁর স্বাস্থ্য অনেক ভাল। মাথায় ঘন কালো চুল, অনেক খুঁজলে তার ভেতর দু-চারটে রুপোর তার হয়তো পাওয়া যাবে। শ্যামবর্ণ মহিলাটির কাটা কাটা ভরাট মুখ, ঘন পালক-ঘেরা বড় বড় চোখ। বয়সের ছাপ শরীরের কোথাও পড়েনি। তাঁর পরনে সাদা খোলের লাল নকশা-পাড় শাড়ি আর হাতায় সুতোর ফুলতোলা সাদা ব্লাউজ। ছোট্ট কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতেও সিঁদুরের লম্বা টান।

অনুরাধা আর তিনি পাশাপাশি দাঁড়ালে মা-মেয়ে ভাবা যায় না, মনে হয় দুই বোন।

আনন্দময়ী এমন একটি মানুষ যাঁর দিকে তাকালে মন ভাল হয়ে যায়। খুবই শান্ত, স্নেহপ্রবণ এবং স্বল্পভাষী।

আনন্দময়ী আর নকুলেশের কথা ভাসাভাসা ভাবে মনে ছিল জয়ন্তর। আগে ছোট কাকিমা যখন 'শান্তি ভবন'-এ ছিলেন নিয়মিত তাদের চিঠি লিখতেন। সে সব চিঠিতে আনন্দময়ীদের কিছু কিছু খবর থাকত। জয়ন্ত আরও জানে, অনুরাধার দুই ভাইবোন। তাঁর দাদা থাকেন ভাইজাগে, ওখানকার পোর্টে মোটামুটি কী একটা চাকরি করেন।

আনন্দময়ী স্নিগ্ধ হেসে জয়ন্ত আর ঝুমাকে বলেন, 'তোমরা এখানে খেয়ে যাবে।'

জয়ন্ত বিব্রত বোধ করে, বলে, 'না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।' তার ইচ্ছা ছিল, ঝুমাকে নিয়ে কোনও একটা ভাল হোটেলে লাঞ্চ খাবে।

নকুলেশ বলে উঠেন, 'তাই কখনো হয়! দুপুরবেলা এসেছো, না খাইয়ে ছাড়তে পারি? তোমাদের লন্ডনের বাড়িতে যদি কখনো গিয়ে পড়ি, না খাইয়ে ছাড়বে?'

জয়ন্ত কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, অনুরাধা বলে ওঠেন, 'তাছাড়া আমার সঙ্গে দরকারি কথা বলবে, বিল্লুর সঙ্গে দেখা করবে, তারপর তো যাওয়া। বাবার লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি দিচ্ছি। একটু জিরিয়ে স্নান সেরে নাও। ঝুমা, আমার ঘরে আলনায় শাড়ি আছে। যেটা পরে এসেছ, পাল্টে এসে আরাম করে বসো।'

ঝুমা বলে, 'একেবারে স্নান করার সময় পাল্টাব।'

জয়ন্ত বুঝতে পারে ঝুমার এখন যাওয়ার ইচ্ছা নেই। তাছাড়া ছোট কাকিমা যা বলেছেন সে সব না সেরে এখান থেকে বেরুনো যাবে না। সময়ও হাতে বেশি নেই। আর কয়েকদিন পরে লন্ডন ফিরে যেতে হবে। বার বার টালিগঞ্জে আসা জয়ন্তর পক্ষে সম্ভব নয়। অগত্যা সে আর আপত্তি করে না।

আনন্দময়ী বলেন, 'তোমরা গল্প করো, আমি যাই।' বলে, চলে যান।

রোগে নকুলেশের স্বাস্থ্য ভেঙেচুরে গেলেও মনটা এখনো বেশ তাজা আছে। দারুণ মজাদার মানুষ। মেয়ের ভাসুরপো, সম্পর্কে জয়ন্ত একরকম তাঁর নাতিই হয়। নকুলেশ তাঁর সঙ্গে প্রচুর রগড় করলেন, তাঁর অনেকটাই সেক্সের হালকা গন্ধ মাখানো। তাছাড়া তার বাবা মা এবং বোনের খবর নিলেন।

নকুলেশ ছিলেন ন্যাশানাল অ্যাটলাসের কার্টোগ্রাফার। কিন্তু নানা দেশের ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তর পড়াশোনা করে-ছেন। তাঁর আরও একটা প্যাশান হল পৃথিবীর সমস্ত বড় শহর সম্পর্কে যাবতীয় খবর রাখা। নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে লন্ডনের কোথায় কোন্ পাড়া, কোথায় রয়েছে বিশাল বিশাল জগদ্বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো, তাদের কী কী নাম, কোথায় কোথায় ছড়িয়ে আছে মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি, চিড়িয়াখানা, টয়-হাউস, নাম-করা সিনেমা ও থিয়েটার হল—সব বলে সেগুলোর হাল এখন কেমন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জয়ন্তর কাছে জেনে নেন। তাঁর ধারণা, লন্ডন আর আগের মতো থাকবে না। যেভাবে ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান আর বাংলাদেশি ঝাঁকে ঝাঁকে ওখানে হানা দিচ্ছে, ওর হাল কলকাতার মতো হয়ে যাবে।

শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে হাঁ হয়ে যাচ্ছিল জয়ন্ত। লণ্ডনে তার জন্ম, সে ব্রিটিশ সিটিজেন কিন্তু নকুলেশ লণ্ডনের যে সব রাস্তা বা এলাকার নাম বললেন, তার অনেকগুলোতেই সে যায়নি। সীমাহীন বিস্ময়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি লণ্ডনে কখনও গেছেন?'

'নেভার।' নকুলেশ হাসেন।

জয়ন্ত বলে, 'তা হলে এত সব জানলেন কী করে?'

'বই পড়ে আর ম্যাপ দেখে।'

'বলেন কী!'

'লণ্ডনের টিউব ট্রেনের রুটও আমার মুখস্ত। পরীক্ষা করবে নাকি?'

জয়ন্ত বলে, 'নট অ্যাট অল। জানি পরীক্ষা করলে আমি হেরে যাব।'

এবার অনুরাধার দিকে ফিরে হাসিমুখে নকুলেশ বলেন, 'তোরা নানা শহর সম্পর্কে পড়াশোনা করি বলে ঠাট্টা করিস কিন্তু দ্যাখ একজন খাঁটি লণ্ডনার পর্যন্ত আমার কাছে হার স্বীকার করেছে।'

অনুরাধাও হাসতে থাকেন।

জয়ন্ত লক্ষ করেছে, এত কথা হচ্ছে কিন্তু একবারও 'শান্তি ভবন'-এর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি নকুলেশ। ও বাড়ি থেকে তাঁর মেয়েকে যে চরম অসম্মান আর তিক্ততার মধ্যে চলে আসতে হয়েছে ঘুণাক্ষরেও তাঁর আচরণ এবং কথাবার্তায় টের পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে আত্মীয়-স্বজন এলে যেমন আদরযত্ন করা হয় তা-ই করছেন নকুলেশরা। সত্যিকারের কালচার্ড, ভদ্র মানুষ।

কথায় কথায় সেপ্টেম্বরের বেলা হেলতে থাকে। এক সময় আনন্দময়ী এসে বলেন, 'আমার রান্না হয়েছে। এ কী, তোমরা এখনো গল্প করছ! যাও জয়দাদা, ঝুমাদিদি—স্নান করে নাও।'

খাওয়ার পালা চুকতে দু'টো বেজে গেল।

তারপর অনুরাধা জয়ন্ত আর ঝুমাকে নিয়ে তাঁর শোওয়ার ঘরে চলে যান। নকুলেশ বা আনন্দময়ীকে ছোট কাকিমা কিছু বলে থাকবেন, তাই তাঁদের ধারেকাছে দেখা যায় না।

অনুরাধার ঘরটি ছিমছাম, চমৎকার সাজানো। একধারে জোড়া জানলার পাশে ডবল-বেড খাটে বিছানার ওপর ফুল লতাপাতার প্রিন্টওলা বেড কভার, আরকে দেওয়ালের গায়ে বার্নিশ-করা ওয়ার্ড-রোব, ড্রেসিং টেবিল। তৃতীয় দেওয়ালটি ঘেঁষে পড়ার টেবিলে মলাট দেওয়া বই আর খাতা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আছে শেড-দেওয়া টেবল-ল্যাম্প এবং স্টিলের ফোটো স্ট্যান্ডে ছোট কাকার ছবি। দরজার মুখোমুখি যে দেওয়ালটা, সেখানে আটকানো রয়েছে একটি ইলেক-ট্রনিক ওয়াল ক্লক।

তিনজনে খাটেই বসে।

অনুরাধা বলেন, 'এবার তোমার দরকারি কথাটা বলতে পার জয়।'

জয়ন্ত বলে, 'আমি কিন্তু সোজাসুজি বলব।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

'আপনি কেন আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন, ঝুমা আমাকে আজই তা বলেছে।'

অনুরাধা জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে নেন। জয়ন্ত যে সব জেনে ফেলেছে, এতে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

জয়ন্ত তাঁর দিকে খানিকটা ঝুঁকে বলে, 'আপনাদের সঙ্কোচের কারণ নেই ছোট কাকিমা।'

অনুরাধা মেঝের দিকে চোখ রেখে বসে থাকেন, কিছু বলেন না।

জয়ন্ত এবার গাঢ় সহানুভূতির সুরে বলে, 'আপনি যা ডিসিশান নিয়েছেন তাতে আমার ফুল সাপোর্ট আছে। জানেন তো, ইউরোপ আমেরিকায় একেক জন ক'বার করে বিয়ে করে? মাঝে মাঝেই কাগজে বেরোয় 'হি ফর সেভেনথ টাইম, সি ফর সিক্সথ। মানে একটি বর পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে সাত নম্বর বিয়েটি সারল, আর কনের সেখানে ষাট বছর বয়সে সেটি ছ'নম্বর বিয়ে।'

অনুরাধার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তিনি এবারও উত্তর দেন না।

ঝুমা তাঁকে লক্ষ করছিল। জয়ন্ত জানে না কাকে কী বলতে হয়।

আঙুল দিয়ে নিঃশব্দে তার হাতে একটা খোঁচা দেয় ঝুমা। জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই চোখের ইশারায় তাকে এরকম হালকা চালে মজা করতে বারণ করে।

জয়ন্ত সতর্ক হয়ে যায়। মাথা ঝাঁকিয়ে কাঁচুমাচু মুখে সে জানায় ও জাতীয় তামাসা আর করবে না। তারপর অনুরাধার দিকে ফিরে সহৃদয় সুরে বলে, 'বিয়েটা কি হয়ে গেছে ছোট কাকিমা?'

অনুরাধা আধফোটা গলায় বলেন, 'না।'

'দেরি করছেন কেন?'

'বিল্লুর জন্যে।'

'কেন, বিল্লুর কি আপত্তি আছে?'

একটু চুপ করে থাকেন অনুরাধা। তারপর বলেন, 'না, সেরকম মনে হয় না। মণিময়কে ও খুব পছন্দ করে। মণিময় এখানে এলে বেশির ভাগ সময়টা তো বিল্লুর সঙ্গেই কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে বেড়াতেও নিয়ে যায়।'

মণিময় যে কে, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে পাকা অভিভাবকের মতো খোঁজখবর নিতে থাকে জয়ন্ত। জিজ্ঞেস করে, 'ওঁর আর কে কে আছেন?'

'বিধবা মা আর ছেলে ছাড়া অন্য কেউ নেই।'

'মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'কেমন মানুষ?'

'ভাল। ভীষণ সরল। চমৎকার সেলাইয়ের হাত।' কথায় কথায় সঙ্কোচ কেটে যাচ্ছিল অনুরাধার। মুখ তুলে বলেন, 'বিল্লুর জন্যে ভারি সুন্দর একটা সোয়েটার বুনে দিয়েছেন। আমার জন্যে তসরের শাড়িতে কাঁথার কাজ করছেন।'

'ওঁরা থাকেন কোথায়?'

'হাজরায়?'

'সেটা কত দূরে?'

'কাছেই। বাসে গেলে ম্যাক্সিমাম মিনিট কুড়ি। মেট্রোতে সাত আট মিনিট।'

জয়ন্তর মধ্যে মজাদার একটি ছেলেমানুষ আছে। সে বলে, 'আপনার উড-বি নতুন শাশুড়িটি যখন শাড়িতে সুতোর ডিজাইন করে দিচ্ছেন, আশা করা যায়, আপনাকে তাঁরও ভাল লেগেছে।' বলতে বলতে টের পায় ঝুমার নখ তার হাতে গেঁথে গেছে। ফের ফাজলামো শুরু করায় সে রেগে গেছে। জয়ন্ত তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

অনুরাধা চুপ করে থাকেন।

জয়ন্ত বলে, 'এভরি থিং ইজ অলরাইট, আর দেরি করবেন না ছোট কাকিমা।'

অনুরাধা দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'সব ঠিক থাকলেও বিল্লুর জন্যে ডেট ঠিক করতে পারছি না।'

একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে জয়ন্ত, বিয়ের বাধাটা কোথায় সে বুঝে উঠতে পারছে না।

অনুরাধা তাকে লক্ষ করতে করতে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেন। তাঁর বিয়ে হয়ে গেলে আগেকার স্বামীর প্রোপার্টি তিনি দাবি করবেন না, তবে বিল্লু তার বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে কেন? মণিময় অবশ্য জানিয়েছেন ওই সব প্রোপার্টি নিয়ে মাথা না ঘামাতে। অনুরাধা চাকরি করেন, তিনিও চাকরি করেন। তাছাড়া তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে, ব্যাঙ্কে মোটা অঙ্কের টাকা আছে। বিল্লুর ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও রকম চিন্তা নেই। তাকে তাঁরা মনের মতো করে মানুষ করতে পারবেন। সবই ঠিক। একেক সময় মনে হয় মণিময়ের ইচ্ছা অনুযায়ী চলবেন। পরক্ষণে ভাবেন, ভবিষ্যতে বিল্লু বড় হলে যদি বলে বসে, 'তোমাদের জন্য আমি আমার বাবার সম্পত্তি পাইনি', তখন কী জবাবদিহি করবেন? বউবাজারে তাঁর যে সব ভাসুর এবং জা রয়েছেন, অনুরাধা চট করে বিয়েটা করে ফেললে তাঁরা কিছুতেই বিল্লুকে তার বাবার প্রোপার্টি পেতে দেবেন না। অন্তত অনুরাধার সে রকমই ধারণা। তাই মোটামুটি তিনি স্থির করেছেন, আপাতত বিয়েটা হচ্ছে না। যতদিন না বিল্লুর ব্যাপারটা ঠিক হয় অপেক্ষা করবেন।

এই সমস্যাটার কথা আগেই ভেবেছে ঝুমা। জয়ন্তর সঙ্গে এ নিয়ে কথাও হয়েছে। জয়ন্ত বলে, 'যতদিন বিয়ে না হচ্ছে, বিল্লুর আগে ছোট কাকার শেয়ার আপনার প্রাপ্য। সেটা কিছুতেই ছাড়বেন না।

একটু থেমে বলে, 'আপনাকে খবর দেওয়া দরকার। জেঠামশাইরা আমার সঙ্গে পরশু কিছু আর্জেন্ট বিষয়ে আলোচনা করবেন। আমার ধারণা বিষয়টা হল প্রোপার্টি। বাবা আমাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে পাঠিয়েছেন। ও'রা কী বলবেন, জানি না। তবে যদি দেখি আপনাদের ডিপ্রাইভ করতে চাইছেন বাধা দেব।'

গাঢ় আবেগে জয়ন্তর দু'হাত জড়িয়ে ধরেন অনুরাধা। অভিভূতের মতো বলেন, 'এই প্রথম ও বাড়ির কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়াল। ভাসুরেরা জায়েরা সারাক্ষণ আমার মৃত্যুকামনা করে। অবশ্য আমার সম্বন্ধে ঝুমার সিমপ্যাথি আছে কিন্তু সে তো একটা মেয়ে, তার পক্ষে কত দূরে কী আর করা সম্ভব? জয়, তুমি আমার মন ভরিয়ে দিয়েছ।'

অনুরাধার আবেগ জয়ন্তর মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে থাকবে। সে বলে, 'অন্যায় আমি কিছুতেই মেনে নেব না। তাতে যা হওয়ার হবে। ছোট কাকিমা, আপনারা কি কোনও ল-ইয়ারের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না।'

'বলা উচিত ছিল।'

একটু চুপচাপ।

তারপর জয়ন্ত ফের বলে, 'আমি যতদূর জানি, প্রোপার্টি ট্রোপার্টির ব্যাপারে প্রবলেম দেখা দিলে তার সলিউশান হতে অনেক সময় লাগে। ধরুন যদি তিন চার বছরই লেগে যায়, আপনাদের বিয়েটা ততদিন কি হেল্ড-আপ হয়ে থাকবে?'

অনুরাধা ধীরে ধীরে বলেন, 'তুমি কী করতে বলো?'

'এক্ষুণি কিছু বলব না। জেঠামশাইরা কী চান, পরশু শুনে নিই। আমি ফিরে যাবার আগেই আপনারা ল-ইয়ারের সঙ্গে অবশ্যই কনসাল্ট করে নেবেন।' বলতে বলতে বিদ্যুৎ চমকের মতো বিশাখার মুখ মনে পড়ে যায় জয়ন্তর। সে বলে, 'আর—আর একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। ওরা একটা মেয়েদের অর্গানাইজেশন চালায়। যে কোনও সময় ওদের সাহায্য পাবেন।'

'মেয়েটি কে?'

বিশাখা। সে একজন সোশাল অ্যাক্টিভিস্ট, ওদের অর্গানাইজেশনের নাম 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'।'

অনুরাধা বলেন, 'ঠিক আছে।'

কথায় কথায় তিনটে বেজে গিয়েছিল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে শশব্যস্তে উঠে পড়েন অনুরাধা, বলেন, 'তোমরা একটু বসো, আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'বিল্লুর ছুটি হয়ে গেছে। ওর স্কুল বাস এখনই এসে পড়বে। ওকে নিয়ে আসছি।'

দশ মিনিটও লাগে না, বিল্লুকে নিয়ে ফিরে আসেন অনুরাধা। ছোট কাকা দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। বিল্লুর দিকে তাকলে তাঁর কথা মনে পড়ে যায়। হুবহু তাঁর চেহারাটি যেন বসানো।

বছর আট নয় হবে বিল্লুর বয়স। তার স্কুল-ড্রেস নেভি ব্লু হাফ প্যান্ট, ধবধবে সাদা শার্ট এবং লাল টাই। পায়ে সাদা মোজা আর ফিতে বাঁধা শু। পিঠে বইখাতার ব্যাগ, কাঁধ থেকে ওয়াটার বটল ঝুলছে।

পুরো স্কুল করার পর অনেকটা রাস্তা বাস জার্নি করে এসেছে বিল্লু। কপালে ঘাম জমেছে তার, চুল এলোমেলো।

ঘরে ঢুকে ঝুমাকে দেখে বিল্লু বলে, 'তুমি কখন এসেছ বড়দি?' বলতে বলতে হঠাৎ জয়ন্তর দিকে চোখ চলে যাওয়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অনুরাধা জয়কে দেখিয়ে বলেন, 'কে বল তো?'

বিল্লু মুখে কিছু বলে না, আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে শুধু, অর্থাৎ চেনে না।

অনুরাধা বলেন, 'তোমার জয়দাদা, এর ফোটো তো কতবার দেখেছ। সেই লন্ডন থেকে এসেছে। যাও, প্রণাম কর।'

বিল্লু খুব বাধ্য ছেলে। সে পায়ের দিকে ঝুঁকবার আগেই তাকে টেনে পাশে বসায় জয়ন্ত। বলে, 'কোন ক্লাসে পড়?'

বিল্লু রিনরিনে সুরেলা গলায় জবাব দেয়, 'ফোর।'

'ফাইন। তোমাদের স্কুলের কী নাম?'

'সেন্ট পলস।'

'অনেক দূরে?'

'হুঁ—' ঘাড় হেলিয়ে দেয় বিল্লু।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কখন স্কুল-বাস তোমাকে নিতে আসে?'

'ন'টায়।'

জয়ন্তর মনে পড়ে যায়, ছোট কাকিমা আর বিল্লুর জন্য যে গিফট প্যাকেট নিয়ে এসেছিল, এখনও দেওয়া হয়নি। সে বলে, 'যাও, হাত মুখ ধুয়ে স্কুল ড্রেস চেঞ্জ করে এস। তোমাকে একটা জিনিস দেব।'

বিল্লু পিঠের ব্যাগটা টেবলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে এক দৌড়ে বেরিয়ে যায়, অনুরাধাও তার সঙ্গে সঙ্গে যান। কিছুক্ষণ পর দু'জনকে আবার দেখা যায়। বিল্লু মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে স্ট্রাইপ দেওয়া বাড়ির পোশাক পরে এসেছে।

জয়ন্ত এর মধ্যে ব্যাগ থেকে গিফট প্যাকেট দুটো বার করে রেখেছিল। বিল্লুকে তার প্যাকেটটা দিয়ে দ্বিতীয় প্যাকেটটা অনুরাধাকে দিতেই তিনি কুণ্ঠিত মুখে বলেন, 'বিল্লুকেই তো দিয়েছ, আবার আমাকে কেন?'

জয়ন্ত বলে, 'বিল্লুর জন্য আমি এনেছি। আপনারটা মা পাঠিয়েছেন।'

অনুরাধা আর কিছু বলেন না, নিজের প্যাকেটটা তিনি বিল্লুর পড়ার টেবলের এক পাশে রেখে দেন। বিল্লুর তর সইছিল না, সে চটপট তার প্যাকেট খুলে ফেলে। বেরিয়ে পড়ে দামি দামি তিনটে প্যান্ট, তিনটে শার্ট, তিনটে টাই, একটা ছোট কম্পিউটার, অনেকগুলো ইলেকট্রনিক খেলনা, ছবি আঁকার জন্য রঙের বাক্স, ব্রাশ, পেন সেট এবং টেনিস র‍্যাকেট আর ছ'টা সাদা টেনিস বল।

জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে খুশিতে বিল্লুর চোখ চকচক করতে থাকে।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কী, পছন্দ হয়েছে?'

মাথাটা অনেকখানি হেলিয়ে গলার স্বরে লম্বা টান দিয়ে বিল্লু বলে, 'হুঁ-উ-উ-উ—'

যে এত সুন্দর সুন্দর গিফট নিয়ে এসেছে তার সঙ্গে ভাব জমাতে

...চক্ষণ। কম্পিউটার, জামা-প্যাণ্ট, রঙের বাক্স—এসব বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার ফাঁকে ফাঁকে জয়ন্তর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয় বিল্লু। তার স্কুলের গল্প, স্যারেদের গল্প, বন্ধুদের গল্প। সেই সঙ্গে লণ্ডন সম্পর্কে, সেজ জেঠা সেজ জেঠি জয়াদির সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কৌতূহলের শেষ নেই তার।

বিল্লুর সব কথার উত্তর দিয়ে জয়ন্ত বলে, 'তুমি লণ্ডন যাবে?'

মাথাটা হেলিয়ে একটু আগের মতো সুর টেনে বিল্লু বলে, 'হুঁ-উ-উ-উ-উ—'

'ঠিক আছে, আমার মনে রইল।' বলে অনুরাধার দিকে তাকায়, 'আমি কিন্তু বিল্লুকে সত্যিই একবার লণ্ডনে নিয়ে যাব। যেতে দেবেন তো?'

সস্নেহে অনুরাধা জয়ন্তকে লক্ষ করছিলেন। ফোটোতে ছাড়া তাকে আগে আর কখনো দেখেননি। লণ্ডন-প্রবাসী ব্রিটিশ সিটিজেন এই ভাসুরপো'টির আন্তরিকতা এবং মধুর ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ। ঝুমাকে বাদ দিলে শ্বশুরবাড়ির প্রতিটি মানুষ সম্পর্কে তাঁর খুব খারাপ অভিজ্ঞতা। রাস্তাঘাটে তাদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে রক্ত-চাপ যেন বেড়ে যায়, মনে হয় মাথার শিরা ছিঁড়ে যাবে। ওরা তার মধ্যে যা উসকে দেয় তা হল প্রচণ্ড রাগ আর বিতৃষ্ণা। কিন্তু এই প্রায় অচেনা ছেলেটা বার বার তাকে অদ্ভুত এক আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গলা থেকে বুকের গভীর পর্যন্ত ভারী ভারী লাগছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাছে অপমান আর লাঞ্ছনা ছাড়া কিছু জোটেনি। কিন্তু জয়ন্তর কাছ থেকে যা পেলেন—সহানুভূতি, মর্যাদা, সহৃদয়তা—তার তুলনা নেই। কোনোদিন এসব ভাবতেও পারেন নি। ধরা গলার তিনি বলেন, 'তোমার ভাই, তুমি নিয়ে যাবে, সে জন্যে কাকিমাকে জিজ্ঞেস করছ? নিশ্চয়ই যাবে বিল্লু।'

জয়ন্ত একটু হেসে বিল্লুকে বলে, 'বিল্লুদাদা, কাকিমার পারমিশন পেয়ে গেছি। বল, তোমার স্কুলে লম্বা ভেকেশন কখন কখন পড়ে?'

বিল্লু বলে, 'সামারে আর পুজোর সময়।'

'এবারকার পুজো তো এসে গেল। এত তাড়াতাড়ি তোমার পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করা যাবে না। সামার ভেকেশনটাই ঠিক থাক।'

'হুঁ-উ-উ-উ—'

'এখান থেকে কাকিমা তোমাকে প্লেনে তুলে দিলে একা যেতে পারবে তো?'

বিল্লু ঘাবড়ে যায়, ঢোক গিলে বলে, 'একা!'

জয়ন্ত তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'হ্যাঁ, একা। তুমি তো বড় হয়ে গেছ। জানো ইংল্যান্ড আমেরিকায় তোমার মতো ছেলে-মেয়েরা একা একা কোথায় না চলে যাচ্ছে!'

বিল্লু এবার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বলে, 'আমিও পারব।'

'দ্যাটস লাইক আ ব্রেভ গাই—' বলেই কী চিন্তা করে জয়ন্ত বলে, 'ঠিক আছে, প্রথম বার অন্য ব্যবস্থা করছি। লন্ডন থেকে রোজ আমাদের জানাশোনা কেউ না কেউ কোনো না কোনো ফ্লাইটে ইন্ডিয়ায় আসছে। তাদের কাউকে বলে দিলে সে তোমাকে নিয়ে যাবে।—কাকিমা, আপনি ওর পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে দিন। ওটা হয়ে গেলে আমাকে চিঠি লিখবেন। কখন ভিসার জন্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে, আমি জানিয়ে দেব।'

অনুরাধা বলেন, 'আচ্ছা।'

ক্যামাক স্ট্রিটে অনুরাধার অফিসে পা দেবার পর থেকেই একটা ব্যাপার মাথায় ঘুরছিল জয়ন্তর কিন্তু সেটা বলার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। ঝুমা ছাড়া অন্য কেউ থাকলে তা বলা সম্ভব না, বিশেষ করে বিল্লুর সামনে তো নয়ই। খানিক আগে অনুরাধা, ঝুমা আর সে শুধু এই ঘরে ছিল, তখন বলা যেত কিন্তু অন্য কথায় কথায় বলা হয়নি। এবার আর না বললেই নয়।

জয়ন্ত বিল্লুকে জিজ্ঞেস করে, 'বিকেলে স্কুল থেকে এসে তুমি খেল না?'

অনুরাধা বলেন, 'খেলে আবার না? ফুটবল বলতে একেবারে উন্মাদ। ও'র বন্ধু ওয়ার্ল্ড কাপাররা এসে পড়ল বলে। একেকটি মারাদোনা, গুলিট, মার্কো ভান বাস্তেন, ম্যাথিউস—'

জয়ন্ত হেসে ফেলে, 'আপনিও তো দেখছি অনেকের নাম জানেন—'

'জানব না? দিনরাত শুনছি যে।'

নিচ থেকে অনেকগুলো কচি গলা ভেসে আসে, 'বিল্লু, বিল্লু—'

অনুরাধা বলেন, 'ওই এসে গেছে।—যা বিল্লু, জামা-প্যাণ্ট ছেড়ে দিদার কাছ থেকে খাবার খেয়ে খেলতে যা।'

বিল্লুকে দেখে মনে হল, ভীষণ দোটানায় পড়ে গেছে। বন্ধুদের ডাকটা উপেক্ষা করার নয়, আবার জয়ন্তকে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সে বলে, 'আমি একটুখানি খেলে আসছি। তুমি চলে যাবে না তো জয়দাদা?'

জয়ন্ত বিল্লুর কাঁধে হাত রেখে বলে, 'তুমি যতক্ষণ না খেলে আসছ, আমি থাকব।'

'আমি একটুখানি খেলেই চলে আসব।' বলে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বিল্লু।

অনুরাধা চোখের কোণ দিয়ে জয়ন্তকে দেখতে দেখতে বলেন, 'বিল্লুকে তো খেলতে পাঠালে। এবার বল কী বলবে?'

অনুরাধা যে দারুণ বুদ্ধিমতী, মুখ দেখে মনের কথা পড়ে ফেলতে পারেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না জয়ন্তর। ভেতরে ভেতরে সে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তারপর হেসে ফেলে। বলে, 'কী করে বুঝলেন আমার কিছু বলার আছে।'

অনুরাধা উত্তর দেন না, তিনিও হাসেন।

জয়ন্ত বলে, 'আমাদের নতুন ছোট কাকাটিকে দেখতে চাই।'

অনুরাধার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যায়, তিনি বলেন, 'আমি জানতাম, তুমি এই কথাটাই বলবে। তাকে আসতে বলে দিয়েছি। পাঁচটার ভেতর চলে আসবে।'

ঝানু অভিভাবকের মতো জয়ন্ত বলে, 'আমার কাকিমাটি কার হাতে পড়েছে তাকে একটু বাজিয়ে টাজিয়ে দেখতে হবে তো।'

ঝুমা নিঃশব্দে জয়ন্তর হাতে একটা চিমটি কাটে। গুরুজনদের নিয়ে এ জাতীয় হাল্কা রসিকতা সে পছন্দ করছে না। কিন্তু জয়ন্ত তা গ্রাহ্য করে না, তার মাথায় দুষ্টুমি ভর করেছে। সে অনুরাধাকে বলে, 'যদি বুঝি লোক ভাল না, এ বিয়ে কিন্তু আমি কিছুতেই অ্যাপ্রুভ করব না।'

অনুরাধা হাসিমুখে বলেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

পাঁচটা নাগাদ ভদ্রলোকটি এলেন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। কালো পাথর-কাটা ভাস্কর্যের মতো তাঁর চেহারা। মুখ চোখে অপার্থিব সারল্য মাখানো।

অনুরাধা জয়ন্তর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এভাবে। ভদ্রলোক সম্পর্কে বললেন, 'ইনি মণিময় সান্যাল, আমার কলিগ। এঁর কথাই এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে হচ্ছিল।' জয়ন্ত সম্পর্কে মণিময়কে বললেন, 'এ আমার সেজ ভাসুরের ছেলে, ব্রিটিশ সিটিজেন, লন্ডন থেকে তিন দিন হল এসেছে। ভাসুরপো হলেও ও আমার গার্জেন, একরকম বাবাই বলতে পার। আমার এই ছোট বাবাটি যতক্ষণ না তোমার সম্বন্ধে সব কিছু জেনে অ্যাপ্রুভাল দিচ্ছে, তুমি যা চাইছ সেটি কিন্তু হবে না।'

মণিময় দারুণ আমুদে আর হাসিখুশি মানুষ। সমস্ত ব্যাপারটার ভেতরে যে একটা মজা আছে সেটা তিনি চট করে ধরে ফেলেছিলেন। নামতা পড়ার মতো গড়গড় করে বলেন, 'আমি ইংরেজি নিয়ে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে এম এ পাশ করেছি। অনুরাধার সঙ্গে এক অফিসে চাকরি করি, একটা ডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজর, মাইনে সাড়ে পাঁচ হাজার, কলকাতায় বাড়ি আছে, মাকে নিয়ে আমার ছোট্ট ফ্যামিলি, কোনওরকম নেশা টেশা নেই, নিজেকে চরিত্রবান মনে করি, আমার কোনও ঋণ নেই, সজ্ঞানে কারুর ক্ষতি করিনি। তা ছাড়া বিল্লু আমাকে খুব পছন্দ করে।' বলে জয়ন্তর দিকে অনেকটা ঝুঁকে চোখে মুখে কাতরতা ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'সব জানালাম। অ্যাপ্রুভাল কি পাব?'

গম্ভীর গলায় জয়ন্ত বলে, 'এত তাড়াতাড়ি মতামত দিতে পারব না। দেখি আরো কিছুক্ষণ।'

মণিময় বলেন, 'অলরাইট। টেক ইওর টাইম।'

এরপর অনুরাধা চা করে আনেন, সেই সঙ্গে প্রচুর মিষ্টি, কাজু বাদাম আর নোনতা খাবার। খেতে খেতে হাসিতে গল্পে আসর জমজমাট হয়ে ওঠে।

তারই ভেতর নকুলেশ আর আনন্দময়ী একবার করে এ ঘরে ঘুরে গেলেন। মণিময়ের সঙ্গে ওঁদের সম্পর্ক যে খুবই ভাল, সেটা টের

পেতে অসুবিধা হয় না জয়ন্তর। মণিময় ওঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন, নকুলেশরাও তাঁকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন। শুধু স্নেহ-ভালবাসাই না, তাঁর ওপর নানা বিষয়ে নির্ভরও করেন। যেমন আনন্দময়ীর জন্য ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া, কর্পোরেশনের সঙ্গে ট্যাক্সের ব্যাপারে কী একটা গোলমাল মেটানো, ইত্যাদি।

মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে মানুষটিকে ভীষণ ভাল লেগে যায় জয়ন্তর। নাঃ, অনুরাধার নির্বাচনে ভুল হয়নি।

সন্ধ্যের খানিক আগে বল খেলে ফিরে এল বিল্লু। ঘামে জামা ভিজে গেছে, কপালেও দানা দানা ঘাম। এসেই মণিময়ের কোলে চড়ে বসে সে এবং মণিময়ের পকেট থেকে একটা বড় চকোলেটের 'বার' বার করে কামড় বসিয়ে দেয়।

বোঝা যায়, মণিময় যখনই আসেন তাঁর পকেটে চকোলেট থাকে। আর বিল্লু তাঁর কোলে চেপে সেটি বার করে নেয়।

জয়ন্ত জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখে রোদ প্রায় নেই বললেই হয়, বাড়িঘর গাছপালার ছায়া দীর্ঘ হয়ে গেছে, চারপাশ আবছা হতে শুরু করেছে। বিল্লুকে একটু আদর করে সে বলে, 'এবার আমরা যাব।'

বিল্লু তার একটা হাত ধরে বলে, 'আমাদের কাছে আজ থাকো না ও জয়দাদা—'

'আজ না, আরেক দিন আসব তখন থাকব।'

'আসবে কিন্তু—'

'নিশ্চয়ই।'

অনুরাধাকেও আবার আসার কথা বলে উঠে পড়ে জয়ন্ত। ঝুমাকে সঙ্গে নিয়ে একতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। অনুরাধা মণিময় আর বিল্লু ওদের সঙ্গে সঙ্গে নিচে আসেন। একতলার বারান্দায় আনন্দময়ী আর নকুলেশ বসে কথা বলছিলেন। তাঁরাও সবার সঙ্গে জয়ন্তদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যান।

রাস্তায় বেরিয়ে হাতের ইশারায় মণিময়কে কাছে ডেকে তাঁর কানে ফিস করে জয়ন্ত বলে, 'অ্যাপ্রুভড। আমি অ্যাম ভেরি হ্যাপি। আগেই কনগ্র্যাচুলেশন জানিয়ে গেলাম।'

গভীর আবেগে জয়ন্তর একটা হাত ধরে মণিময় বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

দশ

অনুরাধাদের বাড়ি থেকে জয়ন্তরা যখন টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের কাছে 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিসে পৌঁছয়, সন্ধে নামতে শুরু করেছে। রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

আজ খুব ভিড় টিড় নেই। মাত্র কয়েকজন মেম্বার এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গল্প করছে।

সুরমা যে বড় ঘরটায় বসেন সেখানে তিনি ছাড়া রয়েছে বিশাখা, দীপা আর কণা। কণা এ ঘরে বসে না, পাশের ঘরে টাইপ ফাইপ করে। কণা ছাড়া বাকি সবাই বসে ছিল। সে সুরমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা ফাইলে কিছু দেখাচ্ছিল।

জয়ন্ত ঝুমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে বলে, 'দেখুন কথামতো হাজিরা দিয়েছি।'

সুরমা ফাইল থেকে মুখ তুলে হাসিমুখে বলেন, 'তাই তো দেখছি। বসো।' ঝুমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'একে তো চিনতে পারলাম না। কোনও প্রবলেম নিয়ে এসেছে নাকি?'

জয়ন্ত মজার গলায় বলে, 'প্রবলেম ছাড়া এখানে আসতে নেই বুঝি!' বলে দীপা ছাড়া বাকি সবার সঙ্গে ঝুমার পরিচয় করিয়ে দেয়। সে জানে, দীপা এবং ঝুমা পরস্পরকে ভালই চেনে।

সামান্য দু-একটা কথার পর ঝুমা বলে, 'সুরমাদি, আমি দীপার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। ওকে বারান্দায় নিয়ে গেলে আপনাদের আপত্তি নেই তো?'

'সুরমা বুঝতে পারছিলেন দীপার সঙ্গে ঝুমার পরিচয় আছে। বলেন, 'একেবারেই না।'

দীপাকে সঙ্গে করে ঝুমা বাইরে চলে যায়। কণাও আর দাঁড়িয়ে থাকে না, ফাইলের একটা পাতায় সুরমাকে দিয়ে সই করিয়ে বেরিয়ে যায়।

জয়ন্ত এবার জিজ্ঞেস করে, 'দীপার ব্যাপারে কোনো ডিসিশান নিয়েছেন ?'

সুরমা চিন্তিতভাবে বলেন, 'না, সেভাবে ঠিক…আসলে কী করব, বুঝতে পারছি না। ভাবছি, রাজশেখরবাবু আর রানাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেখব কিনা—'

বিশাখা চেঁচিয়ে ওঠে, 'নো নো নো।'

'মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবো, সব সময় কড়া স্টেপ নিলে কাজ হয় না। আলাপ আলোচনার মধ্যেও অনেক সমস্যার সমাধান হয়।'

গলার স্বরটাকে উঁচু পর্দায় রেখে বিশাখা বলে, 'এখানে হবে না। ওই স্কাউণ্ড্রেলরা একেকটা জন্তু, কোনো রকম হিউম্যান কোয়ালিটি থাকলে একটা মেয়ের এমন সর্বনাশ করে হাত মুছে ফেলতে চাইত না।'

চেঁচামেচি শুনে বারান্দা থেকে সন্ত্রস্তভাবে দৌড়ে আসে দীপা আর ঝুমা।

বিশাখা ঝুমার দিকে ফিরে বলে, 'তোমার জেঠা আর জেঠতুতো দাদাকে স্কাউন্ড্রেল আর জন্তু বলেছি। অন্যায় হয়েছে ?'

এরকম একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না ঝুমা। প্রথমটা সে হকচকিয়ে যায়। তারপর বলে, 'একেবারেই না। দে ডিজার্ভ দিজ।'

এ জাতীয় উত্তরই আশা করেছিল বিশাখা। সে বুঝেছে, যে মেয়ে জয়ন্তর সঙ্গে 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এ এসেছে সে তার জেঠাদের কুকীর্তি নিশ্চয়ই সমর্থন করে না। বিশাখা বলে, 'তুমি ডেফিনিটলি তোমার জয়ন্তদার কাছে শুনেছ আমরা দীপার কেসটা টেক-আপ করেছি।'

'শুনেছি।'

'তুমি জন্ম থেকেই জেঠাদের আর তাদের ছেলেমেয়েদের দেখে আসছ। তারা কেমন লোক ভাল করেই জানো। সুরমাদি বলছিলেন, রাজশেখরবাবু আর রানাকে তেমন করে বোঝাতে পারলে ওরা দীপাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। তোমার কী মনে হয় ?'

'ইমপসিবল। বড় জেঠারা কোনোভাবেই মেনে নেবে না। আমি ওদের হাড়ে হাড়ে চিনি।'

বিশাখা এবার সুরমার দিকে তাকায়। বলে, 'ঝুমার মুখেই

শুনলেন তার জেঠা আর জেঠতুতো ভাই কী টাইপের লোক। সফট মেথড চলবে না সুরমাদি। ঝুমারা আসার আগে যে ড্র্যাস্টিক স্টেপের কথা বলছিলাম সেটাই নিতে হবে। তাছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই।'

জয়ন্ত এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার জিজ্ঞেস করে, 'কী স্টেপ নিতে যাচ্ছেন, জানতে পারি?'

বিশাখা বলে, 'না।'

'কেন?'

'জানাজানি হয়ে গেলে আপনার জেঠাবাবুরা হয়তো পালিয়ে যাবে, নইলে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারে।'

জয়ন্ত বলে, 'আমার দিক থেকে জানাজানির ভয় নেই। আশা করি ঝুমাও এ ব্যাপারে মুখ বুজে থাকবে।' বলে ঝুমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কাউকে কিছু বলবে?'

ঝুমা মাথা ঝাঁকিয়ে জানায়—বলবে না।

বিশাখা বলে, 'প্রমিজ?'

জয়ন্ত আর ঝুমা এক সঙ্গে বলে ওঠে, 'প্রমিজ।'

একটু ভেবে বিশাখা জানায়, 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর সব মেম্বার আর কলেজ ইউনিভার্সিটির কিছু ছেলেমেয়ে নিয়ে সে 'শান্তি ভবন' ঘেরাও করতে যাবে। যতক্ষণ না দীপাকে রাজশেখররা পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নিচ্ছে, পিকেটিং চালিয়ে যাবে।

শুনতে শুনতে চমকে উঠেছিল ঝুমা। এমন আগুনের মতো মেয়ে আগে দেখেনি সে।

বিশাখা জয়ন্ত আর ঝুমাকে বলে, 'আশা করি, আপনাদের সাপোর্ট পাব এ ব্যাপারে। আমাদের সঙ্গে আপনারাও যাবেন 'শান্তি ভবন'-এ মিছিল করে।'

জয়ন্তর রক্তের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যায় যেন। সে বলে, 'আমি যাব আপনাদের সঙ্গে। তবে ঝুমাকে ছেড়ে দিন। ওর মিছিলে যাওয়ার অসুবিধে আছে। 'শান্তি ভবন'-এ ওকে থাকতে হবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন প্রসেশান আর পিকেটিং-এর পর ওর ওপর কী ধরনের

টরচার হতে পারে। অবশ্য ঝুমোর মোরাল সাপোর্ট আপনারা পাবেন।'

ঝুমা এই সময় বলে ওঠে,'মোরাল সাপোর্টের কথা জানাতেই একটু আগে দীপাকে নিয়ে আমি বারান্দায় গিয়েছিলাম।'

বিশাখা বলে, 'ঠিক আছে।'

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কবে 'শান্তি ভবনে'-এ হানা দিতে যাচ্ছেন, আপনারা ?'

বিশাখা সুরমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কবে যাওয়া যায় সুরমাদি ?'

ঝুমা আর জয়ন্ত বুঝতে পারছিল সুরমাদি 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর ক্যালকাটা ইউনিটের প্রেসিডেন্ট হলেও বিশাখাই অর্গানাইজেশনটা চালিয়ে থাকে। সে যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, সুরমা তা মেনে নেন।

সুরমা বলেন, 'কবে সবাইকে জোগাড় করতে পারবে ?'

'দেরি করা ঠিক হবে না। আজ বুধবার। ধরুন শনিবার যদি যাই ?'

'এর মধ্যে অর্গানাইজ করতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই পারব। আপনি শনিবার দুপুরে মেম্বারদের এখানে হাজির হওয়ার জন্যে নোটিশ দিন। অমলা আর বিনয়কে দিয়ে কিছু পোস্টার লেখাতে হবে। আমার আর পল্লবীর কলেজের ছেলেমেয়েদের বললেই দল বেঁধে চলে আসবে। কাল আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে যাব, পল্লবীকে পাঠাব রবীন্দ্রভারতীতে, অনুপমকে যাদবপুরে। ওরা স্টুডেন্ট ইউনিয়নগুলোকে বললেই প্রচুর ছেলেটেলে পাঠিয়ে দেবে।'

'তা হলে স্যাটারডেটাই ফিক্সড রইল।'

'হ্যাঁ।'

'আমি এখন উঠব। রোজ বাড়ি ফিরতে ফিরতে দশটা সাড়ে দশটা হয়ে যাচ্ছে। মা আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছেন।'

জয়ন্ত বলে, 'আমরাও চলি। সেই সকালে বেরিয়েছি, খুব টায়ার্ড লাগছে।'

সুরমা জিজ্ঞেস করেন, 'কাল আসছ তো ?'

জয়ন্ত বলে, 'কাল একটু আনসার্টেন। পিসির বাড়ি যেতে হবে,

কখন ছাড়া পাব জানিনা। যদি তাড়াতাড়ি বেরুতে পারি, চলে আসব।'

'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড' থেকে বেরিয়ে ঝুমা বিশাখা আর জয়ন্ত বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকে।

হঠাৎ বিশাখা বলে, 'এবার দরকারি কথাটা বলে ফেলুন।'

কলকাতায় এসে দু'জন অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহিলাকে দেখল জয়ন্ত। অনুরাধা আর বিশাখা। এরা প্রায় থট-রিডারের তৎপরতায় অন্যের মনের কথা পড়ে ফেলতে পারে। সে হেসে হেসে বলে, 'ধরে ফেলেছেন তা হলে!'

বিশাখা বলে, 'পারব না? আমি যেই বেরুবার কথা বললাম, অমনি আপনারও বাড়ি ফেরার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তখনই ভাবলাম, নিশ্চয়ই আমাকে এমন কিছু বলতে চান যা সুরমাদির সামনে বলার অসুবিধে ছিল। এখন বলুন—'

জয়ন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলে, 'আপনার মতো মেয়ে আগে দেখিনি।'

'লণ্ডনেও নেই?'

'হয়তো আছে।' আমার চোখে পড়েনি। জয়ন্ত বলে, 'আপনার কোনো ল-ইয়ার চেনা আছে?'

বিশাখা বলে, 'ল-ইয়ার দিয়ে কী হবে? এই তো সবে কলকাতায় পা দিয়েছেন। এর মধ্যেই কোনো কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলেছেন নাকি?'

বিশাখার কথাগুলোর মধ্যে মজার সঙ্গে একটু খোঁচাও ছিল। জয়ন্ত হেসে হেসে বলে, এতবড় জিনিয়াস আমি নই।'

'তা হলে ল-ইয়ার দিয়ে কী হবে?'

খুব সংক্ষেপে অনুরাধা আর বিল্লুর ব্যাপারটা বলে তাদের ইনহেরিটান্সের সমস্যার কথাটা জানায় জয়ন্ত। জানায় পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে ছোট কাকার যে অংশ আছে সেটা অনুরাধা না হোক, বিল্লু কীভাবে পাবে, তার জন্যই একজন জবরদস্ত ল-ইয়ারের পরামর্শ প্রয়োজন।

বিশাখা অবাক চোখে জয়ন্তর দিকে তাকায়। প্রথম যেদিন সে তাকে প্লেনে দেখে, তার সম্বন্ধে ধারণাটা খুব উঁচু ছিল না। যারা

অঢেল টাকার জন্য, আরামের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যায়, বিদেশের সিটিজেনশিপ নেয়, এই সব আত্মকেন্দ্রিক কেরিয়ারিস্টদের ভাল চোখে দেখে না বিশাখা। অবশ্য জয়ন্ত নিজে থেকে ইংল্যান্ডে যায় নি, তার বাবা-মা গিয়েছিলেন। সেখানে তার জন্ম এবং জন্মসূত্রে সে ব্রিটিশ সিটিজেন। যে মা-বাবারা দেশ ছাড়ে, তাদের ছেলে মেয়েদেরও নিজেদের মতো করেই গড়ে তোলে। বিশাখার মনে হয়েছিল পারমিসিভ সোসাইটিতে বড় হয়ে ওঠা জয়ন্ত ব্যক্তিগত সুখ, আরাম, সেক্স, গার্ল-ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু ভাবে না। কিন্তু তারপর যতই তাকে দেখছে ততই ধারণা পাল্টে গেছে বিশাখার। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হবে জেনেও যেভাবে সাহস করে সে দীপার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে বা অনুরাধাদের সম্পর্কে কিছু করার কথা ভাবছে তাতে তাকে অসার আত্মকেন্দ্রিক একটি যুবক বলে মনে হয় না। মানুষ হিসেবে পৃথিবীর আরেক প্রান্তের দীপা এবং অনুরাধা সম্বন্ধে তার দায়িত্ববোধ বিশাখাকে মুগ্ধ করে। সে বলে, 'আমার বাবা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। তাঁর সঙ্গে আপনার কাকিমা আর খুড়তুতো ভাইয়ের ইনহেরিটান্সের বিষয়ে কথা বলতে পারেন।'

জয়ন্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'খুব ভাল হয়। কীভাবে ওঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

একটু চিন্তা করে বিশাখা বলে, 'শনিবার আপনাদের বাড়িতে হানা দেবার ব্যাপারটা মিটে যাক। তারপর একদিন সন্ধেবেলায় 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিস থেকে আপনাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। তখন বাবার সঙ্গে কথা বলে নেবেন।'

'ফাইন। থ্যাঙ্ক ইউ।'

ওরা বড় রাস্তায় পৌঁছে গিয়েছিল।

আজ ট্যাক্সির জন্য ছোটাছুটি করতে হয় না। স্ট্যান্ডে লাইন দিয়ে অনেকগুলো দাঁড়িয়ে আছে। বিশাখা একটা নিয়ে চলে যায়। জয়ন্তরা আরেকটায় উঠে পড়ে।

বউবাজারের দিকে যেতে যেতে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'বিশাখাকে কেমন দেখলে?'

ঝুমা জানালার বাইরে তাকিয়ে বিশাখার কথাই ভাবছিল। মুখ ফিরিয়ে বলে, 'ফায়ার ব্রান্ড—একেবারে আগুন।' একটু থেমে আবার বলে, 'এমন মেয়ে আগে আর আমি দেখিনি ছোটদা।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর জয়ন্ত হঠাৎ বলে, 'তোমার সঙ্গে বিশাখার আলাপ করিয়ে দিলাম কেন বল তো?'

ঝুমা বলে, 'ওই দীপার জন্যে আর—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বলে, 'সে তো আছেই। তা ছাড়া আরো একটা কারণ রয়েছে।'

'কী সেটা?'

'রাজাদার বন্ধুগুলো একেকটা স্কাউন্ড্রেল। রাস্তায় বেরুলে ওরা তোমাকে বিরক্ত করে। আমার মনে হয়েছে ওদের মতলব ভাল না। মাত্র ক'দিনের জন্যে এসেছি। আমি চলে যাবার পর রাসকেলগুলো যদি বাড়াবাড়ি করে, সোজা বিশাখার কাছে চলে আসবে। ও আর ওর 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড' তোমাকে ঠিক প্রোটেকশান দেবে।'

তক্ষুণি উত্তর দেয় না ঝুমা। কিছুক্ষণ বাদে বলে, 'ঠিক আছে, আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।'

'সবচেয়ে কী ভাল হয় জানো?'

'কী?'

'তুমি যদি 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর মেম্বার হয়ে যাও। তোমার পেছনে এতবড় একটা পাওয়ারফুল অর্গানাইজেশন আছে জানতে পারলে কেউ তোমাকে ডিসটার্ব করতে সাহস করবে না।'

ঝুমা উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'ঠিক বলেছ। এটা আমি ভেবে দেখব।'

অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলে না।

ট্যাক্সিটা যখন ওয়েলিংটন স্কোয়ার ছাড়িয়ে হিন্দ সিনেমার কাছে চলে এসেছে, ঝুমা চাপা গলায় ডাকে, 'ছোড়দা—'

জয়ন্ত কী ভাবছিল, একটু চমকে উঠে বলে, 'কিছু বলবে?'

ঝুমা তরল গলায় বলে, 'তোমার পছন্দ আছে।' তার দু চোখের স্বচ্ছ মণিতে কৌতুক নেচে যাচ্ছিল।

কিসের একটা গন্ধ পেয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কীরকম ?'

'কলকাতায় তিন দিন হল মোটে এসেছ। এরই ভেতর একটা ফ্যানটাস্টিক বিউটিফুল মেয়েকে খুঁজে বার করে তার কাঁধে এক এক করে দীপার, ছোট কাকিমার আর আমার দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চাইছ।'

'তা তো চাইছিই। প্রচুর দায়িত্ব নেবার মতো মেন্টাল স্ট্রেংথ ওর আছে।'

'তা হলে আরেকটা দায়িত্বও দাও না—'

'সেটা কী ?'

'সেটা তুমি।'

'ওরে বাবা, একটু আগে তুমি বলছিলে না বিশাখা ফায়ার ব্র্যান্ড। আমাকে মেরে ফেলবে।' বলতে বলতে গলার স্বরটা অনেকখানি নামিয়ে মজার ভঙ্গি করে, 'চেষ্টা করে দেখব নাকি ?'

ঝুমা হাসতে হাসতে বলে, 'নিশ্চয়ই দেখবে।'

জয়ন্তও হাসে।

একসময় ট্যাক্সি বউবাজারে পৌঁছে যায়।

এগার

সকালে আনন্দশেখর সরস্বতী ব্রেকফাস্ট খাইয়ে চলে যাবার পর পিসিমাদের গিফট প্যাকেটগুলো আর আত্মীয়স্বজনদের ছবিতে বোঝাই অ্যালবামটা জয়ন্ত যখন একটা বড় ব্যাগে গুছিয়ে নিচ্ছে, এ বাড়ির কাজের সেই মেয়েমানুষটা অর্থাৎ অন্নদা দৌড়ুতে দৌড়ুতে তার ঘরে চলে আসে। খানিকটা উত্তেজিতভাবে বলে, 'নতুন দাদাবাবু, বালিগঞ্জ থেকে পিসিমা গাড়ি পাঠিয়েচেন। ডেরাইভার আপনাকে ডাকচে।'

পিসিমা অর্থাৎ সবিতা যে গাড়ি পাঠাবেন, ভাবতে পারে নি জয়ন্ত। আজ সে বালিগঞ্জে যাবে, এটা আগেই ঠিক করা ছিল। কাল রাতে 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিস থেকে 'শান্তি ভবন'-এ ফিরে ঝুমাকে

বলেছে, আজ যেন সে তার সঙ্গে পিসিমাদের বাড়ি যায় কিন্তু ঝুমো রাজি হয়নি। কাল নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করে অনেকগুলো অনার্স ক্লাস নষ্ট হয়েছে। আজও চারটে ইমপর্টান্ট ক্লাস আছে। রোজ রোজ অ্যাবসেন্ট হলে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই আর জোরজার করেনি জয়ন্ত। ঠিকানা যখন আছে তখন পিসিমার বাড়িটা খুঁজে বার করতে অসুবিধা কী।

হঠাৎ জয়ন্তর মনে পড়ে যায়, তার আসার খবর পেয়েও সবিতা একবারও এ বাড়িতে আসেননি। তিনি অবশ্য খবর পাঠিয়েছিলেন, আর্থরাইটিসের ব্যথার জন্য আসা সম্ভব হয়নি। বড় জেঠিমা চারুলতা কিন্তু বিশ্বাস করেননি। খোঁচা দিয়ে বলেছেন, এ সব হল ছুতো, সবিতা ভাই এবং ভাই-বৌদের ঘেন্না করেন তাই কক্ষণো আসবেন না। হয়তো চারুলতার কথাই ঠিক।

যাই হোক, গাড়ি পাঠানোয় ভালই হয়েছে। জয়ন্তকে আর খোঁজা-খুঁজি করতে হবে না।

অনদা তাড়া লাগায়, 'তাড়াতাড়ি কর গো লতুন দাদাবাবু।'

ক্ষিপ্র হাতে ব্যাগ গুছনোর কাজটা শেষ করে সেটা হাতে ঝুলিয়ে জয়ন্ত বলে, 'হয়ে গেছে, চল এবার।'

একতলায় আসতে ঝুমা আর রাজলক্ষ্মী ছাড়া বাড়ির প্রায় সবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। বড় বারান্দায় চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজশেখর। অন্যরা কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। সবারই চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ। সবিতা নিজে না এসে গাড়ি পাঠানোয় কেউ যে খুশি হতে পারেনি তাদের কথাবার্তায় তা ফুটে উঠেছিল।

জয়ন্তকে দেখে চারুলতা বলে ওঠেন, 'কী বলেছিলাম, মিলে গেল তো! ঠাকুরঝিরা আমাদের ঘেন্না করে।'

এ কথার উত্তর দেওয়া জয়ন্তর পক্ষে সম্ভব না, সে চুপ করে থাকে।

রাজশেখর বলেন, 'যাচ্ছ যাও। পিসির বাড়ি আজ থেকে যেও না কিন্তু। কাল আমাদের সেই মিটিংটার কথা মনে আছে তো?'

জয়ন্ত মাথা হেলিয়ে জানায়—আছে। তারপর বারান্দা পেরিয়ে সামনের প্যাসেজ ধরে এগিয়ে যায়।

বাইরের খোলা জায়গাটায় একটা নতুন মডেলের ঝকঝকে জাপানি টোয়োটা দাঁড়িয়েছিল। তার পাশে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ধবধবে ইউনিফর্ম আর টুপি পরা স্মার্ট চেহারার শোফার। গাড়ি আর শোফারের দিকে তাকালেই বোঝা যায় পিসিদের আর্থিক স্টেটাসটা কী ধরনের।

জয়ন্তর সঙ্গে সঙ্গে রাজশেখররা কয়েকজন বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা সবাই বার বার কাটা রেকর্ড বাজানোর মতো একই কথা বলে যাচ্ছিলেন, যেভাবেই হোক যত রাতেই হোক, জয়ন্ত যেন 'শান্তি ভবন'-এ ফিরে আসে, ইত্যাদি।

শোফারটি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। জয়ন্তকে দেখামাত্র বুঝতে পারে সে তাকেই নিতে এসেছে। সসম্ভ্রমে সে গাড়ির দরজা খুলে বলে, 'বৈঠিয়ে—' জয়ন্ত উঠলে সে দরজা বন্ধ করে নিজের সিটে গিয়ে স্টার্ট দেয়।

রাজশেখররা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকেন।

আধ ঘন্টার ভেতর ওল্ড বালিগঞ্জে পেঁৗছে গেল জয়ন্ত।

জায়গাটা যে কলকাতার অভিজাত এলাকা, বুঝতে অসুবিধা হয় না। এখানকার অন্য সব বাড়ির মতোই পিসিমাদের বিশাল তেতলা বাড়িটা ঘিরেও অনেকটা জায়গা। সামনের দিকে ফুলের বাগান, টেনিস কোর্ট। পিছন দিকেও খানিকটা অংশে বাগান, বাকিটায় গ্যারাজ আর সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স। গ্যারাজে আরও তিনখানা ঝকঝকে গাড়ি দেখা যাচ্ছে।

পিসিমা অর্থাৎ সবিতারা যে বিরাট বড়লোক, এ বাড়িতে ঢুকে আরও ভালভাবে টের পাওয়া গেল। অবশ্য জয়ন্ত আগে থেকেই জানত, তার পিসেমশাই অমরেশ মিত্র একজন সফল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, তাঁদের অঢেল টাকা।

সবিতা এবং চারটি মেয়ে দোতলার ব্যালকনিতে বসে ছিল। মেয়েগুলোর বয়স আঠার উনিশের মতো। লণ্ডনে নিয়মিত ফোটো পাঠানোর কারণে ভারি থলথলে চেহারার সবিতাকে চিনতে অসুবিধা হয় না জয়ন্তর। সে জানে পিসিমার এক ছেলে এক মেয়ে—বুটান

আর রুমি। বুটানকে দেখা যাচ্ছে না। ওই চারটে মেয়ের ভেতর একজন নিশ্চয়ই রুমি কিন্তু বাকি তিনজন কারা ?

টেনিস কোর্টের গায়ে নুড়ির রাস্তায় শোফার গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল। জয়ন্ত নামতেই হই হই করতে করতে মেয়েরা নিচে চলে আসে। সবিতাও তাঁর বিপুল শরীর নিয়ে একরকম গড়াতে গড়াতে আসেন।

জয়ন্ত এক পলক মেয়ে চারটির দিকে তাকায়। দারুণ ঝকঝকে স্মার্ট চেহারা তাদের। সবার চুলই ছেলেদের মতো করে ছাঁটা। কারুর পরনে শর্টস আর স্পোর্টস গেঞ্জি, কারো মিডি বা জিনস আর শার্ট।

মেয়েদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে জয়ন্ত এবার ঝুঁকে সবিতাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি তার চিবুক ছুঁয়ে বলেন, বেঁচে থাক বাবা। এত্তটুকু দেখছিলাম আর এখন কত বড় হয়ে গেছিস।'

সবিতার চেহারায়, কথা বলার ভঙ্গিতে একটা আপন করা ব্যাপার আছে। মুহূর্তে তাঁকে ভাল লেগে যায়।

জয়ন্ত হেসে হেসে বলে, 'বা রে, কলকাতায় সেই ছেলেবেলায় এসেছিলাম। তারপর কত বছর কেটে গেছে বল তো? বড় হব না?' কাকিমা-জেঠিমাদের আপনি-টাপনি করে বললেও নিজের অজান্তেই সবিতাক তুমি করে বলে ফেলে সে।

সবিতা এবার সবচেয়ে ফর্সা মেয়েটাকে বলেন, 'কী রে, ছোটদাকে প্রণাম করলি না?'

পিসিমা না বলে দিলে রুমিকে চিনতে পারত না জয়ন্ত। সে ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, 'না, না, প্রণামের দরকার নেই।' আসলে কেউ তার পা ছুঁলে ভীষণ অস্বস্তি হয়।

রুমি নাক কুঁচকে মজাদার ভঙ্গি করে বলে, 'সেই ভাল, অতটুকু দাদাকে আবার প্রণাম-ট্রণাম কী!' বলে হেসে ওঠে।

অন্য মেয়েগুলোও হাসতে থাকে।

সবিতা ধমক লাগান, 'থাক থাক, বেশি ওস্তাদি করতে হবে না। বেশি পাকা হয়েছ।' তারপর অন্য মেয়ে তিনটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন—রিমা, বনি আর পলি। ওরা রুমির বন্ধু; একই কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে।

দ্রুত পরিচয়ের পালা চুকিয়ে সবিতা বলেন, 'চল বাবা, ওপরে যাই।'

সিঁড়ি দিয়ে সবাই দোতলায় উঠতে থাকে। আগে আগে উঠছেন সবিতা আর জয়ন্ত। পেছনে কল কল করতে করতে রুমি এবং তার বন্ধুরা। গলা নামিয়ে কে একজন বলে উঠল, 'দারুণ হ্যান্ডসাম রে তোর ছোটদা!' আরেকজন বলে, 'একেবারে ফিল্মের হিরো।'

শুনতে পেলেও মুখ ফেরায় না জয়ন্ত। নিরাসক্তভাবে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সবিতকে বলে, 'পিসেমশাইকে দেখছি না তো।'

সবিতা বলেন, 'তোর পিসে কতক্ষণ বাড়ি থাকে! আটটা বাজতে না বাজতেই হাওড়ায় ফ্যাক্টরিতে চলে যায়। ফিরতে ফিরতে রাত নটা সাড়ে ন'টা।'

'আর বুটান?'

'বুটান তো এখানে নেই।'

'তা হলে কোথায়?'

'দিল্লি স্কুল অব ইকনমিকসে ভর্তি হয়েছে। ছুটি না পড়লে আসতে পারে না।'

'ওর সঙ্গে এবার আর দেখা হল না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর জয়ন্ত বলে, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি একবার অন্তত বউবাজারে যাবে।'

সবিতা বলেন, 'কী করে যাই বল। আমার চেহারাটা তো দেখছিস। তার ওপর হাই প্রেসার, সুগার,। বাত সবসময় বুক ধড়ফড় করে।'

'বড় জেঠারা কিন্তু অন্য কথা বলছিল।'

'নিশ্চয়ই বলছিল আমি ইচ্ছে করেই যাইনি, আমার খুব দেমাক, আমি ওদের ঘেন্না করি—এই তো? ওদের মনগুলোই কুচুটে।'

জয়ন্ত হকচকিয়ে যায়। কলকাতা শহরের আরেক প্রান্তে থেকে ভাইদের মনস্তত্ত্ব ঠিক ধরে ফেলেছেন। ধরবেনই তো। শরীরে একই রক্তের ধারা বইছে যে। কী বলবে, জয়ন্ত ভেবে পায় না।

সবিতা এবার যা বলেন তাতে হাঁ হয়ে যেতে হয়, 'যতই কষ্ট হোক, একবার কি আর যেতে পারতাম না? নিশ্চয়ই পারতাম। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানিস বাবা, ওই খোঁয়াড়ে গেলে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কেউ কাউকে দেখতে পারে না, স্বার্থের জন্যে ওরা না পারে হেন কাজ নেই। এসব আমার একেবারেই পছন্দ হয় না। দূরে থাকাই ভাল।'

দোতলায় একটা দারুণ সাজোনো বিশাল ড্রইং রুমে নিয়ে আসেন সবিতা। চারিদিকে দামি দামি সোফা, সেন্টার টেবল, ডিভান, অ্যাকোয়েরিয়াম, টিভি, দেওয়ালে এয়ার-কুলার, মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন। ওদের সঙ্গে রুমিরাও আসে।

সবিতা জয়ন্তর হাতের ব্যাগটা দেখিয়ে বলেন, 'ওটায় কী আছে রে? তোর জামাকাপড় টাপড় এনেছিস?

জয়ন্ত বলে, 'না। মা-বাবা তোমাদের জন্য গিফট পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'সেজদা সেজবৌদি আবার এসব পাঠাতে গেল কেন?'

'সে তুমি তোমার দাদা-বৌদিকে চিঠি লিখে জেনে নিও।' বলে চারটে প্যাকেট ব্যাগ থেকে বার করে জয়ন্ত একটা দেয় রুমিকে, একটা সবিতাকে। বাকি দুটো অমরেশ আর বুটানের। সে দুটো একটা সোফায় রেখে বলে 'আমি তো জানতাম না রুমির তিনটি প্রেটি বান্ধবী আছে। জানলে ওদের জন্যেও গিফট নিয়ে আসতাম। ঠিক আছে, কলকাতা থেকেই ওদের গিফটের ব্যবস্থা করব।'

বনি রিমা আর পলি জোরে জোরে হাত এবং মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'না না, আমাদের কিছু চাই না।'

জয়ন্ত বলে, 'সে দেখা যাবে।'

সবিতা বলেন, 'বুটানের পাজামা-পাঞ্জাবি আছে। জামাপ্যান্ট ছেড়ে সেগুলো পরে আরাম করে বস বাবা।'

জয়ন্ত একটা সোফায় বসতে বসতে বলে, 'পরে চেঞ্জ করা যাবে।'

সবিতা একটা কাজের লোককে ডেকে চা এবং খাবার দেবার কথা বলতেই জয়ন্ত ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওনলি টি। আমি এখানে আসার ঠিক আগেই ব্রেকফাস্ট করেছি।'

[illegible] চা আনার কথা বলে সবিতা জয়ন্তর দিকে তাকান, '[illegible] বাপু জামাকাপড়গুলো নিয়ে এলে পারতিস।'

'মানে ?'

'কলকাতায় এলি, পিসির বাড়ি ক'দিন থাকবি না ? এক কাজ করি বরং, গাড়ি পাঠিয়ে তোর জামা-টামা আনিয়ে নিই।'

জয়ন্ত বলে, 'আজ থাক। আরো কিছুদিন তো কলকাতায় আছি। মাঝখানে এসে একদিন থেকে যাব।'

'একদিন নয়, অন্তত তিনটে দিন।'

'আচ্ছা, দেখি।'

সবিতা এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর সেজদা, সেজবৌদি এবং জয়া সম্পর্কে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করতে থাকেন।

চা এসে গিয়েছিল। খেতে খেতে পিসিমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে জয়ন্ত।

ওধারে রুমি ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। সে বলে, 'প্রতি মাসেই তো সেজ মামাদের চিঠি পাও। কে কেমন আছে সব তোমার জানা, তবু সেসব আবার জিজ্ঞেস করছ কেন ?

সবিতা বলে, 'কুড়ি দিন আগে শেষ চিঠি পেয়েছিলাম সেজদার। তার মধ্যে কত কিছু হয়ে থাকতে পারে। জিজ্ঞেস করতে হবে না ?'

'আমার বন্ধুরা ছোটদার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করবে বলে কলেজে পর্যন্ত যায়নি। ওকে এখন ছেড়ে দাও।'

সবিতা বলেন, 'না। ওর সঙ্গে অনেক দরকারি কথা আছে। তোর বন্ধুরা তো এক্ষুণি চলে যাচ্ছে না, দুপুরে খাবে। খাওয়া-দাওয়ার পর তোরা জয়ের সঙ্গে গল্প করিস।'

জয়ন্ত বলে, 'আমারও পিসির সঙ্গে কিছু কথা আছে। সেটা এখনই সেরে নিতে চাই।'

রুমি বেজার মুখে সবিতাকে বলে, 'অল রাইট। আমরা এখন অন্য ঘরে যাচ্ছি। যা বলাবলির দু'জনে কমপ্লিট করে নাও। লাঞ্চের পর ছোটদাকে চার ঘন্টার জন্যে আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তখন কিন্তু ডাকাডাকি করে ডিসটার্ব করতে পারবে না।'

সবিতা বলেন, 'ঠিক আছে বাবা, তাই হবে।'

রুমি তার বন্ধুদের নিয়ে চলে যায়।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। জয়ন্ত বলে, 'আগে তোমার আর্জেন্ট কথাটা বল পিসি।'

সবিতা আস্তে মাথা নাড়েন, 'না। তোর কথাটা আগে শুনে নিই।'

একটু হেসে জয়ন্ত বলে, 'আমরা বোধহয় একই বিষয়ে কথা বলব।'

সবিতাও হাসেন। বলেন, 'তাই হবে।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি এভাবে শুরু করেন, 'তোর বাবার শেষ যে চিঠিটা পেয়েছি তাতে লিখেছে তোকে পাওয়ার অফ অ্যাটার্নি দিয়ে পাঠাচ্ছে। কেন ওটা দিয়েছে জানিস?'

'বাবা বলেছেন, এখানকার প্রোপার্টির ব্যাপারে দুই জেঠামশায়, কাকা, ঠাকুমা, ছোটকাকীমা আর তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি যেন ডিসিশন নিই।'

'আমাকেও তাই জানিয়েছে সেজদা।'

'ও, তা-ই বুঝি?'

'তোর সঙ্গে বড়দা মেজদাদের কথা হয়েছে? জানতে পেরেছিস ওরা কী চায়?'

'না। কাল সকালে বাড়ির সবাই আমার সঙ্গে বসতে চায়। মনে হয় তখন সব জানতে পারব।'

একটু চুপচাপ। কিছু চিন্তা করে সবিতা বলেন, 'আমি একটা খবর পেয়েছি।'

'কী?'

'বড়দারা বউবাজারের বাড়ি প্রোমোটারদের কাছে বিক্রি করে দিতে চাইছে। ভেতরে ভেতরে দাম টাম নাকি ঠিক হয়ে আছে। কেউ তো কিছু করে না। সব অমানুষের দল। ঝুমা ছাড়া সবার ছেলেমেয়েগুলো হয়েছে বজ্জাতের ধাড়ি। লেখাপড়া শিখল না, চাকরি-বাকরি করে না। লোকে ওদের সম্বন্ধে যা বলে শুনলে লজ্জা হয়।'

অপদার্থ বংশধরেরা 'শান্তি ভবন' বিক্রি করে দিতে চাইছে, এতটা অধঃপতন ভাবতে পারেনি জয়ন্ত। সে বেশ অবাকই হয়ে যায়।

বলে, 'বাবার কাছে শুনেছি, যাদের ও বাড়িতে লেজিটিমেণ্ট শেয়ার আছে তাদের মতামত ছাড়া ওটা বেচা যাবে না।'

সবিতা বলেন, 'ঠিক বলেছে সেজদা।'

'তোমার ও বাড়িতে ভাগ নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'যদি বাড়ি বেচা ঠিক হয়, তুমি কী করবে?'

'যা খুশি ওরা করুক গে। আমার ভাগের দরকার নেই। ভগবান আমাকে যা দিয়েছে তাতেই আমি খুশি।'

জয়ন্ত যখন ভাবছে কী বলবে, সেই সময় সবিতা ফের বলেন, 'মাকে তো ওরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। এই স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়, আবার হয়তো দু'মাস চার মাস পর ফিরে আসে। ক'দিন আগে ঝুমা এসেছিল। ওর মুখে শুনলাম, মা কিছুই মনে করতে পারে না। মায়ের ভাগটা ওরাই কায়দা করে নিয়ে নেবে।'

জয়ন্ত বলে, 'তোমাকে একটা খবর দিই পিসি। পরশু রাত্তিরে ঠাকুমার স্মৃতি ফিরে এসেছে।'

'ও, তাই নাকি!' সবিতাকে খুশি দেখায়। তিনি বলেন, 'তোকে চিনতে পারল?'

'হ্যাঁ। চারটে মোহর দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছেন।'

'খুব ভাল। দ্যাখ এই স্মৃতিটা কতদিন থাকে!'

একটু ভেবে নিয়ে জয়ন্ত বলে, 'কিছু মনে কোরো না পিসি, একটা কথা বলছি।'

সবিতা বলেন, 'কী আবার মনে করব। তুই বল না—'

'ঠাকুমা ও বাড়িতে যেভাবে আছেন, দেখলে কষ্ট হয়। ঝুমা ছাড়া আর কেউ ওঁকে দ্যাখে না। সি ইজ ভেরি মাচ নেগলেক্টেড। বলছিলাম কি, তুমি যদি একবার ঠাকুমাকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে—' বলতে বলতে থেমে যায় জয়ন্ত।

সবিতা বলেন, 'কত বার মাকে আনতে গেছি জানিস? ভাইরা কিছুতেই ছাড়ল না। আমি আর কি করতে পারি?'

কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছিল তারা। জয়ন্ত বলে, 'ছোট কাকিমার ব্যাপারটা জানো?'

সবিতা বলেন, 'খুব জানি। ওকে তো তোর জেঠা-কাকারা বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। কিন্তু কত আর বয়েস অনুরাধার! সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ, একা একা কাটাবে কী করে? যদি আবার বিয়ে করে, অন্যায়টা কী?'

অবাক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ সবিতার দিকে তাকিয়ে থাকে জয়ন্ত। বিদ্যাসাগরের আমলে তাদের বংশে নাকি দারুণ প্রগতির হাওয়া বয়ে গিয়েছিল। সে শুনেছে তার পূর্বপুরুষরা কোমর বেঁধে নারী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি বড় বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় এসে এবার যা সে দেখছে তাতে এতদিনের সমস্ত ধারণা পাল্টে গেছে। জয়ন্ত ভেবেছিল, ভাইদের মতোই সবিতাও হবে মারাত্মক কনজারভেটিভ। তঁার মধ্যে এতটা উদারতা আশা করেনি সে।

মুগ্ধ, চমৎকৃত জয়ন্ত বলে, 'ঠিক বলছ পিসি। ছোট কাকিমার সঙ্গে আমি দেখা করেছি। বলেছি, ওঁর ডিসিশানটা কারেক্ট। যে ভদ্র-লোককে ছোট কাকিমা বিয়ে করবে তাঁর সঙ্গেও আলাপ করেছি। ডিসেন্ট পার্সন। তাছাড়া যার কাছ থেকে গোলমাল হওয়ার ভয় ছিল সেই বিল্লু ওঁকে ভীষণ পছন্দ করে। মনে হয়, ছোট কাকিমার সেকেন্ড ম্যারেজ সুখের হবে।'

সবিতা খুশি হন। বলেন, 'তা হলে তো খুবই ভাল হয়।' একটু চুপ করে থেকে ফের বলেন, 'আমার কী মনে হয় জানিস জয়?'

'কী?'

'দাদারা এই বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে ঘোঁট পাকিয়ে অনুরাধাকে ঠকাবে।'

'আবার বিয়ে করলে মেয়েরা আগের স্বামীর প্রোপার্টির শেয়ার পায় কিনা জানি না। তবে বিল্লু তার বাবার সম্পত্তি নিশ্চয়ই পেতে পারে।'

'তা তো পারেই। এরকম অবস্থায় একজন অ্যাডভোকেট কি ব্যারিস্টারের পরামর্শ নিতে পারলে ভাল হত।'

জয়ন্ত বলে, 'কলকাতায় আসার সময় প্লেনে একজন মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—কলেজে পড়ায়। তাছাড়া সোশাল অ্যাক্টিভিস্টও।

নাম বিশাখা পরেও তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওর বাবা অ্যাডভোকেট। বলেছে, বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে। ভাবছি, ছোট কাকিমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব।'

সবিতা বলেন, 'খুব ভাল।' তারপর হঠাৎ কী ভেবে জিজ্ঞেস করেন, 'তা হ্যাঁ রে জয়, মেয়েটার বয়েস কত?'

জয়ন্ত চকিত হয়ে ওঠে। বলে, 'কত আর—এই, এই টোয়েন্টি ফাইভ সিক্স।'

'তার মানে তরুণী।'

জয়ন্ত হাসে শুধু, কিছু বলে না।

সবিতাও এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করেন না।

খানিকটা চুপচাপ।

তারপর জয়ন্ত বলে, 'আমি চাই, ছোট কাকিমা পাক আর না-ই পাক, বিল্টু তার বাবার প্রোপার্টি পাক।'

সবিতাও সায় দেন, 'সে তো নিশ্চয়ই।'

জয়ন্ত এবার বলে, 'শান্তি-ভবন'-এ আরেকটা স্ক্যান্ডাল ঘটেছে। সেটা কি তুমি জানো?'

'কিসের স্ক্যান্ডাল?'

'দীপা বলে একটা মেয়ের কথা শুনেছ?'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ মনে করার চেষ্টা করেন সবিতা। তারপর বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঝুমার কাছে নামটা শুনেছিলাম যেন।'

সমস্যাটা তাকে আর রানাদাকে নিয়ে।'

'কী করেছে ওরা?'

দীপাদের সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বলে যায় জয়ন্ত।

শোনার পর অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন সবিতা। একসময় বলেন, 'এত সব কাণ্ড ঘটেছে, কই ঝুমা তো আমাকে কিছুই বলেনি। ও তো মাঝে মাঝেই এ বাড়িতে আসে।'

'বোধহয় লজ্জায় বলতে পারেনি।'

'তাই হবে। হ্যাঁ রে জয়, ওদের 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড' না কী যেন বললি, তার মেম্বাররা বাড়িটা সত্যিই ঘেরাও করবে?'

'তাই তো মনে হয়।' নিজে যে বিশাখাদের সঙ্গে মিছিল করে

নিজের পূর্বপুরুষের বাড়িতে হানা দেবে, সেটা আর বলে না জয়ন্ত।

বিষণ্ন মুখে সবিতা বলেন, 'এতবড় একটা বংশ, একেবারে ছারেখারে গেল। ওদের জন্যে আর লোকের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। ছি।' অদ্ভুত গ্লানিতে তাঁর কণ্ঠস্বর শেষ দিকে বুজে আসে।

জয়ন্ত বলে, 'পিসি, আমার ধারণা, যদি সত্যি সত্যিই জেঠামশাইরা বাড়ি বিক্রির ডিসিশান নিয়ে থাকেন, আমাদের সবার কনসেন্ট ওঁদের নিতে হবে। আমি যতদূর জানি সকলে একমত না হলে জয়েন্ট প্রোপার্টি বিক্রি করা যায় না।'

'ঠিকই জানিস।'

'তা হলে আমার একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে।'

'কী কথা?'

'শান্তি-ভবন'-এর ব্যাপারে তুমি ইনডিফারেন্ট, মানে মানে—' সঠিক বাংলা শব্দটা মনে করতে না পারায় অস্বস্তি বোধ করতে থাকে জয়ন্ত।

সবিতা বলেন, 'ইনডিফারেন্ট মানে উদাসীন—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি উদাসীন থাকতে পার না। তুমি বলবে যদি দীপাকে মর্যাদা দিয়ে বাড়ির বউ করে না নেওয়া হয় আর বিল্লু তার বাবার প্রোপার্টির ভাগ না পায়, সম্পত্তি বিক্রিতে তুমি রাজি হবে না।'

'কিন্তু—'

সবিতাকে শেষ করতে না দিয়ে জয়ন্ত বলে, 'ও বাড়ির নোংরা ব্যাপারে তুমি নিজেকে জড়াতে চাও না—এই তো?'

সবিতা আস্তে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ।'

পিসিমার দু'হাত ধরে জয়ন্ত বলতে থাকে, 'এড়িয়ে গেলে চলবে না। তুমি তোমার এক মাইনর ভাইপোর আর একটা দুঃখী মেয়ের জন্যে এটুকু করবে না?'

সবিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'ক'দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছিস। কেন তুই এ সব জঘন্য ব্যাপারে নিজেকে জড়াচ্ছিস বাবা? তার চেয়ে আমার এখানে চলে আয়। যে ক'টা দিন

আছিস রুমি আর তার বন্ধুদের সঙ্গে হই হই করে কাটিয়ে দে। মাঝে মাঝে ঝুমা আর বিল্লুকেও নিয়ে আসা যাবে।'

জয়ন্ত বলে, 'তোমার এখানে এসে তো থাকতেই পারি। কিন্তু পিসি, দীপাদের প্রবলেমগুলো যখন জানতেই পেরেছি তখন এসকেপিস্টদের মতো পালিয়ে আসব না, তোমাকেও ইনডিফারেন্ট থাকতে দেব না।'

সবিতা হঠাৎ অনুভব করেন তাঁর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো কিছু বইতে শুরু করেছে। তাঁর এই ভাইপোটি এদেশে থাকে না, এখানকার সিটিজেনও নয়, পশ্চিম বাংলার লোকজনের সমস্যা নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কারণও ছিল না, কিন্তু একজন সৎ মানুষ হিসেবে দীপাদের দায়িত্ব নিজের থেকে কাঁধে তুলে নিয়েছে: আর তিনি কিনা এই শহরে থেকেও অসহায় বিপন্ন দীপার জন্য একটা আঙুল তুলবেন না? ঝঞ্ঝাট আর অশান্তির ভয়ে অনুরাধাদের ব্যাপারটা নিয়ে একটি কথাও বলবেন না? অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিতে আজন্ম মানুষ তাঁর ভাইপোটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তাঁর সঠিক কর্তব্যটা কী।

উদ্দীপ্ত সুরে সবিতা বলেন, 'ঠিক আছে, তুই যখন অতদূর থেকে এসে দীপাদের জন্যে এতটা এগিয়ে গেছিস, আমাকেও কিছু একটা করতে হবে। বড়দাদের একসময় কথায় কথায় জানিয়ে দিয়েছিলাম, 'শান্তি-ভবন-এর ভাগ চাই না। কিন্তু ওরা যদি দীপাদের ব্যাপারটা ভালভাবে মিটিয়ে না নেয়, বাড়ি বিক্রির সময় অবজেকশন দেব। বাড়ি ছাড়া তো আর কিছুই নেই ওদের, ওটা বেচতে না পারলে খুব বিপদে পড়ে যাবে।' প্রেসার দিয়ে দীপা আর অনুরাধারার সমস্যা সমাধানের এটাই ঠিক সময়। আজই বড়দাদের ফোন করে বলব—'

জয়ন্ত তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'না না, আজ ফোন করতে হবে না। কাল বড় জেঠাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝি ওদের আসল মতলবটা কী। তারপর তোমাকে ফোন করে জানাব কী করতে হবে।'

'সেই ভাল।'

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর জয়ন্ত রুমি আর তার তিন বন্ধুর দখলে চলে গেল জয়ন্ত।

একবারে ডাইনিং রুম থেকে রুমিরা তাকে নিয়ে যায় দারুণ সাজানো একটা ঘরে। এখানে স্টিরিও, টু-ইন-ওয়ান, টিভি, ভিসি আর—কী নেই? আর আছে বিশাল ক্যাবিনেট বোঝাই হিন্দি আর ইংরেজি ফিল্মের অগুনতি ক্যাসেট।

রুমি বলে, 'রেস্ট নিতে নিতে গল্প করা যাক, কী বল ছোটদা?'

জয়ন্তকে ঘিরে বিরাট বিরাট আরামদায়ক সোফায় কেউ কাত হয়ে, কেউ আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে পড়ে সবাই।

রুমি বলে, 'রিমা, পলি আর বনি আমার দারুণ বন্ধু।

একটু হেসে জয়ন্ত বলে, 'তা তো বুঝতেই পারছি।'

'তুমি লন্ডন থেকে আসছ শুনে লাফাতে শুরু করেছিল। বলেছিল তুমি আমাদের বাড়িতে যেদিন আসবে তার আগে ভাগেই যেন ওদের খবরটা দিই।'

'ওরা তো আমাকে আগে কখনও দ্যাখেইনি। লাফাতে শুরু করল যে?'

রুমির বন্ধুরা চকচকে চোখে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে ছিল। কারুর চোখের পাতা পড়ছিল না। রিমা বলে, 'বা রে, রুমির কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি না! আপনার কত ফোটো দেখেছি।' তার কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত এক সুরেলা ম্যাজিক রয়েছে।

জয়ন্ত বলে, 'ও, আচ্ছা।'

পলি বাঁ পাশের একটা সোফায় বসে ছিল। তার চোখের মণি নীলাভ, অনেকটা অভারতীয়দের মতো। দানাওলা খসখসে গলায় সে বলে, 'আজ আমাদের অনার্সের দুটো ক্লাস ছিল। আপনার জন্যে কলেজ যাইনি, সকাল থেকে রুমিদের বাড়ি এসে বসে আছি।'

এই খবরটা আগেই জানা হয়ে গেছে জয়ন্তর। সে বলে, 'ইট'স আ গ্রেট অনার ফর মি। কিন্তু—তুমি করে বলব, না আপনি করে?'

রুমির বন্ধুরা গলা মিলিয়ে হই হই করে ওঠে, 'তুমি করে। আর পারমিশন পেলে আমরাও তুমি বলতে পারি।'

মেয়েগুলো ভীষণ স্মার্ট। জয়ন্ত হেসে হেসে বলে, 'গ্ল্যাডলি পারমিশান দিলাম। ক্লাস যে করলে না, তাতে তো ক্ষতি হবে।'

বনি তার বন্ধুদের মতো ফর্সা নয়। তার টান টান ত্বকের শ্যামল

রথয়ে দারুণ একটা চর্ম রয়েছে। নাকমুখ কাটা কাটা, সামান্য খাঁজ-ওলা চিবুক, নিটোল গ্রীবা, সরু কোমর, ওল্টানো তানপুরার মতো কোমরের নিচের অববাহিকা, সুদৃঢ় মাংসল স্তন এবং ঘন পালকে-ঘেরা দুই চোখের গভীর দূরপ্রসারী চাউনি—সব কিছুর মধ্যে যা মেশানো রয়েছে তার নাম 'সেক্স'।

বনি বলে, 'তোমার কোম্পানি পাচ্ছি, তাতেই সব ক্ষতির কমপেন-সেশন হয়ে যাবে।'

জয়ন্ত বউবাজারে, টালিগঞ্জে কিংবা 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিসে যে কলকাতাকে দেখেছে তার সঙ্গে ওল্ড বালিগঞ্জে রুমিদের এই কলকাতার আদৌ মিল নেই। বনি যা বলল, এতটা স্মার্টনেস জয়ন্ত আসা করেনি। বলে, 'থ্যাঙ্ক য়ু ভেরি মাচ। আই ফিল ফ্ল্যাটার্ড।'

এরপর লণ্ডন নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। শুধু লণ্ডনই না, প্যারিস, বার্লিন, রোম, কোপেনহেগেন, প্রাহা, জেনেভা, স্টকহোম ইত্যাদি নানা শহর সম্পর্কে বনিদের প্রচণ্ড আগ্রহ। সে সব যেন তাদের কাছে কোনও অলীক স্বপ্নের দেশ।

পলি জিজ্ঞেস করে, 'তুমি ওই সব জায়গায় গেছ ?'

জয়ন্ত বলে, 'যাব না কেন ? উইক-এন্ডে উইক-এণ্ডে কি কয়েক দিন ছুটি নিয়ে লণ্ডনাররা কোথায় কোথায় চলে যায়। আবার রোম-বার্লিনের লোকেরা লণ্ডনে আসে। হোল ইউরোপের লোক এক কাণ্ট্রি থেকে আরেক কাণ্ট্রিতে এভাবে ঘুরে বেড়ায়।'

বনি বলে, 'ইস, আমরা যদি ব্রিটিশ কি জার্মান সিটিজেন হতে পারতাম।

জয়ন্ত বুঝতে পারে, এই মেয়েরা কলকাতায় পড়ে থাকলেও তাদের মন চলে গেছে জার্মানি, ইংলন্ড, ফ্রান্স কিংবা আমেরিকা বা কানাডায়। সে কোনও উত্তর দেয় না।

পলি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'কলকাতা কেমন লাগছে ?'

জয়ন্ত বলে, 'কেন ভালই তো।'

'আমাদের খুশি করতে হবে না। এটা হচ্ছে ডার্টিয়েস্ট সিটি অফ দা ওয়ার্ল্ড। রাস্তায় গারবেজের পাহাড়, ট্রাফিক জ্যাম, মিছিল, আমাদের দাবি, পট-হোলস, লোড-শেডিং—ইট'স নো সিটি, আ

হেল। ক্যালকাটা ইজ ফিনিশড। লণ্ডন থেকে কেউ এসে যদি কলকাতাকে প্রেইজ করে, বলব হয় সে লায়ার, নইলে ভদ্রতা করছে।'

রুমিরা সায় দিয়ে বলে, 'কারেক্ট, কারেক্ট—'

কলকাতায় আজন্ম কাটিয়েও এই শহরের ওপর বিরূপ এমন বেশ কিছু মানুষ কাঁদিনে দেখেছে জয়ন্ত কিন্তু রুমিদের মত নিজেদের শহরকে এত ঘৃণা করতে আর কাউকে দেখেনি। সে বলে, 'বাইরেটা নোংরা হলেও কলকাতার কিন্তু লাইফ আছে। এখানকার মানুষ অন্যের সম্বন্ধে অ্যাপেথেটিক নয়, কেউ বিপদে পড়লে অল-আউট সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে। এই ফিলিংটা ইউরোপে আমেরিকায় দেখা যায় না বললেই হয়। ওখানে যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, টোটালি মেকানিকাল। এখানে হিউম্যান ভ্যালুজগুলো এখনও কিছু কিছু টিকে আছে। এটা উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়।' বলতে বলতে তার চোখের সামনে বার বার বিশাখার মুখটা অদৃশ্য কোনও পর্দায় যেন ভেসে উঠছিল।

এমন ভারী ভারী, গম্ভীর ধরনের কথা ভাল লাগছিল না রুমি এবং তার বন্ধুদের। পলি বলে, 'আমাদের জন্ম কলকাতায়। এই শহরটাকে আমরা ভাল করেই জানি। দারুণ দারুণ কথা বললেই আমাদের ধারণা পাল্টে যাবে ব্যাপারটা এত সোজা নয়। কলকাতাকে বাদ দাও, লণ্ডনের কথা বল।'

'সে তো আগেই বললাম।'

বনি ডান পাশ থেকে বলে, 'ধুস, ওখানে ক'টা মিউজিয়াম আছে, ক'টা থিয়েটার হল, হিথ্রো এয়ারপোর্টটা কত বড়, শপিং প্লাজাগুলোতে কিরকম ভিড় হয়, সারা বছর ধরে পৃথিবীর সব কণ্টিনেন্ট থেকে কত লক্ষ টুরিস্ট আসে—শুধু এ সব জানলেই চলবে?'

একটু অবাক হয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে কী জানতে চাও?'

'আসল খবরটা।' *বনির চোখের পাতা নাচতে থাকে, ঠোঁটের ওপর* সূক্ষ্ম আক্রমণাত্মক একটু হাসি ফুটে ওঠে।

কিসের একটা সঙ্কেত পেয়ে ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে যায় জয়ন্ত। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে রুমি রিমা এবং পলির মুখেও একই

ধরনের হাসি। তারা নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে কী যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে। অর্থাৎ চার তরুণী হয়তো আগে থেকেই তার বিরুদ্ধে কিছু একটা ষড়যন্ত্র করে রেখেছে। এবার ওরা তাকে ফাঁদে ফেলবে।

জয়ন্ত বলে, 'আসল খবর বলতে?'

পলি বলে, 'লণ্ডনে নাকি ইয়াং বয় আর ইয়াং গার্লরা খুব ডেটিং করে?'

রুমি পিসতুতো হলেও বোন তো। তার সামনে এরকম একটা প্রশ্নে জয়ন্ত একটু অস্বস্তি বোধ করে। সে ইংলণ্ডের খোলামেলা পারমিসিভ সোসাইটিতে জন্মেছে, বড় হয়েছে, সেখানে সেক্সের ফ্রি মার্কেটে অবিবাহিত যুবক যুবতী দৈহিক সম্পর্ক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সিটিজেন হলেও বাঙালি সংস্কার বা মেয়ে-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সম্পর্কে বাঙালি ধ্যানধারণা থেকে পুরো-পুরি মুক্ত হতে পারেনি জয়ন্ত, তার কারণ তার মা-বাবা। তাঁরা তাঁদের দুই সন্তানের মধ্যে বাঙালিয়ানার খানিকটা উত্তরাধিকার পৌঁছে দিয়েছেন। ভাইবোনদের ভেতর সেক্স টেক্স নিয়ে আলোচনা করাটা জয়ন্ত পছন্দ করে না।

দ্বিধান্বিত মুখে জয়ন্ত বলে, 'হ্যাঁ, তা করে। ইউরোপ আমেরিকায় এসব চলে। ওদের সোসাইটিটা অন্যরকম।'

রিমা বলে, 'আচ্ছা—'

জয়ন্ত তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে রিমা গলা নামিয়ে বলে, 'তোমার ক'জন গার্ল ফ্রেণ্ড আছে?'

রিমাকে তো বটেই, চকিতে বাকি তিন জনকেও লক্ষ করে জয়ন্ত। ওরা চোখ কুঁচকে, ঠোঁট টিপে হাসছে। কার কাছে যেন সে শুনেছিল ভারতবর্ষ বড় বেশি কনজারভেটিভ, অনাত্মীয় যুবক যুবতীর সম্পর্ক নিয়ে এখানে ভীষণ কড়াকড়ি বলে এদেশের ছেলেমেয়েরা নাকি ভয়ঙ্কর সেক্স-স্টার্ভড, তাদের অবদমিত যৌন ক্ষুধা একেবারে বিস্ফো-রণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা যে পুরোপুরি উড়িয়ে দেবার নয়, রিমাদের দেখে তাই মনে হচ্ছে।

ঘনিষ্ঠ ব্রিটিশ বান্ধবী জয়ন্তর বেশ কয়েকজনই আছে। প্রথমটা সে

ভেবেছিল পিসতুতো বোন এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবে না। এখন ভেবে দেখল, ওদের যদি সঙ্কোচ না থাকে তারই বা অস্বস্তি কিসের। যা সত্যি তা গোপন করবে না, শালীনতা বজায় রেখে সবই বলবে।

জয়ন্ত হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ফাইভ—বলেই তার খেয়াল হয় এরপর কী ধরনের অনিবার্য প্রশ্নটা আসতে পারে। সে অপেক্ষা করতে থাকে।

রিমা চোখের মণি আধবোজা করে বলে, 'তাদের সঙ্গে ডেটিং করো ?'

'ও দেশের যখন এটা নিয়ম তখন করতেই হয়। মাঝে মাঝে গার্ল ফ্রেন্ডদের নিয়ে রোম কি প্যারিসেও চলে যাই।' রোম প্যারিসে যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক নয়। ওটা ইচ্ছা করেই বলেছে জয়ন্ত, শুধুমাত্র মেয়েগুলোর প্রতিক্রিয়া কী হয় তা লক্ষ্য করতে। অবশ্য ইংলন্ডের নানা জায়গায় যে যায় সেটা মিথ্যে নয়।

রিমাদের চোখেমুখে অতৃপ্ত লোলুপতা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। জয়ন্তর মনে হয় যে জিনিস যত চাপাচুপি ঢাকাঢাকি করে রাখা হবে সেটা ঢাকনা ভেঙে চুরমার করে ততই বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করবে।

বনি বলে, 'বেশ আছ তোমরা।'

জয়ন্ত বলে, 'তা আছি।'

পলি বলে, 'শুনেছি ওদেশে নাকি বিয়ের আগে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গেও থাকে মানে লিভিং টুগেদার।'

'থাকে তো। লিভিং টুগেদারটা ওদের সোসাইটিতে নর্মাল ব্যাপার।'

'তুমিও সেরকম কিছু করছ নাকি ?'

ইচ্ছা করলে এই মেয়েগুলোকে আরও নাচানো যায়, তাদের চাপা যৌন আবেগকে উসকে উসকে তাতিয়ে তোলা যায় কিন্তু সেরকম জঘন্য মানসিকতা বা রুচি কোনওটাই নেই জয়ন্তর। বন্ধুবান্ধব ছাড়া এ জাতীয় আলোচনা করতেও তার ভীষণ খারাপ লাগে।

জয়ন্ত বলে, 'সে সব জেনে কী হবে ?' বলতে বলতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'এবার আমাকে উঠতে হচ্ছে।'

রুমি বলে, 'সে কী, এখন যাবে মানে! মাকে বললাম না, সারা দুপুর আমাদের সঙ্গে তুমি থাকবে। তোমার জন্য আমরা কত প্রোগ্রাম করেছি জানো?'

'কিসের প্রোগ্রাম?'

'মাইকেল জ্যাকসন আর টিনা টার্নারের গানের সঙ্গে আমরা সবাই নাচব, রাত্তিরে পার্ক স্ট্রিটে এক রেস্তোরাঁয় ডিনার খাব, তারপর তোমাকে বউবাজারে পেঁছে দিয়ে আসব।'

জয়ন্ত বলে, 'প্লিজ, কিছু মনে করো না, আমাকে এখন যেতেই হবে। আর্জেন্ট একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে চারটের সময়।'

'আটার লাই। বানিয়ে বানিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্টটার কথা বলছ।'

ওটা যে ডাহা মিথ্যে জয়ন্তর চেয়ে কে আর ভাল জানে! কিন্তু এছাড়া রুমিদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। গলায় সবটুকু জোর দিয়ে সে বলে, 'বিশ্বাস করো, 'সত্যিই আমার জন্যে একজন ওয়েট করবে।' বলতে বলতে উঠে পড়ে।

রুমি এবং তার বন্ধুদের রীতিমত হতাশ দেখায়। রুমি বলে, 'তা হলে আমাদের প্রোগ্রামগুলোর কী হবে?'

'সে আরেকদিন দেখা যাবে।'

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ।'

জয়ন্ত আর দাঁড়ায় না। রুমিদের বাড়ি থেকে বেরুবার আগে অবশ্য সবিতার সঙ্গে দেখা করে।

সবিতা বলেন, 'ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি তুই যেখানে যাবি, পেঁছে দিয়ে আসবে '

জয়ন্ত বলে, 'না না দরকার নেই।'

বার

পরদিন সকাল ন'টায় 'শান্তি ভবন'-এর একতলার ড্রইং রুমে পারিবারিক সম্মেলন শুরু হয়।

বড় জেঠারা কাল সকাল থেকেই ভীষণ টেনশানে ছিলেন। আটটা বাজতে না বাজতেই একে একে রাজশেখর, আনন্দশেখর, শশিশেখর,

সরস্বতী, চারুলতা এবং মনোরমা বসার ঘরে আসতে শুরু করেছিলেন। সবার শেষে পৌনে ন'টা নাগাদ রাজলক্ষ্মীকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল জয়ন্ত। অর্থাৎ তিন জেনারেশনের সব রিপ্রেজেন্টেটিভ এখন হাজির।

কাল রাতে ঠাকুমার ব্যাপারটা নিয়ে বড় জেঠাদের সঙ্গে একটু গোলমাল হয়েছিল জয়ন্তর। রাজশেখররা চাইছিলেন না রাজলক্ষ্মী আলোচনার সময় থাকুন। তাঁরা বোঝাতে চেয়েছিলেন, ঠাকুমার স্মৃতি মাঝে মাঝেই নষ্ট হয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নন, তাঁর থাকা না-থাকা সমান। কিন্তু জয়ন্ত জেঠাদের কথায় সায় দেয়নি। সে জেদই ধরেছিল, ঠাকুমা শুধু আলোচনার সময় থাকবেনই না, যদি বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কথাবার্তা হয় তাঁর মতামত শুনতে হবে। রাজশেখররা বিরক্ত হয়েছিলেন কিন্তু জয়ন্তকে অনমনীয় দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁর কথায় রাজি হতে হয়েছিল।

একটা পুরনো আমলের আধভাঙা শ্বেত পাথরের গোল টেবলকে ঘিরে সবাই বসেছে।

রাজশেখর গলা খাকরে এভাবে আরম্ভ করেন, 'বাবা জয়, ক'দিন হল তুমি কলকাতায় এসেছ এর মধ্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমরা সুখে নেই, চরম আর্থিক দুর্গতির ভেতর আমাদের দিন কাটছে। আমার চাকরি নেই, আনন্দ মার্চেণ্ট অফিসে ছোটখাট কাজ করে। শশি একটা ফ্যাক্টরিতে ফোরম্যান ছিল, মাইনে টাইনে ভালই পেত, বছর চারেক আগে কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর থেকে ও বসে আছে। রাজা আর রানার খবর তো জানোই। আরেকটা ব্যাপার তোমাকে আগে বলিনি। কর্পোরেশনের ট্যাক্স হাজার হাজার টাকা বাকি পড়েছে, আদায়ের জন্যে তাগাদা মেরে মেরে ওরা পাগলা করে ফেলছে। নেহাত আমাদের পুরনো বনেদি বংশ, তাই আর লিগাল স্টেপটা নেয়নি। আর কিছুদিন হয়তো দেখবে, তারপর এই 'ভবন' নীলামে চড়িয়ে ওদের প্রাপ্য আদায় করে নেবে।' বলে কিছুক্ষণ থেমে জয়ন্তর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকেন।

জয়ন্ত উত্তর দেয় না।

রাজশেখর ফের ধীরে ধীরে বলেন, 'বাবা জয়, আমাদের কোনো

কোনো সঞ্চয় নেই। সম্বল বলতে, এই বাড়িটা। পূর্বপুরুষের এই 'শান্তি ভবন' না বিক্রি করলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। জানি আমরা দত্ত বংশের কুসন্তান, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো রাস্তা আমাদের সামনে খোলা নেই। তুমি জানো, জয়েণ্ট প্রোপার্টি বেচতে হলে সব ভাগিদারেরই কনসেন্ট চাই। সূর্য তো তোমাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে পাঠিয়েছে। আমার বিশ্বাস, অসহায় জেঠা-কাকাদের অবস্থা বিবেচনা করে তুমি এই বিক্রিতে রাজি হবে।'

জয়ন্ত যা ভেবেছিল এবং সবিতা কানাঘুষোয় যা শুনেছিলেন, দেখা যাচ্ছে, সেটাই ঠিক। রাজশেখররা 'শান্তি ভবন' বিক্রির জন্য মনস্থির করে ফেলেছেন। জয়ন্ত কিছু না বলে তাকিয়ে থাকে।

রাজশেখর থামেন নি, 'তোমার কাছে আমাদের একটা আর্জি আছে বাবা—'

জয় ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে যায়। বলে, 'কিসের আর্জি ?'

'তোমার কাছে আমরা একটা জিনিস চাই।'

জয়ন্ত উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

রাজশেখর বলেন, ঈশ্বর দুহাতে তোমাদের ঢেলে দিয়েছেন। তাঁর করুণায় তোমাদের কোনোরকম অভাব নেই। এ বাড়ি বিক্রি হলে তোমরা হয়তো লাখ, তিন সাড়ে তিন পাবে। ওটা যদি গরিব কাকা-জেঠাদের দিয়ে দাও ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।'

'তার আগে আমার কিছু জানার আছে।'

রাজশেখর শশব্যস্তে বলে ওঠেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কী জানতে চাও বলো।'

জয়ন্ত বলে, 'আমরা এখানে যারা আছি তারা ছাড়াও এ বাড়ির আরও কয়েকজন ভাগিদার আছেন। যেমন পিসি আর ছোট কাকিমা আপনারা তাঁদের ডাকেননি কেন ? বাড়ি বিক্রি করতে হলে তাঁদের মতামতও খুব জরুরি।'

প্রথমটা হকচকিয়ে যান রাজশেখর। তারপর খানিকটা সামলে নিয়ে বলেন, 'সবিতা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে 'শান্তি-ভবন এর ভাগ তার চাই না। বাড়ি বিক্রির ডিসিশান যখনই নেওয়া হবে সঙ্গে সঙ্গে সে তার কনসেন্ট দিয়ে দেবে। আর ওই দুশ্চরিত্র মেয়েমানুষটা—

চন্দ্রের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল—তার কোনওরকম রাইটই নেই এ বাড়ির ওপর।' বলতে বলতে চোখের তারা জ্বলতে থাকে রাজশেখরের।

চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রশেখর জয়ন্তর মৃত ছোট কাকা। জয়ন্ত বলে, 'কেন? তিনি এ বাড়ির পুত্রবধূ নন?'

'পুত্রবধূ ছিল। লুজ ক্যারেক্টারের মেয়েমানুষটা এখন আরেকটা লোককে বিয়ে করতে চলেছে। এই অবস্থায় কীভাবে তার 'শান্তি ভবন'-এর ওপর অধিকার থাকে?

'বিয়েটা তো এখনও করেননি।'

'না করে থাকলেও খুব তাড়াতাড়িই করবে।'

আনন্দশেখর এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার আস্তে আস্তে বলেন, 'আমরা কেউ চাই না, অনুরাধা এ বাড়ির একটা কাঠের টুকরোও পাক। তাতে চন্দ্রর আত্মার অসম্মান হবে।'

জয়ন্ত বলে, 'ছোট কাকিমা যদি সত্যি সত্যিই আবার বিয়ে করেন লিগালি তিনি তাঁর আগের স্বামীর প্রোপার্টি পাবেন কিনা আমার জানা নেই, তবে মরালি তিনি তা দাবি করবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু বিল্লু? তাকে ডিপ্রাইভ করা হবে কোন অজুহাতে?'

আনন্দশেখর এবার থতিয়ে যান, 'না মানে, বিল্লু তো ওর মায়ের সঙ্গে তার নতুন স্বামীর বাড়িতে থাকবে। 'শান্তি ভবন'-এর সঙ্গে তাদের সম্পর্কই যখন নষ্ট হয়ে গেছে তখন আর ভাগ চাইতে আসবে না। ও নিয়ে তুমি ভেবো না।'

জয়ন্ত নীরস গম্ভীর গলায় বলে, 'চাক বা না চাক, বিল্লুকে অন্তত বঞ্চিত করা চলবে না। আর বড় জেঠা পিসির সম্পর্কে একটু আগে বললেন তিনি নাকি বাড়ির ভাগ নেবেন না, 'শান্তি ভবন' বিক্রি হলে তাঁর আপত্তি নেই। কাল পিসির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। দু'টি শর্তে বাড়ি বিক্রিতে মত দেবেন বলেছেন।'

রাজশেখর ওপাশে চকিত হয়ে ওঠেন, শর্ত! সে আবার কী? আগে তো কখনও শর্ত টর্তর কথা তোলেনি সবিতা!'

খুব ঠাণ্ডা গলায় জয়ন্ত বলে,'আগে অনেক কিছু জানতেন না বলে তোলেন নি।'

'কী জেনেছে সে?' প্রায় চেঁচিয়েই ওঠেন রাজশেখর।

তাঁর প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জয়ন্ত বলে, 'পিসি যা শর্ত দিয়েছেন, আমিও সেই শর্তই দিচ্ছি। যদি মানেন আপনারা মেনে নেন, বাড়ি বিক্রিতে রাজি হব, আমাদের শেয়ারও আপনাদের দিয়ে দেব।'

সবার প্রতিনিধি হিসেবেই যেন রাজশেখর রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেন, 'কী শর্ত তোমাদের ?'

'এক, বিল্লুকে তার বাবার শেয়ার দিতে হবে। দুই—' বলে সবার মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে নিয়ে যায় জয়ন্ত।

অধীর গলায় রাজশেখর জানতে চান, 'দু নম্বর শর্তটা কী ?'

'দীপা নামের সেই মেয়েটা যাকে আপনারা মারতে মারতে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন সে এখন প্রেগনান্ট, আর তার জন্যে দায়ী রানাদা—'

গলার শিরা ছিঁড়ে চিৎকার করে ওঠেন রাজশেখর, 'মিথ্যে, মিথ্যে। ষড়যন্ত্র করে আমাদের ফাঁসাবার চেষ্টা হচ্ছে।'

ঠাকুমা ছাড়া রাজশেখরের সঙ্গে বাকি সবাই গলা মিলিয়ে চেঁচাতে থাকেন।

জয়ন্ত কারুর কথার উত্তর দেয় না।

রাজশেখর কণ্ঠস্বর আরও কয়েক পর্দা চড়িয়ে বলেন, 'দীপা যে প্রেগনান্ট এ কথা কে বলেছে তোমাকে ?'

জয়ন্ত বলে, 'দীপা নিজে।'

'তাকে তুমি পেলে কোথায় ?'

'পেয়ে গেলাম।'

চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে রাজশেখরের। চোখ এবং কপাল কুঁচকে তিনি বলেন, 'এটা নিশ্চয়ই ঝুমার কাজ। সে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দীপার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা একেবারে লক্ষ্মীছাড়া, বাপ-জেঠার মুখ কীভাবে ডোবাবে, সব সময় সেই চেষ্টা।'

জয়ন্ত চমকে ওঠে। সে ক'দিন বাদে কলকাতা থেকে চলে যাবে কিন্তু ঝুমাকে তো এ বাড়িতে থাকতে হবে। রাজশেখররা যদি ভুল সন্দেহের বশে তার ওপর রাগ পুষে রাখেন, মেয়েটার ক্ষতি হয়ে যাবে। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না না, ঝুমা কিছুই করেনি। দীপার সঙ্গে হঠাৎ এক জায়গায় আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে যা বলল তাতে

মনে হয়নি তার একটা ওয়ার্ডও মিথ্যে। মেয়েটার জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে জেঠামশাই। রানাদার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আপনারা ওকে সোশাল রেকগনিশানটা দিন।'

রাজশেখর বলে, 'ইমপসিবল। তা হয় না। অন্যের পাপ আমাদের ঘাড়ে এনে তুলবে, এটা আমি মেনে নেব না—কিছুতেই না, কিছুতেই না।'

জয়ন্তর মুখ কঠোর হয়ে ওঠে। সে বলে, 'রানাদার সঙ্গে এ নিয়ে আমার সেদিন একটু কথা হয়েছিল। তাতে মনে হয়েছে দীপার ব্যাপারটার জন্যে সে দায়ী।'

'তোমার কাছে স্বীকার করেছে?'

'না। তবে তার মুখচোখ দেখে আমার তাই মনে হয়েছে। সেদিন থেকে সে আমাকে অ্যাভয়েড করে চলেছে।'

রাজশেখর বলেন, 'রানাকে বুঝতে তোমার ভুল হয়েছে জয়ন্ত।'

'ভুল যে হয়নি সেটা আমার চেয়ে অনেক ভাল করেই আপনি জানেন। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে চাই না বড় জেঠা-মশাই। শুধু কণ্ডিশনের কথাটা জানিয়ে দিচ্ছি। দীপার সঙ্গে রানাদার বিয়ে না দিলে বাড়ি বেচাটা আমি বন্ধ করে দিয়ে যাব।' শান্ত মুখে, খুব আস্তে আস্তে কথাগুলো বলে জয়ন্ত।

রাজশেখর এবার খেপে যান, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'তোমার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

'এর ভেতর স্পর্ধা কোথায়! যা সত্যি তা-ই আমি বলেছি।'

'তোমার বাবাও এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলত না।'

'বাবা কী করতেন আমি জানি না কিন্তু অন্যায়কে অন্যায় না বলার শিক্ষা তিনি আমাকে দেননি।'

ঠাকুমা বাদে চারপাশের কয়েক জোড়া জ্বলন্ত চোখ জয়ন্তর দিকে স্থির হয়ে আছে। কেউ একটা কথাও বলছে না।

অনেকক্ষণ পর চারুলতা মুখ খোলেন। খানিক আগে তাঁর চোখ ধকধক করছিল, এখন সে দুটোতে অগাধ স্নেহ। জয়ন্তর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে স্নিগ্ধ গলায় বলেন, 'কাকা জেঠারা বিপদে পড়ুক, এটা নিশ্চয়ই তুমি চাও না।'

জয়ন্ত বলে, 'না, চাই না।'

'তা হলে আর রাগারাগি করো না। দু'দিনের জন্যে এসেছো—' ঘোরো, বেড়াও আনন্দ কর। কাকা-জেঠাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে যাও। তোমার ওপর আমাদের এতগুলো মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বাবা। তুমি কি সবাইকে কষ্ট দিয়ে চলে যাবে?'

জয়ন্ত বুঝতে পারছিল, কৌশলটা পাল্টে ফেলেছেন চারুলতা। সরাসরি সংঘর্ষের রাস্তা থেকে সরে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে, সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে বা করুণ মুখে একটু অভিনয় টভিনয় করে কাজ গুছিয়ে নেওয়া যায় তার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? মনে মনে হেসে জয়ন্ত বলে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। তেমনি আপনাদের ওপরও দীপার জীবনটা নির্ভর করছে। তার মুখেও একটু হাসি ফোটান না।'

'বিশ্বাস করো জয়, মেয়েটা সত্যি খারাপ।'

'সে যেমনই হোক, রানাদাকে তার বিয়ে করতে হবে।'

ওধার থেকে রাজশেখর বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'তুমি এই টাইপের মেয়েদের জানো না জয়। কী যে শয়তান—'

জয়ন্ত আগের কথাটাই আবার বলে, 'আপনি দীপা সম্পর্কে যা-ই বলুন, রানাদার সঙ্গে ওর বিয়েটা দিতে হবে।'

রাজশেখরের মেজাজ আবার খারাপ হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'কেন এই ব্যাপারটা নিয়ে এত জেদ করছ জয়?'

'কারণ এই বিয়েটা হওয়া দরকার।'

'তুমি একজন ব্রিটিশ সিটিজেন, ক'দিনের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে এসেছ। এখানকার আজে বাজে ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কেন নিজেকে জড়াচ্ছ?'

'আজে বাজে যে নয় সেটা আপনি ভাল করেই জানেন। আমি একটা মারাত্মক অন্যায়ের প্রতিকার করতে চাইছি।' জয়ন্ত বলতে থাকে, 'কেউ ব্রিটিশ সিটিজেন হোক, কি নামিবিয়ার সিটিজেন হোক, পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় অন্যায় দেখলে প্রোটেস্ট করার হিউম্যান রাইট তার আছে।'

রাজশেখর চোখমুখ কুঁচকে কর্কশ গলায় বলেন, 'তোমার বড় বড়

লেকচার শুনতে চাই না। তোমাকে সাফ বলে দিচ্ছি, এ বিয়ে হবে না।'

এবার ঘরের অন্য সবার মুখের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চোখদুটো ঘুরিয়ে নিতে নিতে জয়ন্ত বলে, 'আপনারা সব জানেন। এ বিয়েতে কি আপনাদেরও মত নেই ?'

কেউ উত্তর দেবার আগে রাজলক্ষ্মী একধার থেকে বলে ওঠেন, 'এ বিয়ে দিতেই হবে, নইলে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।' বড় ছেলের দিকে ফিরে বলেন, 'তোদের কি এতটুকু মায়াদয়া নেই ?'

রাজশেখরের মুখচোখ হিংস্র হয়ে ওঠে। গলার শির ছিঁড়ে তিনি চিৎকার করেন, 'তুমি চুপ করো বুড়ি। আমি রানার জন্যে বড় বংশের মেয়ে ঠিক করে রেখেছি। সেখানে বিয়ে করলে নগদ টাকা, গয়না, আসবাব মিলিয়ে কত পাব জানো ?'

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় জয়ন্তর কাছে। রাজশেখর নামে এই লোকটা টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এর জন্য ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে ঠকানো, বাড়ির ভাগ ছেড়ে দেবার জন্য বোন এবং ভাইপোর হাতে পায়ে ধরা থেকে শুরু করে ছেলের বিয়ে দিয়ে যৌতুক আদায় করা পর্যন্ত কোনও কিছুতেই তিনি পেছপা নন।

তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার অবাক করে দেয় জয়ন্তকে। রানার মতো দুশ্চরিত্র অপদার্থেরও এখানে মেয়ে জোটে ? বিয়ের বাজারে তারও ভালরকম দর আছে। অদ্ভুত এই দেশ।

জয়ন্ত বলে, 'বড় জেঠামশাই, অন্য জায়গায় আপনি রানাদার বিয়ে দিতে পারেন না।'

'তোমার হুকুম নাকি ?' হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চেঁচাতে থাকেন রাজশেখর।'

'আপনি আমার বাবার বড় ভাই, আপনাকে শ্রদ্ধা করি। হুকুম দেওয়া কি সম্ভব ?'

'শ্রদ্ধার নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর জয়ন্ত বলে, 'রাগ যদি না করেন একটা কথা বলব ?'

সন্দিগ্ধভাবে রাজশেখর জিজ্ঞেস করেন, 'কী ?'

'দীপার সঙ্গে রানাদার বিয়ে না দিলে আপনি বিপদে পড়বেন।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান রাজশেখর। তাঁর মাথায় যেন খুন চড়ে গেছে। জয়ন্তর মুখের সামনে আঙুল নাড়তে নাড়তে চেঁচাতে থাকেন, 'এত বড় আস্পর্ধা তোমার, আমাকে শাসাচ্ছ!'

জয়ন্ত উত্তেজিত হয় না, খুব শান্ত মুখে বলে, 'শাসাব কেন? আপনাকে একটু সাবধান করে দিলাম। কারণ বিয়েটা না হলে দীপারা আপনাকে ছাড়বে না।'

'কী করবে শুনি?'

'সেটা দু-একদিনের ভেতর বুঝতে পারবেন।' বলে আর বসে না জয়ন্ত, সবাইকে হতবাক করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আজ দুপুরে সরস্বতী আর আনন্দশেখর তাঁর ঘরে এলেন না, কাজের মেয়ে অন্নদাকে দিয়ে ভাতটাত পাঠিয়ে দিলেন।

'শান্তি ভবন'-এর আদর যে কমতে শুরু করেছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না জয়ন্তর।

তের

দীপার বিয়ে নিয়ে সেই তিক্ততার পর থেকে ঝুমা এবং ঠাকুমা ছাড়া জয়ন্তর ঘরে আর কেউ আসে না। প্রথম দু'দিন সে ছিল রাজশেখরদের গেস্ট, পরের দু'দিন আনন্দশেখরদের। এখন সে কাদের অতিথি জানা নেই। অবশ্য জানার ইচ্ছাও নেই। জয়ন্ত বাড়িতে থাকলে অন্নদা এসে ভাতটাত দিয়ে যায়।

একটা ব্যাপার সে লক্ষ করেছে, কলকাতায় আসার পর জেঠামশাই জেঠাইমারা রোজ চার বেলা তার জন্য রাজসিক ভোজের আয়োজন করতেন। তাকে খুশি করার জন্য সবাই সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতেন। কিন্তু খাওয়ার স্ট্যান্ডার্ডটা হঠাৎ দারুণ খারাপ হয়ে গেছে। দুপুরে আর রাতে মোটা চালের ভাত, পাতলা ডাল, ঘ্যাটের মতো তরকারি আর বিশ পঁচিশ গ্রামের এক টুকরো মাছ। সকালে দু'খানা হাতেগড়া রুটি আর একটু আলুর তরকারি, সেই সঙ্গে চা। এত অনাদরের

কারণটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি জয়ন্তর। জেঠাজেঠিরা তাকে আদর-যত্নে খুশি করে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তখন সেটা সম্ভব হল না তখন তাঁদের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে।

আজ শনিবার।

কাল সন্ধেয় 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিসে গিয়েছিল জয়ন্ত। বিশাখা বলে দিয়েছে, আজ অতি অবশ্য সে যেন বিকেল চারটের ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির উল্টোদিকের ফুটপাথে অপেক্ষা করে। 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর মেম্বাররা মিছিল করে ওই রাস্তা ধরে 'শান্তি ভবন'-এ যাবে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পেঁছুতে চারটে সাড়ে চারটে হয়ে যাবে। জয়ন্ত ওখান থেকে মিছিলে যোগ দেবে। সে অবশ্য সোজা সাউথ ক্যালকাটায় 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর অফিসে এসে শুরু থেকেই মিছিলের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু বিশাখাই বারণ করেছে। অকারণে এতদূর এসে আবার ফিরে যাবার মানে হয় না, তার চেয়ে বাড়ির কাছাকাছি ওয়েলিংটনে দাঁড়ানোই ভাল, তাতে হাঁটাহাঁটিটা কম হবে।

চারটে নয়, ঠিক সাড়ে তিনটেয় বিধানবাবুর বাড়ির উল্টোদিকের ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্ত। সোয়া চারটেয় বিশাখাদের মিছিল এসে পেঁছিয়। সব মিলিয়ে শ'খানেক নানা বয়সের মহিলা এবং পুরুষ। তাদের অনেকেরই হাতে প্ল্যাকার্ড। সেগুলোতে লেখা রয়েছে 'দীপাকে পুত্রবধূর মর্যাদা দিতে হবে।' বা 'দীপাকে প্রত্যাখ্যান করলে তার ফল হবে গুরুতর', ইত্যাদি।

মিছিলের মুখের দিকটায় দু'টি যুবক দু'দিক থেকে লাল শালুর ফেস্টুন ধরে ধরে এগিয়ে চলছে। ফেস্টুনটায় বড় বড় হরফে লেখা আছে উইমেন্স ওয়ার্ল্ড। নারীর অধিকার রক্ষা এবং সংগ্রামের প্রতীক।

দ্বিতীয় 'রো'তে রয়েছে বিশাখা, পল্লবী, দীপা আর দু'জন মধ্যবয়সী মেম্বার। তবে সুরমাদিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বিশাখাদের 'রো'-এর পর লাইন দিয়ে বাকি সবাই।

জয়ন্ত সোজা সেকেন্ড 'রো-তে ঢুকে বিশাখার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে।

বিশাখা বলে, 'কতক্ষণ ওয়েট করছেন?'

জয়ন্ত বলে, 'প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'এখনও ভেবে দেখুন আমাদের সঙ্গে যাবেন কিনা।'

'একবার যখন ডিসিশান নিয়েছি পিছিয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।'

'আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'জানি। এসব কথা তো সেদিনই হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে।'

বউবাজারের মুখে আসতেই বিশাখা একটি যুবককে বলে, 'এবার স্লোগান শুরু করো বিজন—'

বিজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'দীপা ভট্টাচার্যকে—'

'পুত্রবধূর মর্যাদা দিতে হবে, দিতে হবে।'

স্লোগান দিতে দিতে ডাইনে ঘুরে অনেকটা এগিয়ে বাঁ পাশের চন্দ্রশেখর দত্ত রোডে 'শান্তি ভবন'-এর সামনে এসে পড়ে মিছিলটা।

স্লোগান শুনে চারপাশে লোকজন চকিত হয়ে দৌড়ে আসে। মুহূর্তে রীতিমত ভিড় জমে যায়।

মিছিল দাঁড়ায় না, 'শান্তি ভবন'-এর ভাঙা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

হই চই চিৎকার শুনে বাড়ির ভেতর থেকে রাজশেখর বেরিয়ে আসেন। এমনকি ছাদের ঘর থেকে রাজলক্ষ্মী পর্যন্ত নেমে এসেছেন।

এত লোকজন দেখে প্রথমটা ভীষণ ঘাবড়ে যান রাজশেখর। বলেন, 'এতে হল্লা কিসের? কী চান আপনারা?' পরক্ষণেই তাঁর চোখ এসে পড়ে দীপা এবং জয়ন্তর ওপর। বিভ্রান্তের মতো বলেন, 'এ কী, তোমারা! এই মিছিলের সঙ্গে!'

দীপা উত্তর দেয় না। জয়ন্ত বলে, 'আপনি মিছিল করে আসতে বাধ্য করেছেন বড় জেঠামশাই। আগে অনেকবার আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়েছি। তখন গ্রাহ্য করেন নি।'

বিশাখা বুঝতে পারছিল জয়ন্ত যার সঙ্গে কথা বলছে তিনি রাজশেখর। পেছনে মুহুর্মুহু স্লোগান চলছে। হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিয়ে সে রাজশেখরকে বলে, 'আপনার সঙ্গে আমাদের জরুরি

কথা আছে কিন্তু এত লোকের সামনে তা বলা সম্ভব নয় ! যদি কোনও ঘরে বসা যায়—'

বিমূঢ়ের মতো রাজশেখর বলেন, 'এত লোক ধরবে, এমন ঘর আমাদের নেই।'

বিশাখা বলে, 'সবার যাবার দরকার নেই। আমরা চার পাঁচজন গেলেই হবে।'

দ্বিধান্বিতের মতো রাজশেখর বলেন, 'আসুন—'

বিশাখা দীপা জয়ন্ত পল্লবী আর একজন বয়স্ক মহিলাকে সঙ্গে করে রাজশেখর একতলার ড্রইংরুমে চলে আসে। চারুলতা, সরস্বতী, রাজলক্ষ্মী, আনন্দশেখর ইত্যাদি 'শান্তি ভবন'-এর প্রতিটি মানুষ হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। একমাত্র রাজলক্ষ্মী আর ঝুমা ছাড়া সবাই অত্যন্ত বিচলিত, উদ্বিগ্ন এবং সন্ত্রস্ত।

বিশাখা বলে, 'আপনি আমাদের প্ল্যাকার্ডগুলো নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, দীপাকেও দেখেছেন। আমরা কী চাই, আশা করি বুঝতে অসুবিধে হয়নি।' একটু থেমে বলে, 'আজই দীপার সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে দিতে হবে।'

প্রাথমিক ভয়টা কাটিয়ে উঠে রাজশেখর আনন্দশেখর আর চারুলতা মোটা এবং সরু গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যা বলেন, তা এইরকম। এটা মগের মুল্লুক নয়, বেশি জবরদস্তি করলে পুলিশ ডাকা হবে, ইত্যাদি।

বিশাখা খুব শান্ত গলায় বলে, পুলিশকে এক্ষুণি খবর দিন। তারা আসার পর ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে, চিন্তা করে দেখেছেন? সামলাতে পারবেন তো ?'

রাজশেখরেরা চুপসে যান।

বিশাখা বলে, 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরির সোসাল হিস্ট্রিতে আপনাদের বংশের কী গ্লোরিয়াস একটা রোলই না ছিল। বিদ্যাসাগর এ বাড়িতে এসেছেন। নারীর অধিকার রক্ষা, বিধবা বিবাহ—এ সব ব্যাপারে আপনাদের পূর্বপুরুষের কত লড়াই করেছেন। আর আপনারা একটা মেয়ের চরম সর্বনাশ করার ব্যবস্থা করছেন। এটা কিছুতেই আমরা মেনে নেব না।'

এরপর দীপার বিয়ে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া চলতে থাকে। রাজশেখররা বিয়ে দেবেন না, বিশাখারা এ বিয়ে করিয়ে ছাড়বে।

বিশাখা বলে, 'যতক্ষণ না বিয়েটা হচ্ছে আমরা এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি না। একদিন দু'দিন, চারদিন দশ দিন—দরকার হলে একমাস দু'মাসও আপনাদের এখানে পড়ে থাকব। যে ক'জন ছেলেমেয়ে দেখেছেন, মনে করবেন না, এটুকুই আমাদের স্ট্রেনথ্। খবর দিলে কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে আরও হাজার হাজার স্টুডেন্ট এসে হাজির হবে।'

শেষ পর্যন্ত রাত ন'টা নাগাদ ভেঙে পড়েন রাজশেখর। প্রচণ্ড অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়েতে মত দিতে হয় তাঁকে।

লোক পাঠিয়ে তক্ষুণি একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে ধরে এনে দীপার সঙ্গে রানার বিয়েটা চুকিয়ে ফেলা হয়। সাক্ষী হিসেবে সই করে বিশাখা, পল্লবী আর জয়ন্ত।

বিয়ের পর বিশাখা বলে, 'আজ আমরা দীপাকে নিয়ে যাচ্ছি, কয়েকদিন বাদে নতুন বৌয়ের সাজে সাজিয়ে তাকে দিয়ে যাব।'

বিশাখারা চলে গেলে দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র গলায় রাজশেখর জয়ন্তকে বলেন, 'সূর্যর ছেলে হয়ে তুমি আমাদের এত বড় সর্বনাশটা করলে? এ বাড়িতে তোমার আর থাকার দরকার নেই। কাল সকালেই চলে যাবে।'

রাজলক্ষ্মী এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনে এবং দেখে যাচ্ছিলেন। এবার কঠোর স্বরে বলেন, 'কেন যাবে? তোর হুকুমে নাকি? এ বাড়িতে তোর যতটা অধিকার, ওরও ঠিক ততটাই। জয় যাবে না। যদ্দিন কলকাতায় আছে এখানেই থাকবে।'

জ্বলন্ত চোখে মাকে প্রায় ভস্মীভূত করতে করতে লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে থেকে চলে যান রাজশেখর।

চোদ্দ

দেখতে দেখতে লণ্ডনে ফিরে যাবার দিন এসে যায়।

দীপার বিয়ের পর রাতটুকু কাটানো ছাড়া 'শান্তি ভবন'-এর সঙ্গে

জয়ন্তর কোনও সম্পর্কই নেই। ঝুমা এবং রাজলক্ষ্মী ছাড়া কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। এখানে তার খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধ বার ঝুমা তাকে খাবার দিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু বেশীর ভাগ দিনই সে বাইরে বাইরে খেয়ে নেয়।

এর ভেতর জয়ন্ত অনেকগুলো জরুরি কাজ সেরে নিয়েছে। বিশাখাকে তার এবং তার বাবা সূর্যশেখরের প্রতিনিধি হতে রাজি করিয়েছে। প্রথমটা 'না' 'না' করেছিল বিশাখা কিন্তু জয়ন্তর অনুরোধ ছিল এমনই আন্তরিক যে শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছাটা মেনে নিতে হয়েছে। বিশাখা তাদের তরফ থেকে বিল্লু, ছোট কাকিমা এবং দীপার ব্যাপার-গুলো দেখবে। রাজশেখরবা কোনও রকম গোলমাল করলে সে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবে।

বিশাখাদের বাড়ি গিয়ে একদিন তার ল'ইয়ার বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শও করে এসেছে জয়ন্ত। বিশাখার বাবা বলেছেন, বিশাখাকে তাদের প্রতিনিধি করতে হলে সূর্যশেখরকে তার নামে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে পাঠাতে হবে। জয়ন্ত জানিয়েছে, লন্ডনে গিয়েই এক সপ্তাহের ভেতর পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

এর ভেতর একদিন বিশাখাকে সঙ্গে করে পিসির বাড়িতে গিয়েছিল জয়ন্ত, আরেকদিন টালিগঞ্জে ছোট কাকিমার বাপের বাড়িতেও বিশাখার সঙ্গে দু'জনের আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছে, 'শান্তি ভবন' সংক্রান্ত কোনও সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা যেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিশাখাদের বাড়ির এবং 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড'-এর ঠিকানা আর ফোন নাম্বারও পিসিদের দিয়ে এসেছে।

সামান্য ক'টা দিন অনেকটা করে সময় একসঙ্গে কাটিয়ে বিশাখা মুগ্ধ হয়ে গেছে। জয়ন্তর মতো ছেলে আগে দেখেনি। সে যেটা সঠিক আর ন্যায়-সঙ্গত মনে করেছে তার জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে গেছে। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল, সে জন্য বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। ছেলেটা অন্যায়ের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে চলতে শেখেনি।

জয়ন্তও কম মুগ্ধ হয়নি। বাঙালি মেয়েদের সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল এইরকম—ছিঁচকাঁদুনে, দুর্বল, ঘ্যানঘেনে। কিন্তু বিশাখা

একেবারে অন্য ধাতুতে তৈরি। এমন ইস্পাতের ফলার মতো ধারাল মেয়ে ইউরোপেও কম দেখেছে সে।

এ ক'দিনে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা। এবং কখন থেকে একজন আরেকজনকে তুমি বলতে শুরু করেছে, নিজেদের খেয়াল নেই।

বিশাখা একদিন হেসে হেসে বলেছে. 'আমার কাঁধের ওপর অনেক লোড চাপিয়ে যাচ্ছ।'

জয়ন্ত বলেছে, 'তোমার কাঁধটা খুব নির্ভরযোগ্য যে।'

'তাই বুঝি।'

আজ ফেরার দিন।

কলকাতা থেকে ডোমেস্টিক ফ্লাইটে বম্বে। বম্বে থেকে ইণ্টার-ন্যাশনাল ফ্লাইট ধরে লণ্ডনের হিথ্রো।

সকালে স্নানটান করে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছে জয়ন্ত। ঝুমা তাকে টোস্ট আর অমলেট করে দিয়ে গিয়েছিল।

ব্রেকফাস্টের পর প্রথমে সে ছাদে গিয়ে রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করে বলে, 'চলি ঠাকুমা—'

দু'হাতে জয়ন্তর গলা জড়িয়ে গালে চুমু খেয়ে রাজলক্ষ্মী সজল চোখে বলেন, 'দু'দিনের জন্য এসে একেবারে মাতিয়ে দিয়ে গেলে দাদা-ভাই। আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'

'নিশ্চয়ই হবে। বাবাকে সব বলে আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।'

ঝুমা এ ঘরেই ছিল। সে সমানে কাঁদছে। এগিয়ে এসে প্রণাম করতেই জয়ন্ত বলে, 'কেঁদো না। তোমার জন্যে কিছু একটা করতে হবে। সামথিং পজিটিভ। বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে খুব শিগগিরই তোমাকে জানিয়ে দেব।'

এরপর নিজে এসে একে একে জেঠা কাকা—সবাইকে প্রণাম করে জয়ন্ত। বলে, 'আপনাদেরকে কষ্ট দিয়ে গেলাম কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

কেউ উত্তর দেয় না।

কাল রাতেই সুটকেশ টুটকেশ গুছিয়ে রেখেছিল জয়ন্ত। সেগুলো নিয়ে এক সময় বেরিয়ে পড়ে সে।

গেট পেরিয়ে যেতে যেতে প্রথম দিনটির কথা তার মনে পড়ে। সেদিন বাড়ির সবাই মিলে কী রাজকীয় অভ্যর্থনাই না করেছিল! আর আজ? একা একা নিঃশব্দে চলে যেতে হচ্ছে। দুঃখ নয়, একটু মজাই লগে তার।

কাল রাতে বিশাখাদের মা-বাবাব সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিতে গিয়েছিল জয়ন্ত। তখনই বিশাখা জানিয়ে দিয়েছে, মর্নিং-এ তার দুটো ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আছে। সে দুটো শেষ হলেই সোজা এয়ারপোর্টে চলে যাবে।

এয়ার পোর্টের বিশাল লাউঞ্জে আসতেই জয়ন্ত দেখল বিশাখা দাঁড়িয়ে আছে। মালপত্র কাউন্টারে জমা দিয়ে, বোর্ডিং কার্ড নিয়ে সে বিশাখার কাছে আসে।

বিশাখা ভারি বিষণ্ণ গলায় বলে, 'আর কি তুমি কলকাতায় আসবে?'

বিশাখার আবেগ জয়ন্তর মধ্যেও চারিয়ে গিয়েছিল। সে বলে, 'যে শহরে তুমি আছো, সেখানে না এসে কি পারি। খুব তাড়াতাড়িই আবার আসছি।'

এরপর পরস্পরের হাত ধরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, খেয়াল নেই। এক সময় লাউডস্পিকারে জানানো হয়, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বোম্বাইগামী প্লেন কয়েক মিনিটের মধ্যে ছাড়বে। জয়ন্ত দত্ত যেন এখনই সিকিউরিটি এনক্লোজারে চলে যান।

ধীরে ধীরে বিশাখার হাতটা ছেড়ে দিয়ে গভীর চোখে তাকে একবার দেখে জয়ন্ত। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে যায়। জয়ন্ত জানে না, কোত্থেকে শরীরের না মনের, ভারি কষ্টকর কিছু একটা উঠে এসে বুকের ভেতর ছড়িয়ে পড়ছিল।

সমাপ্ত